

1880
CALCUTTA

বঙ্গদর্শন।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত।



সপ্তম বৎসর।

১২৮৭ সাল।



কাঁটালপাড়া

বঙ্গদর্শনযন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮১

মূল্য, ৩ টাকা।

ডাকমাণ্ডল ৭০

সূচিপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অভিজ্ঞান শাকুন্তল	১০, ১০৮, ১৯৩, ২৬৫, ৩০২, ৩৯৫	বাঙ্গালার জর	...
অনিক্‌ স্তম্ভ	...	বাঙ্গালি ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটা কথা	৩৬২
জ্ঞানার পরিণ	...	বাঙ্গালির উৎপত্তি	৪২৯, ৪৬৯, ৪৮১, ৫২৯,
উপাসনাবিনয়ক তুলনা	...	গাঙ্গুলির পাঠক পড়নি ভ্রত	...
কালেজি শিক্ষা	...	গাঙ্গুলি সাহিত্য	...
জনা কেন দিই	...	বাগ্মিকির জর	...
হসমাস	...	বিবাহ দ্বিতীয়বার	...
কুণ্ডলের সংক্ষিপ্ত জীবনী	...	ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম	...
কুরীর পরীক্ষা	...	ভূতের জাতি	...
জল	...	ভট্টাচার্য্য বিদায় প্রবাসী	...
জোসেফ্‌ ম্যাট্‌সিনি	...	নাথবীজ্ঞতা	...
চাকা ও পূর্ববাঙ্গালা	...	...	...
ককপ্রবালী	...	মালাচন্দন	...
দ্বিতীয়বার বিবাহ	...	মিরন্যা ও কপালকুণ্ডলা	...
নবিল বা কথা গ্রন্থের উদ্দেশ্য	...	মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	...
তন খাজনার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা	...	সংসাদেশ	...
রিবিউর মত	...	খার কাজ সেই ককক	...
যশ সমালোচন	...	রক্ততরু	...
সেমে দেশে বাঙ্গালার জর	...	রক্তরহস্য	...
শালি	...	শঙ্করাচার্য্যের জীবন	...
প্রাণ প্রাণ-বংশধর সমালোচন	...	সমসং	...
বঙ্গ বৈজ্ঞানিক	...	সমসং	...
বঙ্গীয় শঙ্করাচার্য্যের জীবন	...	সমসং	...
যশোবর্তন	...	সমসং	...

বঙ্গদর্শন ।

মাসিক পত্র ও সমালোচন ।



সপ্তম বৎসর ।



ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্ম ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পূর্ব্ব হুত্ব ।

যে অবধি চৈত্বরের ছায় মনুষ্যসংসার
ও নিরাকার এই দুই বিভাগে বিভক্ত
হইয়াছে, সেই অবধি এক নূতন যুগোৎ-
পত্তি হইয়াছে। চৈত্বরের ঐশ্বর্যবাদ আছে,
মনুষ্যেরও তাহা ঘটিয়াছে। এই ঐশ্বর্য-
বাদীরা বলেন, “তুমি আমি প্রত্যেকের
ভিতর, আর একটি করিয়া তুমি আমি
আছে। যেটা দেখা যায়, সেটা সাকার
মনুষ্য, আবার তাহার ভিতর যেটা আছে,
সেটা নিরাকার মনুষ্য। কেহ সেটাকে
দেখিতে পার না, সেটাও কোন কার্য
করে না, অথচ যেটা আছে বলিয়া
বিশ্বাস করিতে হইবে।” শাস্ত্রকারেরা,
ঈশ্বর্য্যবাদের সকলেই একবারেই বলি-
তেছেন, মনুষ্যের ভিতর মনুষ্য আছে।
তুমি জানিতেছ না, তুমি বুঝিতেছ না,

তোমার ভিতর আর একজন আছে,
তাহার নাম আত্মা ।

ঐশ্বর্য্যবাদীরা আরও বলেন যে, মৃত্যুর
পর নিরাকার মনুষ্য প্রকাশ পায়; সেই
নিরাকার অবস্থায় হুত্ব জুত্ব সকলই
ভোগ করিতে হয়। আমি যদি মৃত্যুর
পর স্বর্গে যাই, উত্তম বস্ত্র পরিব, চন্দন
মাখিব, পুষ্পহার গলায় দিব, সিংহাসনে
বসিব, অপ্সরার গীতি শুনিব, আহা
নিদ্রার ত কথাই নাই। তখন শরীর
নাই থাকুক, এ সকল শারীরিক হুত্ব-
ভোগের কোন ব্যাঘাতই ঘটিবে না।
আর যদি নরকে যাই—এই লেখার পর
তাহাই সম্ভব—তাহা হইলে নানা বর্ণের
অনন্ত অগ্নি আমার নিরাকার দেহকে
দগ্ধ করিবে, আমি জ্বালায় যন্ত্রণায়
হীংকার করিব, ডাক্তার পাইব না,
ঔষধ পাইব না, কোন্না গালিতে একটা
আত্মীয়ও পাইব না। যদি স্বর্গে যাইতে

না পাই, আর নরকেও স্থান না হয়,—
ইদানী শুনিতেছি, নরকে নাকি স্থান-
ভাব হইয়াছে, আমিও সেই ভরসায়
কলম ধরিয়াছি—যদি স্বর্গে যাইতে না
পাই, নরকেও স্থান না হয়, তাহা
হইলে মৃত্যুর পর আমি এইখানেই
থাকিব, তখন দেহ থাকিবে না, কাজেই
তোমরা আমায় দেখিলে প্রেত বলিয়া
ভয় পাইবে।

এইকণ আবার বঙ্গ, চন্দন, পুষ্প,
সকলের আত্মা আছে, নতুবা তাহারা
স্বর্গে যার কিকপে? যদি সেখানে
তীতিয়া গিয়া তীত বোনে, মালিরা গিয়া
মালঞ্চ করে, তাহা হইলে সেখানে
চাকাইধুতি, বেনারসি চেলি জন্মিলে
জন্মিতে পারে; কিন্তু সেখানে যদি
তীতি, মালি প্রভৃতি ইতরজাতির
যাইতে না পায়, বা যাইরা যদি তন্তুবয়ন
করিতে না পায়, তাহা হইলে বঙ্গ
কোথা হইতে আইসে? কাজেই স্বীকার
করিতে হইবে যে, আমাদের এই
পুৰাতন রঙ্গের আত্মারা স্বর্গে গিয়া
বাবস্তব হয়। গতএব আত্মা যে কেবল
আমাদের আছে, এমত নহে। কড়ি-
গুলির আত্মা আছে, বৈতরণী পার
হইবার নিমিত্ত যে কয়েক কড়া কড়ি
আমরা পাইরা থাকি, যদি তাহাদের
আত্মা না থাকে, তাহা হইলে একপ
কড়ি আমাদের সঙ্গে দিবার ফল কি?
কড়ি বরাহ পড়িয়া থাকে, এ অবস্থায়
বুঝিতে হইলে কড়ির আত্মারা মৃত

ব্যক্তির সঙ্গে যায়, অন্ততঃ পাঁচঘাটা
পাওয়া।

রহস্য এক্ষণে এই পর্য্যন্ত। আমরা
বলিতেছিলাম যে, যে অবধি মহুয়ার
মঘন্ধে দ্বৈতবাদ রাষ্ট হইয়াছে, সেই
অবধি নূতন কল আরম্ভ হইয়াছে। সেই
অবধি প্রথম ধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।
তাহার পূর্ক্সাবধি ধর্ম গতিবার কিছু
কিছুমাত্র উদ্যোগ ছিল। ভয় মহুয়ার
স্বভাবতঃ প্রবল—সেই ভয় হইতে ছই
এক দেবতার করনা আরম্ভ হইয়াছিল।
অগ্নি দেবতা, কেন না হাত পুড়ান;
বায়ু দেবতা, কেন না ঘর ভালে, বন্ধন
দেবতা, কেন না জলে ভাসায়, ইহাদের
পূজা করা উচিত। তাহা হইলে এ
সংসারযাত্রা নির্কিঙ্গে চলিবে। এইরূপে
সামান্য মাত্র ধর্ম উদ্ভাবিত হইতেছিল।
স্বর্গ, নরক, আত্মা, পরমাত্মা, এ সকল
কথার সৃষ্টি তখন হয় নাই। কাজেই
ধর্ম কেবল ঐহিকী ছিল। লোকের
চরিত্রও তখন পৈশাচিকবৎ ছিল—
ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্দম, ভল্লুকের ন্যায় পর-
রক্তপ্রিয়, দয়া, দাক্ষিণ্য একেবারে বির-
হিত; একপ প্রকৃতি অগ্নি বায়ু দেবতার
দ্বারা উদ্ভূত ব্যতীত মনিত হইবার
সম্ভাবনা হয় নাই।

তাহার পর মহুয়ার ভিতর মহুয়া
আছে, এই অমূল্য ভারতবর্ষে প্রথমে
উত্থাপন হইল। উত্থাপিত হইবামাত্রই
নূতন এক ধর্ম স্রুতঃ উপস্থিত হইল।
মৃত্যুর পর আত্মা জীবিত থাকে এই

প্রভুত্বের সঙ্গে, ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য এ সকল আত্মশাস্তিক কথা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, একে একে তাহা সমুদায় অনুভব হইয়া নূতন ধর্মের উৎপত্তি হইল। যে ব্যক্তি আত্মবাদ স্বীকার করিল, তাহাকেই সেই নূতন ধর্ম গ্রহণ করিতে হইল। পৃথিবীর যাবতীয় বিচক্ষণ দ্বাতি প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া একে একে সকলেই এই আত্মামূলক নূতন ধর্ম গ্রহণ করিল। ভারতবর্ষ হইতে মিসররাজ্যে এই ধর্ম প্রথম প্রচার হয়, তথা হইতে যুনানীদেশে গৃহীত হয়। মুসা এই ধর্ম মিসরদেশ হইতে আপন দেশে লইয়া বান। মুসা হইতে পরম্পরা যীশুখ্রীষ্ট* এই ধর্ম অবলম্বন করেন। তাহার পর মহম্মদ এই ধর্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে কাজেই তাহাদের উপাস্যকগণ, ইংরেজ, ফরান্সিস, দিনামার, ওলন্দাজ, আরবী, পারস্যীক প্রভৃতি সকলেই এই ধর্মাবলম্বী হইয়াছেন।

ধর্মটা অতি সহজ। আত্মা স্বীকার করিলেই আপনা আপনি উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা ইহার অনুভব হইয়া যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উত্তর প্রত্যুত্তর লইয়া এই ধর্ম।

প্রঃ। মৃত্যুর পর আত্মা কি করে ?

উত্তর। ঐহিকে যে কার্য্য করি রাখে, তাহার ফলভোগ করে।

প্র। কি ফল ? কোথায় ? থাকিয়া তাহা ভোগ করে ?

উ। স্বর্গে থাকিয়া সুখভোগ করে, নরকে থাকিয়া দুঃখভোগ করে।

প্র। কোন কার্য্যের ফল সুখ, কোন কার্য্যের ফল দুঃখ ?

উ। বিচারকর্তা যে কার্য্য ভাল বলেন সেই কর্ম্মের ফল সুখ। বিচারকর্তা যে কার্য্য মন্দ বলেন, সেই কর্ম্মের ফল দুঃখ।

প্র। বিচারকর্তা কে ?

উ। তাহার নাম ঈশ্বর, তিনিই পৃথিবী স্থপতি করিয়াছেন।

প্র। কোন কার্য্য তিনি ভাল বলেন, কোন কার্য্য তিনি মন্দ বলেন ?

উ। তিনি তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

প্র। কাহার নিকট কি প্রকারে বলিয়া দিয়াছেন ?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তর লইয়া তর্ক আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি সকল ধর্মেরই মূল এক, কেবল এই স্থান হইতে পার্থক্য অবলম্বন করিয়াছে। এই পার্থক্য সাংখ্য। মূলধর্ম সম্বন্ধে ইহাবারা কোন ঐক্যলক্ষ্য হয় নাই। সচরাচর লোকেরা যে শুক্লতর বৈষম্য দেখে, তাহা প্রথমতঃ উৎপত্তি সদ্বিচারিতঃ ঐতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধে, তৃতীয়তঃ আচারসম্বন্ধে।

* অনেকে বলেন যে যীশুখ্রীষ্ট আত্মা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সে কথা অমূলক বলিয়া বোধ হয়। Gospel of St. Matthew Chapter X. P. 28 দেখ।

যে কার্য্য ঈশ্বরের ঐতিহ্যিক, তাহা তিনি কাহার নিকট বলিয়া দিয়াছেন এই লইয়া প্রথম তর্ক। হিন্দুমতানুসারে ঈশ্বর আকাশবাণী দ্বারা পাপ পুণ্য বলিয়া দিয়াছেন। খ্রীষ্টানমতানুসারে স্বয়ং আংশিক অবতারস্বরূপ মনুষ্যমধ্যে আসিয়া বলিয়া দিয়াছেন। মুসলমান মতানুসারে মহাশয়ের নিকট ঈশ্বর দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। বেদব্যাস বা শ্রীকৃষ্ণ, মহাম্মদ বা যীশুখ্রীষ্ট যিনিই ঈশ্বরবাক্য প্রচার করিবার ভারগ্রহণ করিয়া থাকুন, কেহই মূলধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেহই বলেন নাই যে, আত্মা নাই, মৃত্যুর পর সকল ছুরায়। কেহই বলেন নাই যে, স্বর্গ মিথ্যা, নরক মিথ্যা। কেহই বলেন নাই যে, পাপ পুণ্য নাই, কেহই বলেন নাই যে, পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর নাই। যদি কেহ তাহা না বলিয়া থাকেন, তবে মূল-কথার পার্থক্য কই হইল? দেশভেদে বা সময়ভেদে স্বতন্ত্র উপদেষ্টা সম্ভব, উপাস্য-কের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত উপদেষ্টার অমানুষিক পরিচয়ও সম্ভব। উপদেষ্টা কে বা কিরূপে তিনি নিজে উপদেষ্টা হইলেন, কেবল এই কথা লইয়া যে উপাসকদের ধর্ম্মজ্ঞান, তাহাদের পক্ষে এই বৈঘর্য্য অতি ক্ষতর সন্দেহ নাই। যাহারা মূলধর্ম্মা চিনে নাই, তাহারা কেবল উপদেষ্টা চিনিয়াছে। কাজেই উপদেষ্টা লইয়া তাহারা দলাদলি করে। তাহাদের পরিচয়

ধর্ম্ম লইয়া নহে, কার্য্য লইয়া নহে, কেবল দলপতি লইয়া।

ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া দ্বিতীয় তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্র না থাকায় সৃষ্টিবিসরণ বিশি-বার তার ধর্ম্মশাস্ত্র স্বয়ং প্রতপ করিয়া ছিল। সৃষ্টি কেহ দেখে নাই; কিন্তু সকল দেশেই এ সম্বন্ধে একটা না একটা প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে সংগৃহীত হয়, নূতন ধর্ম্মের সহিত সংগতি করিবার নিমিত্ত হয় ত সেই সকল প্রবাদের কোন কোন অংশ পণ্ডিতগণ লইয়া থাকিবে; কিন্তু এই সকল সংগৃহীত প্রবাদের সঙ্গে মূলধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি জল্প। যদি বল একটি প্রকাণ্ড জগৎ বা ভূমি এক সময় পরমেশ্বর প্রসব করিয়াছিলেন; সেই ভিন্ন ভিন্নখণ্ড করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল হইয়াছিল; এবং সেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে জড়জঙ্গম সকল বিনির্গত হইয়াছিল, তাহা বলিলে “আত্মা পরকালে ফলভোগী” এ কথা অর্থাৎ কি হইল? অথবা যদি বল সৃষ্টির পূর্বে সকলই অন্ধকারময় ছিল, সেই অন্ধকারে জ্যোতিষ্ময় ভাসিতে ছিলেন, অথবা যদি বল সৃষ্টির পূর্বে সকলই জলময় ছিল, সেই জলের উপর ঈশ্বর পরিপ্লবভাবে ছিলেন; তাহা হইলে আত্মা পরকালে ফলভোগী এ কথা কিরূপে অর্থাৎ হইল? যে সকল সামান্য লোকেরা ধর্ম্মগ্রন্থের কেবলমাত্র

পক্ষ চিনিয়াছে, ধর্ম চিনে নাই, তাহা-
রাই এই সকল প্রচারপার্থক্যকে ধর্ম-
পার্থক্য মনে করে।

আচার লইয়া ভূতীর বৈবনা। এই
পার্থক্য সম্পূর্ণ সম্ভব। দেশভেদে স্বতন্ত্র
আচার, স্বতন্ত্র ব্যবহার আচলিত হইয়া
পড়ে। উত্তরদেশে নিত্য অবগাহন
ভুক্তিজনক; লাম্বাওদেশের ন্যায় শীত-
প্রধানদেশে তাহা অতি কষ্টকর; কাজেই
উত্তরদেশে নিত্যমান আচাররূপ
হইয়া পড়ে; শীতপ্রধানদেশে তাহা হয়
না। এই স্থলে উত্তরদেশের ধর্মগ্রন্থে
যদি নিত্যমানের ব্যবস্থা থাকে, আর
শীতপ্রধানদেশের ধর্মগ্রন্থে তাহা না
থাকে, তাহা হইলে সামান্য লোকেরা
ইহা গুরুতর বৈবনা বিবেচনা করে।
কিন্তু বাস্তবিক ইহা ধর্মগত বৈবনা
নহে। যাহা আহার ধর্মোত্তরগত হইতে
পারে না। যদি কোন ধর্মোপদেশটা
বিবেচনা করেন যে, জ্ঞানের দোষ গুণ
পরকাল পর্যন্ত পৌঁছে, তাহার উপদেশ
কেবল অতি সামান্য লোকেরা গ্রহণ
করে। একরূপ অনিবেচক ধর্মাবেত্তা
অনেক ছিলেন। কোন কার্য ঈশ্বরের
প্রীতিকর তাহার উপদেশ দিতে গিয়া
ছই একজন বা নির্ভরে সার কথা বলি-
য়াছেন, নতুবা অধিকাংশ উপদেশটারা
কুমারস্বত্রবৃত্ত বদেধবাসীদের মন রক্তা
করিয়াছেন। এইজন্য আচারগত বৈ-
বনা থাকিয়া গিয়াছে। কেহ বলিয়া-
ছেন দাড়ি দেবিলে ঈশ্বর বড় প্রীত

হন। কেহ বলিয়াছেন, আহার লইয়া
ঈশ্বরের বড় পীড়াপীড়ি। কেহ বা
খাওয়া পরার সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন
নাই। ঈশ্বরের পারিতোষিক লইয়া
আরও মতান্তর আছে; কেহ বলেন,
তাহাকে পুষ্পচন্দন দিলে, তিনি বড়
স্বিষ্ট হন। কেহ বলেন, তাহার প্রশংসা
করিলে তিনি বড় খুশী হন। কেহ
বলেন, তাহাকে আদর করিয়া ডাকিলে
বড় আপ্যায়িত হন; কেহ বলেন, তা-
হার নিকট নম্রতা স্বীকার করিলে;
তিনি চিরবাধিত হন। কেহ কেহ
আবার তাহা স্বীকার করেন না। এই-
রূপে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু
এ সকল নিম্ন নিম্ন ইচ্ছাভুযায়ী কথা
ছাড়িয়া যখন তাহার মূলকথা বলিতে
আরম্ভ করিয়াছেন, তখন সকলেই
একমত। নতুবোর পৈশাচিক প্রবৃত্তি
সংশোধন করিবার নিমিত্ত সকলেই
আত্মসংযম একবাক্যে উপদেশ করি-
য়াছেন। সকলেই বলিয়াছেন, আর্থ-
পরতাপন্য হইয়া পরোপকার সাধন
করিবে। আত্মক্লেশ স্বীকার করিয়া
পরহিত সাধন করিবে। ইহাই ঈশ্বরের
প্রীতিকর কার্য। মিথাকথায় পরের
অনিষ্ট সম্ভব, এইজন্য সত্যবাদী হইবে।
ইন্দিয়পরতত্ত্ব হইলে, অন্যের অনিষ্ট হয়
এইজন্য জিতেজিহ্ব হইবে। সত্যবাদী
জিতেজিহ্ব হইলে স্বর্গ নিশ্চয়। এইরূপ
মূলনীতি সম্বন্ধে কোন অনৈক্য নাই।

যে সকল কার্যে ঈশ্বরের প্রীতিসাধন

হয় বলিয়া মূলধর্মের সকল দেশেই বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে, এই উপলব্ধি হয় যে, ঈশ্বরের প্রীতিসাধন এ ধর্মের যত উদ্দেশ্য হউক না হউক, মনুষ্যমধ্যে ভ্রাতৃত্ববাসংবদ্ধ করা এই ধর্মের বিশেষ উদ্দেশ্য, অথবা সমাজস্বত্র দৃঢ়ীভূত করিয়া বাহ্যতে সমাজের আভ্যন্তরিকশক্তি ক্রমে বিকাশ পায় তাহার সহায়তা করা এই মূলধর্মের উদ্দেশ্য। প্রথমে ব্যক্তিগত দোষ সংশোধিত হইলে, শেষে সমাজগত দোষের অপনয়ন হইবে। আত্মামূলক ধর্মদ্বারা কয়েক হাজার বৎসর অবধি ব্যক্তিগত দোষের সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে; এই ধর্মাবলম্বীদিগের আর পূর্বমত পৈশাচিক প্রবৃত্তি নাই, সামান্য ব্যক্তিগত দোষ কোন কোন অংশে পূর্বমত থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ পৈশাচিকত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যত্ব আরম্ভ হইয়াছে। আমরা তাহাই বলিতে-ছিলাম, যে পর্য্যন্ত আগ্রামুভব হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে নূতন যুগোৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

আত্মা অমৃতত্ব প্রথম কে করিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই, যিনিই করুন তিনিই মনুষ্যের সহায়ক ছিলেন। তিনি যে বীজমন্ত্র দিয়াছেন তাহার শক্তি অসীম। এই বীজ উচ্চারণ নাহলেই মনুষ্যত্বের প্রথম দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক কাল হইবে মানবযাত্রাতে এই দ্বার দিয়া

বহিতেছে। দ্বিতীয় দ্বারে পৌছিতে বিলম্ব আছে। যে মহাগুরু দ্বিতীয় দ্বারের বীজমন্ত্র দিবেন তিনি এক্ষণে বহু দূরে। প্রথম বীজের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে শেষ হয় নাই। সে কার্য্য পরপ্রিয়তাসাধনা। তাহা সংসাধিত হইলে সমাজের আশ্চর্য্য শক্তি পরিষ্কৃত হইবে। পরপ্রিয়তা সংস্কৃত করিবার নিমিত্তই এই নূতন ধর্ম, এতদভিন্ন ইহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। এই ধর্ম এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র। মুসলমান ধর্ম বল, খ্রীষ্টান ধর্ম বল, যে ধর্মই বল কেবল নামভেদ মাত্র, সকল ধর্মই আত্মামূলক। জন্মাতা হেতু স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, ইহকাল পরকাল উৎপাদিত হইয়াছে; আত্মা হেতু জিহবা কলাপের প্রয়োজন হইয়াছে। এই আত্মা হিন্দুর আবিস্কৃত জ্ঞাতব্য আত্মামূলক ধর্ম যে আকারে যেখানে প্রচলিত থাকুক সে সকলকেই হিন্দুধর্ম বলিয়া নামকরণ করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংস্কার সূচনা।

আত্মামূলক ধর্মের আমরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। ইহকালের কাগফল পরকালে ভোগ করিতে হয় বলিয়া এ সংসারে অনেক সংকর্ষ হইয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপিও হইতেছে। কিন্তু প্রশংসা এই পর্য্যন্ত।

যিনিই যাহা বলুন, কোন ধর্ম সত্য

সত্যই পারত্রিক নহে। সমাজের মঙ্গল-সাধনার্থ সকল ধর্মই প্রণীত হইয়াছে, কেবল তাত্ত্বিক অভিধেয় পৈশাচিক ধর্মের কথা স্বতন্ত্র। নতুবা সকল ধর্মের উদ্দেশ্য মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্বাব সঞ্জন করা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভূমি কাহারও হিংসা করিবে না, কাহারও অনিষ্ট করিবে না, কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তুমি সাধামত তাহার উপকার করিবে; তোমার বামগণ্ডে চড় মারিলে, তুমি দক্ষিণগণ্ডে বাড়াইরা দিবে, মাহার ধারা নাই, তাহাকে তাহা দিবে, সকল ধর্মের এই একরূপ উপদেশ। ইহার উদ্দেশ্য কেবল সামাজিক ভিন্ন পারত্রিক নহে। অর্থদান, অন্নদান প্রভৃতি সদকাণ্ড এই সংসারের জন্য, দয়া দা-কিনা এইখানেই উপকারক।

নীতিশাস্ত্রের যে উদ্দেশ্য ধর্মশাস্ত্রেরও সেই উদ্দেশ্য। উভয় শাস্ত্রের একই উপদেশ। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞতা শিখায়, ধর্মশাস্ত্র সে বিষয়ে বরং কিছু বিরোধী। নীতিশাস্ত্রের উপদেশ যে অন্যের হিতসাধন কর, ভালই, কিন্তু তাহা বলিয়া আপনাব হিত বিস্মৃত হইও না। ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ যে আপনার হিত বিস্মৃত হইয়া কেবল অন্যের হিতসাধন কর। ধর্মশাস্ত্র বলে মিথ্যাকথা বড় পাপ, কেন না অন্যের অনিষ্ট করে। নীতিশাস্ত্র বলে মিথ্যাকথা বড় দোষ, কেন না আপনার অনিষ্ট ঘটাইতে

পারে। এইজন্য নীতিশাস্ত্র একই স্বার্থপর, ধর্মশাস্ত্র তাহা একেবারে নহে, অন্ততঃ ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ দেখিয়া বিচার করিলে, এইরূপই বোধ হয়। কিন্তু কল বিবেচনা করিতে গেলে, তাহার বিপরীত বোধ হয়। স্বার্থপরতা দ্বারা স্বার্থপরতা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। লোকের ভাল করিলে তোমার আপনার ভাল হইবে, এই প্রলোভন বাক্য এই ধর্মের প্রধান দোষ। কেবল আপনার প্রতি দৃষ্টি কর, আপনার মঙ্গল চেষ্টা কর, কিসে তোমার আপনার পরকাল ভাল হইবে, কেবল তাহাই চিন্তা কর, অনবরত এই পরামর্শ যে ধর্মের মূল সে ধর্ম আলোচনায় স্বার্থপরতা কাজেই অন্ত্যস্ত হইয়া পড়ে। একগুণকার লোকেরা কিছু স্বার্থপর বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ধর্মই হয় তাহা হইতে। অনেক বলেন যে, বয়স হইলে আমরা স্বার্থপর হইয়া থাকি, আবার ইহাও শুনা যায় যে, বয়স হইলে মনুষ্যেরা কিছু ধর্মপ্রিয় হয়; উভয় কথাই সত্য কি না জানিতে গেলে, জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, লোকে অগ্রে স্বার্থপর হইয়া পরে ধর্মপ্রিয় হয়; কি অগ্রে ধর্মপ্রিয় হইয়া পরে স্বার্থপর হয়? কেন না দেখা যায় স্বার্থপরতা ও ধর্মনিষ্ঠা একাধারে সচরাচর থাকে, মাহারা স্বভাবতঃ কিছু স্বার্থপর, তাহাদের স্বার্থস্খা যে এই ধর্মে বিশেষ পরিচূড় হইবে, ইহা এক

প্রকার বুঝা যায়। এইজন্যে স্বার্থপর ব্যক্তিরা বড় ধর্মপরাধন হয়; অথবা বলুন ধার্মিকেরা বড় স্বার্থপর হন। উভয় কথাই সম্ভব। এচলিত আত্মামূলক ধর্মের পন্থাদোষে এই সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

এই স্বার্থপর ধর্মের আর এক নান সন্ধান ধর্ম। এক্ষণে সকল ধর্মই আত্মামূলক এই জন্য সকল ধর্মই সন্ধান। একসময় হিন্দুধর্ম নিত্যম হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের বড় গৌরব। অদ্যাপিও আমরা সংকর্মের পর “এতৎ কর্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু” বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহা কথায় মাত্র, মনে আনি যে, শ্রীকৃষ্ণ এমন অবিবেচক হইবেন না, আমাদের সংকার্যের ফল অবশ্য তিনি আমাদেরই দিবেন। এক্ষণে এই সন্ধান ধর্মের বিদ্রোহী জনেকে হইয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন আমাদের হিন্দুধর্মের সংস্কার আবশ্যক।

সূচরচিত্র যেরূপ সময়ে ধর্মসংস্কার হইয়া থাকে বাঙ্গালায় যে সেরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে এমন নহে। সামাজিক অত্যাচার ধর্মসংস্কারের এক প্রধান হেতু; বাঙ্গালায় এক্ষণে সে অত্যাচারের বড় বাড়ীবাড়ি নাই, অতএব সেদিকে আশাও নাই। চৈতন্যদেবের ধর্ম সামাজিক অত্যাচারে জন্মিয়াছিল। তাত্ত্বিক কালে বাঙ্গালা ভয়ানক নৃশংস হইয়া উঠিয়াছিল, এইজন্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রয়োজন হয়। আমরা এক্ষণে সকলেই চৈতন্যদেবের ধর্ম স্পষ্ট গ্রহণ করি বা না করি

কিন্তু পাকত সকলেই বৈষ্ণব। প্রাক্তরা রাগ করিবেন নতুবা বলিতাম তাঁহারাও বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রেমধর্মের শাস্ত্রাবলম্বী। এক্ষণে বাঙ্গালির বাহা কিছু আছে তাহা চৈতন্যপ্রসাদ। চৈতন্যের দ্বাঙ্গাসমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকুক, অথবা সমাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় চৈতন্য উপস্থিত হইয়া থাকুন সে শীমাংগ এক্ষণে অনাবশ্যক। যে অবস্থায় চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেন এক্ষণে বাঙ্গালার সে অবস্থা নহে, অত্যাচার দেশে যে অবস্থায় ধর্মসংস্কার হইয়াছিল এক্ষণে সে অবস্থাও বাঙ্গালার নহে। অতএব সামাজ্যত দেখিতে গেলে এক্ষণে বাঙ্গালার ধর্মসংস্কারের সম্ভাবনা নাই অথচ বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বাঙ্গালায় ধর্মসংস্কারের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে।

পূর্বে সকল দেশে সকল সমাজে লোকে কেবল মাত্র একটি করিয়া ধর্ম দেখিতে পাইত বা একটি ধর্মেরই দুই চারিটি শাখা প্রশাখা দেখিত। ইহানীং নানা ধর্ম একত্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এই জন্য ধর্মের প্রতি এক্ষণে তত্ত্বি সকল দেশেই কিছু কিছু কানিয়া আনিতেছে। নানা ধর্ম একত্র দেখিবার ফল বাঙ্গালায় কিছু বিশেষ ফলিয়াছে। মল্লখোর প্রকৃতি এক, তবে ধর্ম স্বতন্ত্র কেন? এ কথা বাঙ্গালার গ্রাম অনেকেরই আপনা আপনি আলোচনা করিয়া থাকেন। এই কথার অন্তর্গত

সামান্য কোনও বস্তু মনে উপস্থিত হয়।
পূর্ণ এক, হঠাৎ পাথপুত্রা বহুত কোনও
সামান্যতরুন এক হঠাৎ পাথ, আর মর্মে
স্বাধা নহে কোনও হঠাৎ হঠাৎ এদে,
বিদ্য যথেষ্ট হঠাৎ স্বতন্ত্র দেশে স্বতন্ত্র
কোনও এইরূপ আশ্রয়না যে করে
স্বাধার মনে প্রচলিত ধর্মসম্বন্ধে মনেই
উপস্থিত হওয়া সম্ভব। অনেক বাসী
লির মনে সে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে,
তাহারি ধর্মসম্বন্ধে আপনাপ্রাণি আরম্ভ
হইয়াছে।

এই সংসারের সংসারক নাই, এখানে
কর্ম কে চৈতন্যদেব, জিজ্ঞাসা কবিলে
কোন উত্তর নাই। কোন পরামর্শ
নাই, বস্তু নাই, উদ্যোগ নাই, অর্থাৎ
সংসার আরম্ভ হইয়াছে। ধর্মসম্বন্ধ
নাই, ধর্মপ্রচারক নাই, কোন গ্রন্থ নাই,
অর্থাৎ চারিদিকে ইশ্বর কার্য হইতেছে।

স্বাধার এই সংসার গ্রহণ করিতে
ছেন, তাহাদের সংসারের বস্তু নাই,
উদ্যোগের এ পর্যন্ত কোন নামকরণ
হয় নাই; কিন্তু এই বস্তু তাহাদের
পুনঃপুনঃ উদ্যোগ করিতে হইতেছে
বলিয়া। ইহাদের অপাততঃ বস্তুগতী
নাম দেওয়া বাইতহে; তাহাদের আ-
পত্তি থাকে, তাহারা অন্যান্যে গ্রহণ
করেন।

অতএব কি কি বিষয়ের সংসারে আরম্ভ
হইয়াছে তাহা বলি করিন নহে। মূল
স্বাধার ইশ্বরের প্রকৃতিস্বত্ব। পুণ্যতন
স্বাধার যেসব মত বাসায়াম প্রচলিত

ছিল, তাহাতে ইশ্বর মনুষ্যপ্রকৃতি পরিণত
সাধারণতঃ দিখাস ছিল; বিদেশীরা
বাঙ্গালার আশ্রিতা প্রতিমা দেখিয়া কতই
উপস্থিত করতেন; মনুষ্যের আকার
হইতে ইশ্বরের আকার কল্পনা করা কতই
অসম্ভব বলিয়া তাহাদের বোধ হইত।
তাহারা তখন এক পৈষ্ঠা উত্তীর্ণাছিলেন,
আর একটি পৈষ্ঠা উত্তীর্ণে তাহাদের
বাসি ছিল। তাহারা আশ্রিতা ছাড়া
ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতিগড়িতেন; অথচ
তাহাদের মধ্যে সেই রীতি চলিতেছে।
মনুষ্যের মত ইশ্বর দয়াময়; বরং কিছু
বেশী। তিনি মনুষ্যের মত রাগাধ, কিছু
করত বাড়াবাড়ি। তিনি মনুষ্যের মত
প্রাণসাপ্রিয়, এই জন্য তাহার ভব পুঞ্জার
বিশেষ আবশ্যক। এইরূপ তাহারা
ইশ্বরের প্রকৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন।
বস্তুগতীদেগের মত স্বতন্ত্র। তাহারা
মনুষ্যের পাশে হইতে ইশ্বরের প্রকৃতি
অপভ্রম করেন না। এ সম্বন্ধে তাহারা
হয় ত অন্যান্য মতাবলম্বী আশ্রিতা
কিহিং উদ্বৃত্ত। খ্রীষ্টান বস্তু, মনুষ্যমান
বস্তু, কিন্তু বস্তু সকল মতেই ইশ্ব-
রিত্ব ইশ্বর মনুষ্যের মত। সকল
মতেই ইশ্বর দয়াময়, কেন না আমরা
বসায়াম। সকল মতেই ইশ্বর যম-
বাস। কেন না আমরা অসায়াম। সকল
মতেই ইশ্বর দয়াময়ী, কেন না আমরা
গোষ্ঠের দয়াকর।

অথচ প্রাণসাপ্রিয়, কিহ ইশ্বর
বে সেইরূপ প্রাণসাপ্রিয় ইহা কোন

মতেই বঙ্গবন্ধুরা বিশ্বাস করেন না। ভূমি বড়, ভূমি অতি বড়, ভূমি যাহা মনে কর, তাহাই করিতে পারি, এই বলিলে ঈশ্বর যে আপনাকে বড় জ্ঞান করেন বা তাহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হন এ কথা বঙ্গবন্ধুদিগের নিকট অতি অগ্রাহ্য। এই জন্য তাঁহাদের সজ্ঞা আলোক নাই, পূজা প্রেমার নাই। তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রশংসা করিয়া পরকাল হান্ন করিলাম মনে করিতে চাহেন না।

ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা লোকে তাহা করে না। তাহা করাইবার নিমিত্ত তিনি আপনি আসিয়া লক্ষগ্রহণ করেন, কিম্বা নান্নৈবদ্বন্দ্ব আপনার পুত্রকে কি কোন দোষকে কখন কখন পাঠাইয়া থাকেন, এ কথা বঙ্গবন্ধুর নিকট অতি অগ্রাহ্য। তাহার নিয়মে সকল হইয়াছে, সকল চলিতেছে, তিনি এ নব্বন্ধ কোন নিয়ম বাধিতে অক্ষম। এ কথা বলিলে বঙ্গবন্ধুরা হাসেন।

যে নিয়মের বলে কুঙ্গ স্তম্ভ বীর চুক্তিকা হইতে রসগ্রহণ করিতে শিখিল, সে নিয়মধারা মনুষ্য কিছুই শিখিতে পারিল না বলিয়া আকাশবাণী আবশ্যকতা হইয়াছে বা সেই জন্য ভুলিতে ঈশ্বরের আদেশ লেপার আবশ্যকতা হইয়াছে এ কথায় বঙ্গবন্ধুরা উপহাস করেন। তাঁহারা বেদ, কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ ঈশ্বরপ্রদত্ত বা ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়া স্বীকার করেন না।

যাহা সংক্ষেপে বলা গেল, তাহাই

ধর্মে। বঙ্গবন্ধুর ধর্মগ্রন্থ না পাইয়া, তাহাদের মূল মতের পরিচয় পাইয়া হইতেছে। প্রথমতঃ তাঁহারা অবতার স্বীকার করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা দেব, বাইবেল, কোরাণ, পুস্তক কিছুই মানেন না, ধর্মগ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় বলেন। তৃতীয়তঃ অর্চনা বন্ধনা, তব স্মৃতি পূজা প্রেমার তাঁহারা সকলই বঙ্গবন্ধু বলেন। তাহাদের কার্যদ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে কেবল এই তিনটি মত স্বীকৃত হইয়াছে, আর কয়েকটি মত অস্পষ্টভাবে কিঞ্চিৎ অন্তরে আছে। তাহার একটি এই যে, পরকালের দণ্ড-বিধি আইন মিথ্যা অর্থাৎ স্বর্গ মরুত মিথ্যা, পাপ পুণ্য মিথ্যা। আর একটি আরও অস্পষ্ট—আরও দূরে আছে, দেউ বোধ হয় এই, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা আপনাই হইতে ক্রমে দুর্ভাব। ধর্মকণার স্বতন্ত্রতা দুর্ভাব সমুদ্র হইয়াছে, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা গেলে সেইরূপ কি একটা হইবে তাহা অনন্তবৎ অন্যাশি হয় নাই, কাজেই নামকরণও হয় নাই।

পূর্ববর্তমানের এই যে সকল ব্যক্তি ক্রম-ঘটিয়াছে তাহা তাল কি অন্য আমরা যে সময়ে এখানে কোন কথা বলিতে প্রস্তুত নহিন। ইহাও ধর্মগ্রন্থ দ্বারা যদি বলা না যায়, তাহা হইলে আপত্তি নাই। আমাদের এই বলিবার ইচ্ছা যে, এইট ভবিষ্যৎ হিন্দুধর্মের অন্তর। গাটহাজার বৎসর পূর্বে ভাবিত

যেই আত্মার কল্পনাবারা নৃত্যমধ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল; সেই কল্পনা হইতে পদ, নবক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সকল কল্পিত হইয়াছিল। এখনে বাঙ্গালার বঙ্গবাহীর সংখ্যা বাঙ্গালার একশে অংশের অনাথা আরক্ত হইয়াছে। দীপ নিভাত অগ্ন নহে।

সমাজ সংগঠনতত্ত্ব।

সমাজ কাঁহরত কৃত নহে; কিন্তু আপন আপনি বুদ্ধিশ্রাণ্ড হইয়া থাকে। যেমন মহুঘোর শরীর বা অম্ম কোন প্রাণীর শরীর অথবা কোন উদ্ভিদ ছাতিলে পর আপন আপনি বুদ্ধি হইতে থাকে, কোন ব্যক্তি তাহাদিগের বুদ্ধি-সম্পাদন করে না; তজ্জন সমাজের নটন এবং উন্নতি কাহাবও চেষ্টা বা যত্নমাপেক্ষ নহে, কিন্তু আপন আপনি হইয়া থাকে। মহুঘোরা যেমন মহাবয়ন করে, অথবা কোন শিল্পকর্ম করে, তজ্জন কেহ সমাজের বুদ্ধিসাধন করে না। বঙ্গবাহীর রচনা কুজ্রিম, সত্ত্ববোহ কার্গা, স্বতঃসম্পাদিত নহে। কিন্তু সমাজের রচনা স্বাভাবিক, স্বতঃ-প্রবৃত্ত; বহুঘোর কাহা নহে। যে সকল জাতি বিচ্ছিন্নভাবে ব্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং যাহাদের লোকেত সংখ্যা দাঁত অগ্ন এবং বাহীরের কোন গ্রামে বা নগরে কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই; তাহাদিগকে আমরা অসমাজ জাতি বরি।

এইরূপ অসমাজজাতিদিগের মধ্যে সমাজ-বন্ধনের পুরূষাত পর্যাপ্ত হয় নাই। ইহারা বহুসংখ্যক ব্যক্তি মিলিত হইয়া, কোন গ্রামে বা নগরে কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানে বাস করিতে জানেন না, এবং সকলে সমবেত হইয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু সভ্য-জাতিদিগের মধ্যে জিন্নতাব দৃষ্ট হয়। সভ্যজাতিরা বহুসংখ্যক লোক একত্র মিলিত হইয়া অবস্থিতি করিতে ডাল-বাসে। এই একত্র অবস্থানের নাম সমাজবন্ধন। যে সকল জাতির মধ্যে সমাজবন্ধনের পুরূষাত হইয়াছে, তাহা-রই আদ্যদিগের আলোচনার বিষয়। যে সমস্ত লোক মিলিত হইয়া একটি সমাজ হইয়াছে, তাহাদিগকেই আমরা সেই সমাজের লোক বলিব। সেই সমাজ বলিলেই আমরা তাহাদিগেরই কথা বলিতেছি বুঝতে হইবে। এখন দেখা যাউক, আমরা ইতিপূর্বে যে বাক্যটি "কোটেধণ" চিহ্ন দিয়া সিথিরাতি তাহা

অন্তর্যমিত্য। যে ব্যক্তিও মনো নবে
সমাজের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাদের
শইয়া আমাদের প্রত্যাশ। এই সমাজ
ক্রেমে ক্রেমে পরিপুষ্ট ও উন্নত হইবে।
এই বুদ্ধি ও উন্নতি কাহার হাথা সম্পাদ-
নিত হয়? ইহা কুজিন, কোন ব্যক্তি-
বর্জক সম্পাদিত; না ইহা স্বাভাবিক,
স্বতঃপ্রবৃত্ত? আমরা বলি, সমাজ
কাহার কৃত নহে, ইহা আপনা আপনি
সংগঠিত হইয়া থাকে। তাহারাই এই
মত। পীকার করেন না, তাহারাই বলি-
বেন যে, সমাজ কি চেতন শস্যার্থ যে,
আপনার বুদ্ধিদান আপনি করিবে।
সমাজ কেবল নীতিগত লোকের সমষ্টি-
মাত্র। সুতরাং ইহার বুদ্ধি বা উন্নতি
মহুবোর হস্তে নিহিত, মহুবোর সম্পাদ্য
এবং কুজিন। একপ, আগন্ত করিলে
আমরা বলিব যে, আশাশিগের প্রতি-
পক্ষেরা আশাশিগের কপার অর্থ সমাজ-
কপে বুঝিতে পারেন নাই। অসংস
আমরা আশাশিগের মত আরও বিলম্ব-
কপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হইলে, সমা-
জান্তর্গত ব্যক্তিবর্গ আপনাদিগকে এক-
শাসনতন্ত্রে বদ্ধ করিতে পারে এমন
কোন শাসনশক্তি সংস্থাপনের চেষ্টা
করে। তাহারাই বলে যে, আমাদের
পরপরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার,
বাহ্যতে একত্বনের স্বয় হইবে, কাজেতে
হয় ত আর একত্বনের প্রত্য হইবে।
এবং পরপরের কাব্যাবস্থা পরপরের

আগন্ত হইলে, পূর্বনিবদ্ধ উপস্থিত
হইবে। পূর্বনিবদ্ধ উপস্থিত হইলে
আমরা আমাদের একত্র অবস্থিতি করিবা-
মস্তাবনা কোথায় তাহা হইলেই জানা-
দের সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।
অতএব সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে
পারে এবং সকলকে সমবেত হইয়া
কাব্য করিতে আদেশ দিতে পারে
এমন একজনকে আমাদের কর্তা করা
উচিত। ইহার হস্তে আমরা আমাদের
সমাজের নিয়মী নীতি দিব এবং ইনি
দেই কনতা দ্বারা আমাদের আদেশ-
পালনে নিম্নত দেখিলে উচিত পণ্ডবিধান
পূর্বক উচিত পথে আনিতে পারিবে।
এই প্রকারের সমাজের উন্নতির বৃদ্ধপত্তন
হইয়া থাকে। যে ব্যক্তিকে সমাজ
চালাইবার কনতা দেওয়া হয়, তাহাকে
সমাজের লোকেরা রাজ্য বলে। সমাজ-
বন্ধনের প্রারম্ভেই রাজ্য হস্তে সম-
নিয়মী কনতা প্রদান করিতে হয়, না
করিলে সমাজ চালাই না এবং উন্নতিলাভ
করিতে পারে না। অতএব সমাজের
প্রথম অবস্থায় একজন মোহা থাকে
একান্ত আবশ্যিক। ইহারই প্রদেশ
মত সমাজ বিতর্কক কাব্য সম্পাদিত
হইবে এবং তাহাতেই সমাজের উন্নতি
হইবে। কিন্তু সামাজিক উন্নতি যত
অধিক হইতে থাকবে, ততই সমাজের
সম্মতিগত কনতা রাজ্য হস্ত হইতে
সমাজের লোকগোষ্ঠার হস্তে যা-
ইবে, এবং সম্মতিগত সমাজের শাসন

প্রজাতন্ত্রপ্রণালীতে প্রবর্তিত হইবে। প্রজাতন্ত্রপ্রণালীর স্বত্বপাত হইলে, প্রজারা আপনাদিগের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়ে এবং এ সকল প্রতিনিধি উপরেই সমাজসংস্কারের ন্যস্ত হইবে। কেবল দেখিতে হইবে এই যে কৃত্রিম উন্নতি, ইহা কে করিল। ইহা কৃত্রিম কোন বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত; না ইহা স্বতঃপ্রসূত, স্বসম্পাদিত। আনাদিগের প্রতিপক্ষের বনিবন ঘে, ইহা প্রথমাবস্থায় রাজ্যকর্তৃক সম্পাদিত, পরে সমাজের লোকসাধারণকর্তৃক সম্পাদিত এবং সর্বশেষে প্রজাদিগের প্রতিনিধিবর্গকর্তৃক সম্পাদিত। কিন্তু রাজ্য কে? রাজ্য কেবল সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের সর্বসম্মতিক্রমে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বিশিষ্ট একজন মহামন্ত্রী। রাজ্য সমাজের ইচ্ছাকৃত, তিনি সমাজের অধীন। তিনি এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না, যাহা সমাজের অনিষ্টকর, যাহাতে সমাজের অসঙ্গল পড়িবে এবং যাহা সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের ইচ্ছামূলক নহে। মেরুপ ব্যবস্থা করিলে, শীঘ্র তাঁহার গোপ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার ক্ষমতা নষ্ট হইবে। ইংলণ্ডে, অধিকার জন্মেরেণ দে চিত্রিনিয়ের জন্য নৃত্যন সোমিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে কৃতকাব্য হইতে পারেন নাই, এবং পূর্জসম ব্যবস্থা সকল যে অসঙ্গত তাঁহার মৃত্যুর পরে সমাজে প্রাউপ্রাণত করিয়াছিল,

তাঁহার কারণ এই যে, সমাজের বুদ্ধি বা উন্নতি কৃত্রিম নহে, কোন মহাব্যক্তিক চালিত হইতে পারে না। সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের যে সকল অভাব ও ইচ্ছা থাকে, তদনুসারেই সমাজের বুদ্ধি বা উন্নতি হইবে। অতএব সমাজের অভাব ও ইচ্ছা সমাজের উন্নতির নেতৃবর্গ। এই অভাব পূরণ এবং এই ইচ্ছাকৃত কাব্য করিতে সমাজ আনাদি চণিবে; অন্যের প্রার্থনার আধিপত্য রাখিবে না। সমাজ চণিবে বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, সমাজের অন্তর্ভূত লোকগণ কাব্যে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে, সমাজের উন্নতি স্বতঃপ্রসূত, স্বাভাবিক, পরসম্পাদিত বা কৃত্রিম নহে। এইরূপে সমাজে প্রথম অবস্থা উদ্ভাবন হইয়া পরগণবদী অবস্থাতে উপনীত হইবে। এখন সমাজের লোকসাধারণের হস্তে সমাজসংস্কার, তখনও সমাজ নিজে চলিতেছে। আবার এখন প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়া প্রতি নিধবর্গের হস্তে সমাজসংস্কার ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তখনও সমাজ স্বতঃপ্রসূত, নিজ অভাব ও ইচ্ছার অনুসারে চলিতেছে। কোন সমাজেই সমাজ অপার কোন মহাব্যক্তির করায়ত্ত নহে। আপন কোন ব্যক্তিই সমাজকে নিজের মত করিয়া গাড়িতে পারিবেন না। আমি এই প্রবর্তি আমায় মনের মত করিয়া গাড়িতে পারি, এবং সেই রকম প্রবর্ত

করিলে ইহা আমার কৃত বলিরা নির্দেশ করিতে পারি। এই প্রকার ঘটনা সহস্রাং কল্পিত হইল, ইহা আমার কৃতি, ইংরেজিতে বলিব, ইহা আমার “ম্যানু-ফ্যাকচার” (Manufacture) কিন্তু প্রাণি দেহ অথবা বুদ্ধিদ্বিত বুদ্ধি কাহারও সাধারণ নহে, উহা আপনাপনি বাড়ি-বেই বাড়িতে, জুশি যত কেন উহার ব্যাঘাত কর না। এইরূপ বুদ্ধিকে কল্পিত বলা যায় না, ইহা স্বাভাবিক, স্বতঃপ্রসূত। ইংরেজিতে ইহাকে “গ্রোথ” (Growth) বলিবে। এক্ষণে Manufacture এবং growth এই শব্দদ্বয়ের যে কি প্রভেদ তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর বুঝাইতে আশাদের সাধা নাই। আমরা তাঁহার নিকট হার মানিব। যিনি আমাদের অর্থগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আমাদের সঙ্গে আসুন। আর যিনি আমাদেরকে হার মানাইতেছেন, তিনি যেন আমাদেরকে অনুসরণ করিয়া আব্রহ লজ্জিত না করেন। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কেন ইংরেজিতে বলা “Society is a growth and not a manufacture.” এবং ইহাই আমরা পূর্বে “সমাজ কাহারও কৃত নহে, কিন্তু আপনাপনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে” এই বাক্যদ্বারা প্রকাশ করি-রাছি। সমাজ বন্ধনের চক্রে আমা-দিগের মধ্যে অতি অল্প বলিয়াই আদা

দিত্বকে এক নিমিত্ত হইল, মতলা আমরা দুই পাশ্বেইই আমাদের মনোমত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতাম, এবং পাঠকগণকে এত কষ্ট দিতাম না।

অনেকে বলেন যে ইংরেজরাই সভ্য-তার সর্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া-ছেন। কিন্তু এই ইংরেজদিগের মধ্যে এই উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে যখন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ (Sir James Mackintosh) জেমস ম্যাকিন্টস নামের বলিয়াছিলেন যে “constitution are not made, but grow” অর্থাৎ কোন শাসনতন্ত্রই অনেকের দ্বারা কৃত, বর্দ্ধিত এবং উন্নীত হইতে পারে না কিন্তু আপনাপনি বৃদ্ধি এবং উন্নতিলাভ করে, তখন সকলেই আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে ধনা ধন্য করিয়াছিল। আবার এখন-কার ইংরেজেরা বলিবেন যে ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে ম্যাকিন্ট-সের এই সভ্যপ্রচারে সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ধনা ধনা করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইদানীন্তন অবস্থাতে এই সভ্যের চমৎকারিতা থাকুক বা না থাকুক ম্যাকিন্টসের সময়ে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বের উৎকর্ষ লাভিত হয় নাই যে তখন এই সভ্য লোকমন আকৃষ্ট না হইবে। তখন সমাজে সাধারণ শিক্ষার অভাৱে যেরূপ ছিল তাহাতে উপরিউক্ত সভ্যের প্রচার দ্বারা লোকে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। সে সময়ে সুল-লেই দক্ষিণ কনিম্বাদার্গ দেখিতে পা-

ইত, কেহই বস্ত্রপ্রযুক্তি ও বুদ্ধি বীকার
করিতে চাহিত না। অর্থাৎ সকলেই
manufacture মত মানিত, কেহই
growth মত মানিত না। তাহাদিগের
মধ্যে ইহাই প্রচলিত মত ছিল যে ঈশ্বর
গ্রহণকে সহজে স্বর্গের চতুর্দিকে
স্থাপিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে
একপ বেগবিশিষ্ট করিয়াছেন যে তাহারা
স্বর্গের আকর্ষণানুসারে স্ব স্ব কক্ষে
ভ্রমণ করিতে পারে। আমরা যেমন
কোন কার্য করিয়া শ্রান্ত হইলে বিশ্রাম
করিয়া থাকি, তজ্জপ ঈশ্বরও পৃথিবীর
কুটিলগলবলবিভাগ, জীবসৃষ্টি প্রভৃতি
কার্য করিয়া শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়া
ছিলেন। আমরা যেমন মাটির পুতুল
পড়িয়া থাকি, ঈশ্বরও তজ্জপ মহামাকে
পড়িয়াছিলেন। যে সময়ে এই সকল
মত প্রচলিত ও আদৃত ছিল, সে সমা-
জের যোকে ম্যাকিণ্টেমের সভ্যপ্রচারে
আশ্চর্য্য হইবে তাহার বৈচিত্র্য কি ও
তাহারা মনে করিত যে হয় ঈশ্বর অথবা
সমাজকে উন্নতির পথে চালাইতেছেন,
না হয় ব্যবস্থাপকদিগের রাজবিশি ঘারা
সমাজ চালিত হইতেছে, অথবা এতদ্-
জয়ের দ্বারা সমাজ বৃদ্ধি ও উন্নীত
হইতেছে। ম্যাকিণ্টেম নূতন কথা
বলিলে তাহারা কোন বিশ্বস্ত না হইবে
এবং তাহাতে ধন্যরূপ প্রদান না করিবে।

সমাজ যে ক্রমবিকাশে সজ্জিত ও
চালিত নহে তাহা এক্ষণে অনেকে বু-
ঝিতে পারিয়াছেন এবং অনেকেই বলি-

তেছেন যে এতদিন এ সভ্য কেন
প্রকাশ হয় নাই। ইহা দ্বারা উৎসাহিত
হইতেছে যে, ইতিহাস পাঠের অতি
সামান্য ফল ফলিয়াছে। আমরা যদি
আমাদিগের চতুর্দিকে যে সকল পরি-
বর্তন হইতেছে তাহা দেখি, কিম্বা কি
রূপে সমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে তাহা
বিশেষরূপে অনুসন্ধান করি, তাহা হই-
লেই বুঝিতে পারিব যে কোন অলৌ-
কিক ঘটনা অথবা কোন ব্যক্তিগত
ইচ্ছা সমাজের বুদ্ধি ও উন্নতিসাধন
করিতে পারে না এবং ইহাই আমাদের
প্রতীতি হইবে যে সামান্য আভাবিক
কারণ হইতেই সমাজের উন্নতি হইয়াছে।
সমাজে পরিশ্রম বিভাগ এবং কার্যবিভাগ
(division of labour) পর্যালোচনা
করিলেই এই সভ্য আমাদের বদনধরম
হইবে। সমাজে কতকগুলি লোক
স্বভাবতঃ কৃষির প্রতি গমনোযোগ প্রদান
করে এবং কতকগুলি লোক নানাবিধ
কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কিছু
রাজার আদেশে ঘটে না, তবে তাহারা
নিজ নিজ অভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে
ভিন্ন ভিন্ন কার্যে প্রবৃত্ত হয়। অসভ্য-
বস্থায় লোকে পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া
কার্য্য করে। কেহ কাহার মুখাপেক্ষা
করে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের
আবশ্যকমত সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে
সুতরাং কেহ কোন কার্য্যে বিশেষ মনো-
যোগ দিতে পারে না এবং কোন বিষয়ে
বই উন্নতি হয় না। কিন্তু সমাজবদ্ধন

ঠিক সময়ে লেখক পত্রিকার
স্বাধীনতা না থাকিলে, পরস্পরের সাহায্য
না হইয়া কোন ক্রমেই থাকিতে পারে
না। ইহাই সমস্ত আশা-আশা উন্নত হয়।
তাহার আশা-আশার মধ্যে সমস্ত
কার্য বিভাগ করিয়া লয় এবং পরস্পরে
পরস্পরের সাহায্য করে। এইরূপে
কার্য করিলে সকলেরই উপকার হয়
এবং সমস্ত ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে
আবেশন করিতে থাকে। অতি প্রাচীন
কালে ভারতবর্ষে ও মিসরদেশে এই
কার্য বিভাগ প্রণালী দ্বারা সমাজের
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহাই
সমাজের প্রকৃতি যে ইহার অন্তর্গত
লোকেরা নিজ নিজ স্বভাব ও প্রবৃত্তি
অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন
পূর্বক পরস্পরের সহায়তা করিলে।
ইহা কোন বাহ্য বল প্রয়োগ দ্বারা করা
ইবার নহে। এই কারণেই ইংলন্ড
দেশে সহস্র সহস্র লোক ব্যাক্তারের
কাপাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, ইতালীতে
শুশ্রূষার কাপড় তৈয়ার করিতেছে, রা-
ফোর্ড সাহেব মস্তিকার ও কাচের বাসন
নির্মাণ করিতেছে, সেন্সিভে টুরি কাচি
প্রস্তুত করিতেছে এবং বারমিত্রের
লৌহের জিনিসপত্র গড়িতেছে। ইহা
কিন্তু কানার জ্বলন তাহারা করিতেছে
না, তবে নিজের স্বভাব পূরণের জন্য
প্রবৃত্ত হইয়া করিতেছে। তাহোক
যাকিউ নিজেই জড়িলার সাধনে ধর-

লিল, কেহই অতিশয় বিভাগ বা কার্য
বিভাগের জন্য রাজ নহে, তথাপি
সমাজে পরিশ্রম বিভাগ বা কার্য বিভাগ
প্রচলিত হইতেছে এবং নিঃশঙ্কে ও
অজ্ঞাতমারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।
যেমন বীজ হইতে গালা নির্গত হইলে
কেহ তাহা লক্ষ্য করে না কিন্তু ঐ বীজ
নিঃশঙ্কে ও অজ্ঞাতভাবে ক্রমে ক্রমে
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইলে
সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ কার্য-
বিভাগ ধরন প্রথমে সমাজে প্রবেশ
করিয়াছিল তখন কেহই ইহা জানিতে
পারে নাই, কিন্তু এক্ষণে ইহা পূর্ণাঙ্গ
হইতেছে সুতরাং সকলের দৃষ্টিগোচর
হইয়াছে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করি-
তেছে। এই পরস্পর সাপেক্ষতা যদি
সমাজে না প্রবর্তিত হইত, তাহা হইলে
কি সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলিত? সমাজ
এইরূপে সনবেত হইয়া কার্য করে
বলিয়াই সকলের অভিযোগোচন ও ইচ্ছা
পূরণ হইয়াছে। আজ যে সমাজের
সর্বত্র সুশৃঙ্খল বিরাজমান উন্নতি
পরিবর্তমান, তাহার প্রাণি কারণ এই
যে কাল আমরা স্থির করিয়াছি যে
পরস্পরের সহায়তা করিব এবং সকলে
সনবেত হইয়া সকলের উপকার
সাধিব। কিন্তু যদি আজ আমরা
প্রতিজ্ঞা করি যে আর দোহা করিব না
তবে এক সমাজের মধ্যে সমাজে কোন
বিশৃঙ্খলা ঘটবে, অনেক ব্যক্তিকেই
শমনভবন দেখিতে হইবে এবং সমাজে

সেগের মূর্খি কালী হইয়া পাইবে। সমাজের এই সমস্ত অত্যাশঙ্ক এবং প্রত্যাশা ধনোন্মত্ত যদি সামাজিক কারণে উৎপন্ন হয়, তবে ইহা অকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজের গতি আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত, অনাচালিত নহে। সমাজের প্রধান প্রধান শৃঙ্খলাগুলি যদি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তপাতিত হইল, তবে অপ্রধান সামাজিক শৃঙ্খলাগুলিও যে স্বাভাবিক হইবে তাহার আর বিচিন্তা প্রয়োজ্য কি?

এখানে পাঠক বিজ্ঞান্য করিতে পারেন যে, বাস্তবিক অর্থাৎ আইনকানুন দ্বারা যে সকল সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তৎসমূহকে growth না manufacture? পার্থক্যটা মনোমতা, স্থিতিম, পৌজিক বা লেজিসলেটন দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত নিবিধি এরিতি করি যেন এবং সকলকে সেই সকল বিধি মানন করিতে আদেশ দিগেন। ইহা প্রায় সমাজের অবস্থা পরিবর্তিত হইল, এবং সমাজ উন্নতিগণে পরিণত করিল। সমাজের এতদূর ক্রমিক কি স্বাভাবিক, manufacture কি growth? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, আমরা যে সমস্তই শিক্ষা করিমাছি, ইহা তাহার প্রমাণভূত নহে; এই পরিবর্তনময় ও সমাজের নবোন্মেষরূপে প্রকাশ্য করে দেয়। যদি উক্ত পরিবর্তন সকল হই চারি দিনের জন্য হয়, তবে সে সকল পরিবর্তনই নহে, এবং সমাজের

তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু যদি ঐ সকল পরিবর্তন বাস্তবিক এবং নিত্য হয়, অর্থাৎ প্রকৃতরূপে এবং চিরদিনের নিমিত্ত ঘটয়া থাকে, তাহা হইলেও আমাদের কণা মতা, যে হেতু ঐ সকল সমাজের প্রকৃতি, রাষ্ট্রবিধি প্রাণিকরিতা নামমাত্র। বাস্তবিকের আদেশ হিসাবে ঐ সকল পরিবর্তন হইয়াছে, সত্য, কিন্তু বাস্তবিকের উদ্ভবকণ আদেশ কবির আরও কারণ কি? কেহা সমাজের যেকোন অঙ্গান দেখাছেন, তাহার প্রতিবিধান জন্য ঐ সমস্ত আদেশ করিয়াছেন। স্বতরাং মূল দেখি সমাজের ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি বহির্ভূত, সমাজের উপযোগী না হইলে কোন আইনকানুন প্রচলিত হইতে পারে না। সমাজের লোকবিরোধিতা ও প্রতি হইতেই যদি পূর্বোক্ত পরিবর্তনসমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তবে সমাজই তাহাদের প্রকৃত প্রবর্তক কারণ, বাস্তবিকগণ কেবল নামমাত্র প্রবর্তক। কেহএব সমাজের বুদ্ধি, পরিবর্তন ও উন্নতি যে সমাজের আত্মপ্রকাশ শক্তি হইতে, প্রবৃত্ত হয়, কোন ব্যক্তি কারণে পরিচালিত হয় না, সে পক্ষ অব্যাহত রাখি এবং পূর্বোক্তা দৃষ্টীকৃত হইল। সমাজের গতি, বুদ্ধি, উন্নতি, প্রবর্তন সকল যাহাই হুগ, নামমাত্র সমাজ ও ইহা সমাজের মুখ। এই অঙ্গান ও ইহা হইতেই সমাজের উপকারিতা বাস্তব মানন এবং

কিছু হইতেছে এবং সমাজের অনিষ্টজনক
ব্যবস্থা সকল নিবৃত্তি হইতেছে।
সমাজের অভাব ও ইচ্ছা সমাজকে যে
রিকের চালাইবে, যেদিকে ফিরাইবে,
সেদিকে লইয়া যাইবে; সমাজ সেইদিকে
চলিবে, সেইদিকে ফিরিবে, এবং সেই-
দিকে যাইবে। সমাজের উত্তর সামা-
জিক অভাব ও ইচ্ছার ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চা-
দুখী। অতএব কোন জাতির উপর
সেই জাতির অভাব ও ইচ্ছা দক্ষিণ-
ভাবে ক্ষমতা প্রকাশ করে। সমাজের
বাহিরের কোন ব্যক্তি যে সমাজকে
তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া গাড়িবেন, বা
তাহার ইচ্ছাফসাসে চালাইবেন, তাহার
যে নাই। সমাজ স্বাধীন; স্বশক্তির
আমল; পরাধীন, পরবশ নহে। তিনি
সমাজের গতির সাহায্য বা বাধাত
করিতে পারেন; কিন্তু বেজামত নির-
স্ত্রণ করিতে পারেন না। সমাজ আপন
অভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে আপনি
সংগঠিত হইবে; বাহ্যিকও কখন মানিবে
না, কাহারও বাধা শুনিবে না। সমা-
জের পারিভ্রমিক সংগঠন (industrial
structure) সম্বন্ধে আমাদের মত দেশ
সম্পূর্ণরূপে অমান্বিত হইয়াছে, সমাজের
অন্যান্য সংগঠন সম্বন্ধেও আমাদের মত
সেইরূপ সম্পূর্ণরূপে মতা।

সকল ব্যক্তিরই এবং সমাজস্বত্ব-
বোধ মতো যে মানুষ আছে ইহা বহু-
কাল পূর্বের বিজ্ঞসমাজে জ্ঞাত ছিল।
আমরা প্রাচীন কালের সাহিত্যেও এ

বিষয়ের আভাস দেখি, কিন্তু সে আভাস
অতি অপরিপুষ্ট এবং নানাতিক্রান্ত
নিক। শাস্ত্রবিদ্যার জন্মবেত্তা যাহা
এই মানুষ্য পরিপুষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইতে
পারে নাই। বিন্যাস দার্শনিক প্রেট
যে মূলভাবের উপর তাহার আদর্শ
সাধারণতঃ সমাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন
তাহা সমাজের অঙ্গসকল এবং মনো-
মনের শক্তি সকলের মানুষ্য স্বাভাবিক
আর কিছুই নহে। তাহার আদর্শ
সাধারণতঃ সমাজের মূলভাব অর্থব্যবস্থা
এই ছিল যে মনোবোধ সামান্যিকশক্তি
জন্মিত যে পারস্পরিক স্বত্ব, সমাজের
অঙ্গগুলিরও উজ্জ্বল স্বত্ব আছে।
মানসিকশক্তিগুলিকে বিবেক, ইচ্ছা
এবং প্রবৃত্তি এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত
করিয়া, তিনি সমাজের অঙ্গগুলিকেও
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।
প্রথম শ্রেণী মজিগণ, বৈহারা শাসন
কার্যের নিয়মাবলী সংস্থাপন এবং
শাসনকার্য্য নিক্ষেপ করিবেন। দ্বিতীয়
শ্রেণী কর্মসম্পাদকগণ, বৈহারা প্রথম
শ্রেণীর আদেশ ও নিয়ম সকল কার্য্যে
পরিণত করিবেন, ইংরেজিতে - ইহা
নিম্নকে exclusive বলিবে। তৃতীয়
শ্রেণী সমাজের সাধারণ লোক, বৈহারা
অর্থ উপার্জনে এবং আর্থব্যবহার
করিতে অত্যন্ত প্রবৃত্ত। মজিগণ সমাজ
শাসন করিবার নিয়মাবলী প্রকটন ক-
রেন এবং সমাজ শাসন করেন, এ
তিনিষ্ট তাহাদিগকে শাসনকর্তা বলা

সাইকেল পায়ের। কর্মসম্পাদক শ্রেণী শাসনকর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে কার্য করিয়া সমাজ রক্ষা করেন এ নিমিত্ত তাঁহারা সমাজের রক্ষক। সাধারণ লোকেরা নানাবিধ শিল্পাদি কর্ম করিয়া সমাজের উপকার করে বলিয়া তাহারা সমাজের কারিকর। মেটোর গ্রন্থ আমা দিগের নিকটে থাকিলে আমরা স্থানটি উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম। কোচু কল্যাত্রাত পাঠক লণ্ডন নগরে ১৮৪৯ সালে Henry Davis, M. A. কর্তৃক প্রকাশিত মেটোর গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে Republic শীর্ষক গ্রন্থে অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন। মেটো বলেন যেমন কোন বস্তুর অংশগুলি মনুষ্যের দ্বারা নির্মিত ও সজ্জিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার আদর্শ সমাজতত্ত্ব-সমাজও মনুষ্যদ্বারা নির্মিত হইবে। তাঁহার মতে সকল সমাজের বুদ্ধি এবং উন্নতি সাধারনতঃ এইরূপ ক্রটিমতঃ অঙ্গিয়া থাকে। মেটোর এই শ্রেণী-বিভাগ এবং সমাজের কোন যন্ত্রণা পটন আমাদের বুদ্ধিতে ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না। সমাজের সহিত মনুষ্যশরীরের দৃঢ় আন্তর্য্যামবা স্বীকার করি। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ইচ্ছাশক্তি এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তি শক্তির সহিত কিরূপ সাপেক্ষ থাকিতে পারে আমরা বুঝিতে পারি না। যদি কার্যসম্পাদক বা executive সম্প্রদায় শাসনকর্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্ত এবং তদনুসারে কার্য

সম্পাদন করিলে, তবে তাঁহার মনের ইচ্ছাশক্তির অনুকূলক প্রকারে হইতে পারেন এবং শাসনকর্তৃপক্ষই ইচ্ছাশক্তির কার্য করিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণী কেবল তাঁহাদের চালিত ভূতোর মতন কার্য করিলেন। আবার প্রবৃত্তিশক্তি হইতে ইচ্ছাশক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং বিবেকশক্তি এই সমস্ত পরিদর্শন করে। অত্র আমাদের কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, পরে আমরা উহা লাভ করিবার ইচ্ছা করি এবং বিবেক ঐ ইচ্ছা উচিত বলিলে আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই। অতএব মেটোর শ্রেণী-বিভাগ মতে সমাজের কারিকরগণ কার্য-সম্পাদকদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত করিবে। কিন্তু ইহা কি আমরা সমাজে দেখিতে পাই, অতরাং মেটোর শ্রেণীবিভাগ যুক্তিস্কট নহে। মেটো যে তত প্রাচীন কালে এইরূপ সাপেক্ষ উদ্ভাবন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ইহাই তাঁহার মানসিক উন্নতির ও গৌরবের বিশেষ পরিচয়। তিনি মনুষ্যের মনের সহিত সমাজের তুলনা করিতে গিয়া জন্মে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি যদি মনুষ্য শরীরের সহিত সমাজশরীরের তুলনা করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে উভয়গত সাম্যভঙ্গি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইতে পারিত এবং তিনি উভয়ের সাপেক্ষ উদ্ভাবনে অধিকতর সফল প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। মনুষ্যশরীর ছাতিমা কেবল প্রাণিশরীরের সহিত

সমাজের তুলনা করিলে আরও স্পষ্ট হইত। মহুবারের শরীর বা মহুবারের মনের সহিত সমাজের অঙ্গগত পার্থক্য স্বীকার করিবার কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। এই বিষয়ের উপর অবিকল তেমনীসফাফন করিয়া কোন লাভ নাই, কারণ ইহা গভীরতর। শ্রেণীভাগ সম্পর্কে এই পর্যন্ত। মেটো সমাজের গঠন ঘটকাবসের ন্যায় কল্পিত বলিয়াছেন। তাঁহার জুড়ির সাধারণতঃ সমাজে ideal এই যে মহুবার। জাতগারে এই সমাজ নির্মাণ করে এবং তাঁহার মতে অন্যান্য সমাজও এইরূপে কৃত্রিমভাবে সংগঠিত হয়। এটিও প্রমাণ্যক মত, তাহা আর পার্থক্যপক্ষে বুঝাইতে হইবে না, কারণ আমরা পূর্বে অনেকক্ষণ ধরিয়া সমাজের স্বতঃপ্রসূতি ও স্বাভাবিক উন্নতি প্রামাণিত করিয়াছি। অতএব চর্চিতচর্চন এরূপে নিশ্চয়োৎপন্ন। মেটোর মত নির্দেশ না হউক, তিনি যে এই চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং চিত্তাঙ্গীল জীবনগের চিত্র এ দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, এই জন্যই তিনি জামাদিসের আন্তরিক বিশ্বাস পনাবকের শাস্ত্র। সমাজবিজ্ঞানশাস্ত্রের হৃদয়গত যে তাঁহার এই চিন্তা হইতে, উহা কে না মূলকণ্ঠে স্বীকার করিবে?

মেটোর মত বুঝাইতে এতক্ষণ গেল, এখন আর একজন দার্শনিক (Hobbes) এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন তাহার সমা-
লোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইনি

মেটোর ন্যায় সমাজমনোঃ মতঃ সমাজের তুলনা করেন নাই, মহুবারীতির সহিত সমাজজীবনের তুলনা করিয়া কল্পিতেন। সমাজসংগঠন দৃষ্ট হইবার মত ব্যক্তিদিগের প্রাচুর্যে তিনি বলিয়াছেন "যে সাধারণতঃ সমাজ জীবন মহুবারের শরীর একজস্য, সমাজজীবন সমাজকে একটা মৃত্যু কল্পিত মহুবার বলিগোচর চলে। স্বাভাবিক মহুবার আরতন ও বল জতি করা, কিন্তু এই কল্পিতমহুবারের বল ও আরতন অত্যন্ত অধিক, যে হেতু ইহা স্বাভাবিক মহুবার রক্ষার নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সমাজে আধিপত্য অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা প্রাণস্বরূপ, কারণ ইহা দ্বারা ই সমাজ সমাজের স্থিতি ও গতি সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়া থাকে। আনন্দীয় হইলে মহুবারের শরীর অপব্যয় ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, সমাজও শাসনশাস্ত্রের অভাব হইলে নানা বিপদগোচ্যযোগ ঘটে। মালিট্রেট, বিচারক এবং অন্যান্য শাসনকাণ্ডানির্কর্তাদের সমাজশরীরের এই প্রকরণ। গুরুর এবং মৃত সমাজের শিষ্টাঙ্গরূপ, কারণ সমাজের প্রাণি এবং অঙ্গ সকল ইহাদের দ্বারা শাসনশাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া নিজ নিজ কণ্ঠে সম্পন্ন করে। মহুবারীতির নিরাঙ্গক লোকে যে উপসর্গাঙ্গী এবং উপকারিতা সমাজে মৃত ও শূন্যতারের সেই উপসর্গাঙ্গী এবং উপকারিতা। সমাজের মনিকবলের ধনসম্পত্তি সমাজের ধন

অঙ্গণ; সমাজাঙ্গণের ব্যক্তিদিগের অংশ-
প্রাণদ্বিনিধান সমাজশরীরের কাষাঙ্গণ; যন্ত্রিবর্গ (যাহা অসমাজের অবশ্যক
কর্তব্য সকলের উপদেশ পায়নি করেন),
সমাজশরীরের অতিশক্তিঅঙ্গণ; ন্যায়-
প্রভা এবং আইনকাগুন, নিষেধ ও
ইচ্ছা অঙ্গণ; সমাজের মিল প্রাণতি,
স্বাস্থ্য অঙ্গণ; সমাজবিলম্ব, গীড়াঙ্গণ;
এবং আভ্যন্তরিক যুদ্ধবিগ্রহাদি সমাজ-
শরীরের দুর্ভাঙ্গণ।” Hobbes এই
বিষয়টী বোঝান বিশদভাবে বাক্য করি-
য়াছেন তাহা পাতকগণ উপরি নিম্নে
মুদ্রিত হইতে দেখিতে পারিবেন।
তথাপি আমরা original টি উদ্ধৃত
করিয়া দিতেছি।

“For by art is created that
great Leviathan called a Com-
monwealth or state; in Latin
Civitas, which is but an artificial
man: though of greater stature
and strength than the natural,
for whose protection and defence
it was intended, and in which
the sovereignty is an artificial
soul, as giving life and motion
to the whole body; the *magistrates*
and other officers of judicature
and execution, artificial joints;
reward and punishment, by which,
fastened to the seat of sovereignty,
every joint and member is moved

to perform his duty, are the
nerves, that do the same in the
natural body; the *wealth* and
riches of all the particular mem-
bers are the *strength*; *salus*
populi, the *peoples safety*; its
business; *counsellors* by whom all
things needful for it to know are
suggested unto it are the *memory*;
equity and laws, an artificial
reason and will; *concord*, health;
sedition, *sickness*; *civil war*,
death.” The works of Thomas
Hobbes. Edited by Sir. William
Molesworth, London.

সমাজঙ্গণ অর্থাৎ কৃত্রিম মনুষ্য,
যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনুষ্যসম্বৎসর্য নি-
শ্চিত, এবং প্রকৃত মনুষ্যের তুলনা
করিয়া গিয়া Hobbes সমাজশরীরের
একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,
এবং উভয়ের সাদৃশ্য আনুপূর্বিকরূপে
নির্দেশ করিয়াছেন। যদ্যপি এই চিত্র
এবং স্কেটের চিত্র ভিন্নপ্রকার ও গর-
প্পাৱিষ্ট, তথাপি আমরা ইহাও এই
অধিক প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতেছি।
কিন্তু উভয়টীই অসঙ্গতিপরিপূর্ণ এবং
অসঙ্গতিবোধবিশিষ্ট। ইহাদের অংশ-
প্রাণ প্রসঙ্গের মিল নাই, এক অংশ
অন্য এক অংশের বিরোধী। যদি
অবিগত বা শাসনশক্তি সমাজের
প্রাণাঙ্গণ হইল, তাহা হইলে সাদৃশ্য

স্ট্রেট প্রকৃতির কল্পে গ্রহি হইতে পারেন; কারণ তাঁহারা ত শাসনকর্তৃ-
দিগের আত্মনিবি ব্যতীত আর কিছুই
নহেন। যদিই মাজিষ্ট্রেটগণ প্রতি দৈ-
নেন, তথাপি পুরস্কার ও দণ্ড কল্পে
শিরা হইল। সমাজশরীরের গ্রন্থিসকল
যদি ব্যক্তি হয়, তবে শিরা সকল কি
অপরাধ করিয়াছে যে, তাহারা ব্যক্তি
হইতে পারিবে না। শিরা সকল সমা-
জের একশ্রেণীর লোক হওয়া উচিত।
দণ্ড ও পুরস্কার প্রকৃতপক্ষে কোন
ব্যক্তির হানীর হইতে পারে না, বরং
সেই ব্যক্তির অবস্থা হইতে পারে।
এতদ্ব্যসারে দণ্ড এবং পুরস্কারকে
শিরা সহিত তুলনা না করিয়া, শিরা
অবস্থার সহিত তুলনা করিলেই ভাল
হইত। আর বৃত্তিজ্ঞান, বিবেকশক্তি,
ইচ্ছাশক্তি এই তিনটি মানসিকশক্তির
সহিত সমাজের মন্ত্রিবর্গ ন্যায়গরত
এবং আইনকাহ্ননের উপমা দেওয়া
ব্যক্তির কার্য্য হয় নাই। এরূপ বিজ্ঞা-
তীর উপমা হইতে কোন ফলপাত
নাই। মন্ত্রিবর্গ একদল সাধারণ কর্ম-
চারী, এবং অপর দুইটি কেবল আ-
মাজ। উপমাস্ত্রি কেবল মানসিক
শক্তি, কিন্তু উপমায়গুলির একটি কর্মচারী
মহুয়া, এবং অপর দুইটি যে কি বলিয়া
তাহা বলিতে পারি না। অতএব এই
উপমা সমীচীন নহে। আমরা গ্রেটের
উপমার যে দুই দোষ দেখাইরাছি,
হব্‌সের উপমাবও সেই দুইটি দোষ

রহিয়াছে। Hobbes সমাজের ক্রম
মহা অধিকতর স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন
কারণ তিনি বলিয়াছেন, "For by
art is created &c." এবং ইহার
সকলেই বুঝিতে পারেন যে তিনি সমাজ
সংগঠন সম্বন্ধে কোন মতাবলম্বী হি-
সেন। তিনি কেবল সমাজসংগঠন
কৃত্রিম বলিয়া স্মৃষ্ট নহেন। তিনি
আরও বলেন যে, সমাজবন্ধন হইলে,
সামাজিক লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে
যে একটা বন্দোবস্ত (social compact)
করে, তাহাও কৃত্রিম। তিনি এই
বন্দোবস্তকে মানুষ্যটির সহিত তুলনা
করিয়াছেন।

গ্রেটের মত সমালোচন করিতে
আমরা যে করেকটি কথা বলিয়াছি;
হব্‌সের মত সমালোচনারপক্ষে তাহাই
বলিব। সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন
নাই। সমাজকে যতদূর মন বা শরী-
রের সহিত তুলনা করাতে বিশেষ ক্ষেত্র
ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু সমাজকে
সামান্য যজ্ঞ বা কলের মতন কৃত্রিম
বস্তুতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; যেহেতু
এই প্রমাণক মত জনসাধারণের বন্দো-
বস্ত আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে
ব্রাহ্মপথে চালাইয়াছে। এই সকল
ব্রাহ্ম চিন্তারও বিশেষ সার্থকতা আছে।
ইহারারা সকলেরই ক্ষমতায় হইয়াছে
যে, সমাজের এবং মানবশরীরের মধ্যে সা-
দৃশ্য আছে। পূর্বোক্ত দুইজন দার্শনিক
পণ্ডিত এই মাতৃশা নির্ণয় করিতে সত

কাষা হন নাই বলিয়া, আমরা সাদৃশ্য অস্বীকার করিতে পারি না। জীবজন্তুর (Biology) আলোকিত তখন প্রকাশ হয় নাই। অথবা বিজ্ঞানের প্রভাবেনিষ্কাশন করা বাইতে পারে যে, সমাজশরীর এবং প্রাণিশরীর সাদৃশ্য কি। কোন জীবের শরীর কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উন্নত হয়, এবং সমাজ কিরূপে বৃদ্ধি ও উন্নতিলাভ করে, এই দুই বিষয়ের পর্যালোচনা আজ কাল অনায়াসে হইতে পারে। সে পর্যালোচনা আজ করিতে গেলে, পাঠক আমাদের উপর

বিরক্ত হইবেন, এবং এক নীরস সমাজ সংগঠনতত্ত্বের উপর দুই ফর্দা আটকেল দেখিলে, হয়ত বস্তুদর্শনের গ্রাহকত্বগণী হইতে নাম ভুলিয়া লইবেন। সমাজ সংগঠন বিষয়ে অনেক কথা বলিতে বাকি রহিল, এবং আর একদিন এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এবন্ধ অতি বিদ্রূত হইয়া পড়িবে বলিয়া আমরা আজিকার মতন লেখনীকে বিশ্রান্ত করিলাম।

স.স।



নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য।

একথ্যে ইংলণ্ডে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে বোধ হয় শতকরা পঞ্চাশি কথাগ্রন্থ। কেহ বা শুধু মনোহরতার উদ্দেশ্যে, কেহ বা নীতি সংশোধনের নিমিত্ত, কেহ বা কোন পলিটিকেল উদ্দেশ্যে সংগ্রহের অভিপ্রায়ে, কেহ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সাধারণের অধস্তীকৃত করিবার জন্য কথাগ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। আমাদের দেশের লেখকেরাও কমলিনী, সুমলিনী, শৈবলিনী প্রভৃতি স্ত্রী স্ত্রী নাম দিয়া, নানাপ্রকারের কথাগ্রন্থ বাহির করিতেছেন। সুতরাং এ সময়ে কথাগ্রন্থ লক্ষ্যে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক হইবে না।

উপাখ্যান লিখিবার তিনটি প্রধান প্রণালী প্রচলিত আছে, যথা—নাটক, আখ্যানিক ও কথাগ্রন্থ। নাটকে শুধু নাট্যাঙ্গলিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্তা কহেন। সমস্ত ভাব, সমস্ত কার্য এই ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার অন্তরালে থাকিয়া, এই সকল ব্যক্তিদ্বিগকে পরিচালিত করেন। আখ্যানিকায় গ্রন্থকর্তা স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থোন্নিখিত ব্যক্তিগণের লিখিত আমাদের প্রায় সাক্ষ্য হয় না। কথাগ্রন্থ এই উভয়ের মধ্যস্থলবর্তী। ইহার কিয়দংশে গ্রন্থোন্নিখিত ব্যক্তিগণ কথাবার্তা কহেন; কিন্তু অন্য অন্য অংশে গ্রন্থকর্তা স্বয়ং আমাদেরকে সমস্ত

বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। নাটক লেখা যত শক্ত হউক বা না হউক, নাটক যথাক্রমে ব্যক্তি ভিত্তি অতি কঠিন। নাটোপস্থিত ব্যক্তিগণকে কি চরিত্রের লোক, কিমন্যস্তির ভিন্ন সময়ে ইহাব্যস্তির ভিন্নপ্রকারে কার্য করেন, সে সমস্ত বুঝাব জন্য অনেক জ্ঞান, অনেক চিন্তার প্রয়োজন। কথাগ্রন্থলেখক এই জ্ঞান ও এই চিন্তার সময়ে আমাদের অনেক সাহায্য করেন। গ্রন্থের যে যে অংশ আখ্যায়িকার পাবিত্য বলিয়া তাহার বোধ হয় তিনি সেই সেই অংশগুলি আমাদের নিকট অতি পরিষ্কারপে বুঝাইয়া দেন। সুতরাং নাটক বুঝা অপেক্ষা কথাগ্রন্থ বুঝা অধিকতর সহজ হইয়া উঠে। যাহা বিহজে বুঝা যায়, তাহাতে অধিকতর আমোদ অনুভব করিতে পারা যায়। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল দেশেই কথাগ্রন্থের সৃষ্টি হইলে আর নাটক বা আখ্যায়িকার সমধিক আদর পাখে না। আখ্যায়িকার সহজ বস্তুই প্রজ্ঞকর্য। নিজের ভাস্কর্য বর্ণনা করেন। সুতরাং নাটকে যেরূপ নাটোপস্থিত জিন্দার বা ব্যক্তির সংঘাত প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আখ্যায়িকায় তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। একজন আখ্যায়িকা অপেক্ষা নাটকে অধিকতর আমোদ আছে।

কথাগ্রন্থ নূতন সৃষ্টি। সংস্কৃতে অধিকাংশ এই কথিত্য লিখিত হইত।

যে কথাগানি গদ্য গদ্য আছে, তাহাদের অধিকাংশই আখ্যায়িকা। কামদাস, মল্লভূমার চরিত্র প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। সংস্কৃতে নাটকও অনেক ছিল। কিন্তু, নাটক ও আখ্যায়িকানিখিত কোন কথাগ্রন্থের ন্যায়ত ছিগ বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ইংলণ্ডেও কথাগ্রন্থের অতি অল্পদিনমাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে ইংলণ্ডের উপাখ্যান সমস্ত আখ্যায়িকার গণ্যকিতে লিখিত হইত। এই সকল আখ্যায়িকায় বড় বড় রাজার ও বীর-পুরুষের বীরকীর্তি সমস্ত বর্ণিত হইত। ইংলণ্ডে নাটকও অনেক ছিল। কিন্তু কেবল ডিক্‌ফোর (Die Foe) সময় হইতে নূতন প্রকারের কথাগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। অনেক অনেক করেন, যে নাটক লিখিবার জন্য যেরূপ প্রতিভা বা ক্ষমতার প্রয়োজন, এক্ষণে নৃত্যকার আর যেরূপ ক্ষমতা বা প্রতিভা নাই। কথাগ্রন্থ প্রতিভার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু নাটকের প্রতিভা অপেক্ষা এই প্রতিভা অনেক অংশে নূন। এইজন্যই এক্ষণে আর নাটক লিখিত হয় না। নৃত্যকার প্রতিভা দিন দিন কমিতেছে, এক্ষণে ইহা কথাগ্রন্থ পক্ষে ঘাইতে পারে, নাটক পক্ষে নাইবার ক্ষমতা আর ইহার নাই। এই বস্তুটি আমার মত বর্ণনা বোধ হয় না, কারণ লেখকগণকে ছাড়িয়া দিলে যে সকল নাটককার অবশিষ্ট থাকেন, তাহারা যে প্রতিভাশব্দকে ফিটিয়ে, ডিক্‌ফোর

ব্যাকারে প্রভৃতি অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট তাহা আমাদের বোধ হয় না। ফলতঃ কথাগ্রন্থ নাটকের ন্যায় সমান, আমোদ প্রদান করে। নাটকে যে যে উপদেশ পাওয়া যায়, কথাগ্রন্থেও সেই সেই উপদেশ পাওয়া যায়। তবে এক কথা এই যে, নাটক মঞ্চের মধ্যে স্থিতিতে পারে না। কথাগ্রন্থ সকলে সহজে স্থিতিতে পারে। এজন্য লোকের নাটকের আদর না করিয়া কথাগ্রন্থের আদর করিয়া থাকে। যে কারণেই হউক, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্তমান কথাগ্রন্থের প্রকাশ হইল না, ততদিন নাটকের অতি সমাদর ছিল। কিন্তু কথাগ্রন্থের প্রকাশ হওয়া অবধি নটিক ক্রমশঃ হতাশ হইতেছে।

আমাদের দেশে বঙ্কিম বাবু হইতে কথাগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগ্রন্থ ইংরেজি কথাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকরণ। ইহাতে অনেক স্থলে ইংরেজি চরিত্র, ইংরেজি ভাব এমন কি ইংরেজি ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ করা হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা স্বতন্ত্র। এই অনুকরণের মধ্যেও নানা প্রকারের মৌল্য অঙ্গ প্রসিদ্ধি হইয়াছে। তাহার পর হইতেই বাঙ্গালার নট্যের লক্ষ্য দিন দিন বর্জিত হইতেছে।

কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের নাম ইংরেজিতে ড্রামা। ইহা বীজরসপ্রধান। ইহাতে যুদ্ধ, বিগ্রহ, রাজা, বীরপুরুষ, রাজকীয়, বীরকীর্তি প্রভৃতি বর্ণিত হয়। বাঙ্গালার বিশেষ নন্দিনী, বঙ্গাধিপত্যভ্যন্তর, শতদ্বার প্রভৃতি কথাগ্রন্থস্থিতি এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের কথাগ্রন্থে আরম্ভ ঘটনা সমস্ত বর্ণিত হয়। যে সকল ঘটনা আমরা আমাদের মধ্যে নিত্য দেখিতে পাই, সেইগুলি এইরূপ কথাগ্রন্থে আমাদের নিকট সুন্দররূপে প্রতিভাসিত হয়। বিষয়ক, কলকাত্তের উইল, স্বর্ণ-লতা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।

নাটকের মনোরঞ্জন করা এই কাজ পূর্বে উপাখ্যান লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপীয়েরা পূর্বে অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত যুদ্ধসম্বন্ধীয় ঘটনা সমস্ত বিবৃত হইত। এখনও ইউরোপে যুদ্ধ-প্রিয়তা কমে নাই। সুতরাং যুদ্ধবর্ণনা ইউরোপীয় কথাগ্রন্থের প্রধান উপাদান। বাঙ্গালী কথাগ্রন্থ ইউরোপীয় কথাগ্রন্থের অনুকরণ। সুতরাং বাঙ্গালী কথাগ্রন্থেও যুদ্ধাঙ্গি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এই লক্ষ্য হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে জন্ কুইয়টের, অশালীম যুদ্ধপ্রিয়তা অত্যন্ত বর্জিত হইয়াছে। শীর্ণ বঙ্গীয়-

*দুর্শমিনী "যদি সেই সময়ে মন্দিরমধ্যে বস্ত্রপতন হইত, তাহা হইলে তাঁহারা আশ্চর্যের চমকিত হইতেন না।" ইংরেজি অনেক নভেলে ঠিক এই কাহিনী এই কাহ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

মরক আপনাকে ভগ্ন মিথ বা ভেদ-
চক্রের অবস্থায় উপস্থাপিত করে, এবং
এইকণে লোকের নিকট 'অতীত উপ-
হাস্য' মনে হয়। "ভারত-উদ্ধার"
লেখক এ বিষয়ের সাক্ষী। পাঠকের
মনে পড়িতে পারে

"বটাইরা দিব আখি পাখও ইংরেজে"

কিন্তু রোমান্স পাঠে যে এককালেই
কিছুমাত্র লাভ নাট্য হইয়া নয়। ইহাতে
কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনার দ্বারা
একরূপ জড়িত আনন্দ জন্মে। যুবকেরা
যে কি আনন্দের সহিত স্রুটের "আই-
ড্যান্‌হো" বা বন্ধিমবাবুর "দার্শনিকিনী"
পাঠ করে, তাহা মনে হইলে, বিস্ময়া-
য়িত হইতে হয়। 'কিন্তু এ আনন্দ
জনক। ইহার ফলস্বরূপ অতি অল্পই
আছে। বাহা কিছু ফলস্বরূপ আছে,
তাহাও বোধ হয়, অনিষ্টের দিকে।
কল্পনাশক্তির প্রচুর পরিচালনা হওয়ার
বিবেচনাশক্তির কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া যায়। এবং
বস্তুর মধ্যকার ব্যবহার না দেখিয়া, কেবল
ভাষার সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্ব প্রভৃতি
দেখিতে ইচ্ছা হয়। সামান্যিক অনেক
কার্যের অতি বীভৎশ্ব হইতে হয়।
মহা আপনাকে অত্যন্ত উন্নত করিতে
ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে মাত্র, কিন্তু সেই
পথ দ্বারা তাহার নিজের বা সংসারের কিছু
মাত্র উন্নতি হয় না, উপকারও হয় না,
কেবল পদে পদে মনস্তাপ পায়।

কথাগ্রন্থের আলোচনার লাভালাভের
বিচার দেখিয়া হয় ত অনেকে বলিয়া

উঠিবেন, নভেল গল্পের বই। নবীয়ে
শোস্তের মত ইহাতে গড়াইয়া যাইবে।
ইহাতে অবির লাভালাভ দেখিব কি?
কুল কুটিয়াছে দেখিয়া নবনের ভবি-
ষ্যৎ হইবে, তাহাতে লাভালাভের প্রদ-
উক্তি করিলে, ধান ভানিতে শিবের গীত
করা হয়। যদি এই বস্তুটি সত্য হয়,
তাহা হইবে নভেলের সংখ্যা যে এত
বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা পৃথিবীর পক্ষে
অনিষ্টকর বলিতে হইবে। নৃত্য, গীত
প্রভৃতি যে সকল কলার শুদ্ধ আয়োজন
ভর্য্য হয়, সংসারে তাহাদের নভেলের
মত আসর নাই। প্রধান প্রধান পাণ্ডি-
তেরা নৃত্য গীতে অতি অল্প সময়
ব্যয়িত করেন। কিন্তু নভেল লেখায়
বা নভেল পড়ায় অনেক মহা মহা পণ্ডিত
আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন।
যদি নভেল শুদ্ধ আয়োজনের বস্তু হয়,
তাহা হইলে ইহার এত আসর কেন?
এক্ষণে "ব্যবহারোপযোগিতা" নবীয়া
ইংলও একপ্রকার উন্নত হইয়াছেন।
সেখানে শুদ্ধ আয়োজনের বস্তু এত আসর
কেন? ফলতঃ, যদিও অনেক নভেল
কেবল মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত
হয়, তথাপি ইহা অবশ্য প্রকার করিতে
হইবে, যে মানবতা না থাকিলে, নভেল
কখনই শিক্ষাদায়ক এত উচ্চ স্থান
পাইত না। নভেল কালের ন্যায় স্থান
বটে, কিন্তু ফলই ইহার পরিধান।

ইহাতে কেহ হয় ত আপত্তি করিবেন,
যে "সত্য বর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য।

লাভালাভ বিচলি তাহার উদ্দেশ্য নহে। এই সুবিধাতে আসসা যে বস্ত্র বেরূপ দেখিতে পাই, সেই বস্ত্রটী বথায়থকপে ব্যবৃত করিলেই উপভোগলোকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ফিল্ডিংএর টম্ জোন্স এই-রূপ নভেলের দৃষ্টান্ত। টম্ জোন্স যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, গ্রন্থকর্তা অসম্মুচিত হৃদয়ে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। নভেল লিখিতে হইলে, এইরূপেই দেখা উচিত।” কিন্তু সত্য দুই প্রকার, আংশিক সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য। কোন উকীল যে কখন স্পষ্ট মিথ্যাকথা কহেন, এমত নহে। তিনি যতদূর বলেন, ততদূর সত্য। কিন্তু তিনি সমস্ত কথা বলেন না। মনে করুন, আপনি বলিলেন, “চোর নিধ মিল, ধরা পড়িল না, বাড়ী ফিরিয়া আসিল, পথে কোন বিপদ ঘটিল না, বাড়ীতে আসিয়া অপরূহ ধন লইয়া সে গাড়ী, ঘোড়া করিল, সবকণের নিকট সম্মানিত হইল।” যদি এই পথান্ত বলিয়াই আপনি কান্ড হন, তাহা হইলে আপনি সত্যের আংশিক বর্ণনা করিলেন। কারণ চোর অনেক সময় ধৃত হয়, জেলে যায়, বহুতর কষ্ট পায় এবং কখন-কখন দীপান্তরিহ হয়। যেখানে সত্যের আংশিক বর্ণনা সেখানে মাননীয় অনিষ্টের আশঙ্কা। কারণ সত্য মিথ্যা নির্জাতন করিয়া লওয়া অতীব কঠিন। “মিথ্যা বর্ণনা সকল সময়ে অবৈধ।” কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যার প্রায় বাহারও অনিষ্ট হয় না। কারণ পোড়াক অক্ষে

তাহার মিথ্যার বন্ধিতে পারে। প্রথম নভেলের পরম পদার্থ। এই প্রণয়ের বর্ণনা নভেলে নিয়ন্ত্রণে প্রকটিত হয়— “যুবক যুবতী উভয়ে অতীব রূপবান, অতীব গুণবান। যুবক পুরানদিগের মর্কোৎকৃষ্ট, নারী যুবতীদিগের মর্কোৎকৃষ্ট। উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। যে কারণেই হউক উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিল। তাহার পর উভয়ে সংসারের সমস্ত বস্ত্র উপেক্ষা করিতেছেন, পিতা মাতার আজ্ঞা অবহেলা করিতেছেন, হয় ত কোন সময়ে উভয়ে কোন কোন অসং কর্যও করিয়া ফেলিতেছেন। তাহার পরে উভয়ের বিবাহ হইল।” এখানেই অনেক নভেলের সমাপ্তি হয়। যতদূর ঠিহাতে বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু ঠিহাতে সকল কথা বলা হয় নাই। বিবাহের পর যুবক যুবতী অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে, সংসারের অনেক অনো-জন অনেক বিপদ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তাহারা আপন আপন পূর্বাচরিত অনুসারে সুখী বা দুঃখী হইয়া জীবন অতিপাত করে। সুতরাং বাঁহারি যুবক যুবতীর বিবাহ দিরাই নভেলের সমাপ্তি করেন, তাহারা মজুত-হৃদয়ের একমাত্র অংশ উজ্জলবর্ণে বস্ত্রিত করিয়া গগর সমস্ত অংশের মনোহাতিত করাইয়া দেন।

আর এক কথা, কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা তাহা কি কোথাও নির্দিষ্ট

দ্বিতীকৃত হইরাছে। তুমি যাহাকে নষ্টা বল, আমি তাহাকে বিখ্যা বলি, তুমি দাছা প্রাভাবিক বল, আমি তাহা কাল-নিক বলি।* তবে তুমি যাহাকে সত্যা বনিয়া নেনে কর, শুদ্ধ সেইরূপ অনিশ্চিত সত্যের জন্য আমার স্থগের আশা কেন হারাইব।

আর এক কথা, সত্যা বলিতে চাইবে কেন? সত্যা বলার লাভ আছে, অসত্যা বলার অনিষ্ট আছে। সুতরাং সত্যা-ন্যস্তার বিচার প্রকারান্তরে লাভালাভের বিচার ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

আর এক দল লোক আছেন, তাহারা বলেন, যে অসত্যাবর্ণনাই নভেলের উদ্দেশ্য। কথো এই অসত্যাবর্ণনার প্রবর্তক। মনুষ্য অসত্যবৃত্ত: যেক্রপ, তাহাই বর্ণনা করিতে চাইবে। কেন? মনুষ্য অসত্যবৃত্ত: যতি স্তম্ভের বস্তাবের বাহার করিলেও অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। সুতরাং এ স্থলেও লাভালাভের প্রশ্ন উথিত হই-যেছে কিন্তু ইহাতে নানারূপ আপত্তি আছে। আসসা অসত্যবৃত্ত: স্তম্ভের সত্যাব কি না তাহার সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। সে সকল তর্কের এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই। এখানে এই পর্বাণ্ড বলিলেই পূর্ণাপ্ত হইবে যে লাভালাভের বিচার অসত্যগ্রেহে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, যে কামান্স পাঠে অধিক লাভ হয় না। ইহাতে কেবল কল্পনাশক্তির গম্যস্থ প্রতিপাদনা হয় মাত্র। আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে যে কিছু পরিবর্তন আছে, তাহার অধিকাংশই অনিষ্টের দিকে। এ জন্যই এক্ষণে আর রোমন্থকের সহিত সাধারণতঃ মনুষ্যের মহাজুড়তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, বিত্তীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ পাঠে কামান্স লাভ হয় কি না। আমাদের দেশের কথাগ্রন্থ প্রধানতঃ ইংরেজী কথাগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আমাদের কথাগ্রন্থের লাভালাভ বিচার করিতে হইলে ইংরেজী কথাগ্রন্থ পর্যন্ত অধ্যয়ন করা কর্তব্য। বিত্তীয় প্রকারের কথাগ্রন্থ (আমরা ইহার নাম গাইয়া কথাগ্রন্থ রাখিলাম) পূর্বেই প্রবাসীতে আলোচনা করা ই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজের অবস্থা অনুসারে মনুষ্যের চিত্তাশ্রয়ও পরিবর্তিত হয়। যখন সমাজ ধর্মপরায়ণ, তখন মনুষ্যের চিন্তনায় ধর্মের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন সমাজ অধর্মপন্থিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন মনুষ্যের চিন্তাতেও এই অধর্মপন্থের লক্ষণ দেখা

* গির্জাইব লাভালাভ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন তুমি যাহাকে লাভ বল, আমি তাহাকে অলাভ বলি, আবার তুমি যাহাকে অলাভ বল, আমি তাহাকে পরম লাভ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সত্যাসত্য হইতে মনুষ্যের মধ্যে বেদন বিমর্ষানিতা, লাভালাভ সম্বন্ধে, বোধ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

খিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড যখন ধর্মী হইয়া উন্নত তখন "মিউন্" তাঁহার "পারাডাইস লষ্ট" লিখেন। আবার যখন নীচ প্রকৃতি দ্বিতীয় চার্লস ফ্রান্সের উচ্চ জ্ঞানতা ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন ড্রাইডেন তাঁহার "All for love" প্রভৃতি রচনা অপার্টা নাটক লিখেন। ইহারা এই সমাজস্রোতে গড়াইয়া দান, তাঁহার পরমশ্রমের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন না। কিন্তু ইহারা সমাজের অবনতি দেখিয়া সমাজস্রোতের বিপরীতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজকে সুপথে পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারই সর্বসাধারণের স্বার্থ ধন্যবাদের পাত্র। যখন ড্রাইডেন, উইচারলি, কনগ্রাভ প্রভৃতি জন্মান্তর প্রাপ্ত লিখিয়া সমাজকে উৎসাহ দিতেছিলেন, সেই সময়ে জেরিনি কলিয়ার এইরূপ সমাজ-পরিবর্তনের চেষ্টা করেন।

একদম ইংলণ্ডে অর্থোপাক্ষরনই জীক-সের মুখা উদ্ভাষা হইয়াছে। খড়ী, গোড়া, ঘর, বাড়ী, অলঙ্কার, পোষাক প্রভৃতি ভোগবিমান সকলের একমাত্র ধোয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অর্থোপাক্ষরন করিতে হইলে অনেকটা কঠোর-কর্ম হওয়া আবশ্যিক। আমাদের দেশে চলিত কথাটির বলে "চমুলজা বীর অর্থ নাপ্ত তাঁরা।" ইংলণ্ড অনেক দিন হইতে

এই চমুলজার মাঝে খাটিতেছেন। কর্মবাক্যের জন্য (অর্থোপাক্ষরনের জন্য) ইংলণ্ড সকল প্রকার চমুলজা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সুতরাং ইংলণ্ডে কঠোরকর্মের অত্যন্ত প্রাচুর্য হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবতে এই কঠোরকর্মের কারণ হ্রাস হয়, ইংলণ্ডের নভেলিষ্টগণ সেই চেষ্টা করিতেছেন। ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে অল্পঃ একজন কঠোরকর্মের অর্থপাতি আছে। ইহারা সকলেই নানাক্রম কষ্টে পড়িয়া শেষদশায় অত্যন্ত যাতনা পাইয়া, সকল লোকের নিকট অবমানিত হইয়া, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া, কেহ বা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ চরিত্রবর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্য কঠোরকর্মের এই সকল ফল দেখিতে পাইয়া আর কঠোরকর্ম হইতে চাহিবে না। ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে আর একটি চরিত্র বর্ণিত আছে।* ইহাদের অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ অনাদর। ইহারা প্রকীর মনুষ্যতার বলে নানাক্রম সুখ-মস্তোগ করতঃ অবশেষে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে মনুষ্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থের প্রতি অনাদর হইবে এবং কঠোর-কর্মের হলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সজ-

* "মিকোলাস নিকলবির" "রাল্ফ নিকলবির" ও "নিকোলাস নিকলবির" কথা পাঠক মহাশয়ের মনে পড়িতে পারে।

দয়তা আসিবে। ডিক্লেয়ার উপদেশ এই—“অর্থের লোভে কঠোরজদয় হইও না, কারণ তাহাতে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। অর্থের লোভ ত্যাগ করিয়া সন্তদয় হই, কারণ তাহাতে পরিণামে অনেক সুখ পাওয়া যায়।” ইংলণ্ডের একদে মেরুপ সমাজের অবস্থা, তাহাতে ডিক্লেয়ার নভেল যে সেখানকার গঞ্জে নিত্যন্ত উপযোগী তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু বঙ্গ-সমাজের অবস্থা, ইংলণ্ডীয় সমাজের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং ইংলণ্ডে বাহ্য অতীব উপকারী, এখানেও যে তাহা উপকারী হইবে এরূপ আশা করা যায় না। ইংলণ্ডে এরূপে সমাজদেবীর বিলাসভূমি। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রায় বিনিময়কাণ্ড সম্পাদিত হয়। রাশি রাশি ধনের উপর বসিয়া ইংলণ্ড ধনের স্পৃহা একটু ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডের দেখাদেখি যদি তুমি আমি ধনস্পৃহা ত্যাগ করি, তাহাতে সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। কঠোরজদয়তা আমাদের দেশে প্রবল নয়। অর্থার্জন চেষ্টা আমাদের দেশে বদ্ধ নাই। বৈরাগ্য আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষা সুতরাং আমাদের দেশে সহদয়তা কিছু কমাইরা অর্থার্জন চেষ্টা কিঞ্চিৎ বদ্ধিত করা উচিত। সুতরাং ইংলণ্ড যে পথে চলিতেছেন, এ বিষয়ে আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলা উচিত। অর্থার্জনস্পৃহা ও সহদয়তা

উভয়েরই দোষজন আছে। সমাজের অবস্থা অনুসারে কাহারও বা বুদ্ধি কারারও বা হ্রাস হওয়া উচিত।

পুঙ্কন দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে ইংলণ্ডে যে প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যিক, এদেশে সেই প্রবৃত্তি দমনিত হওয়া প্রয়োজনীয়। আবার ইংলণ্ডে যে প্রবৃত্তি দমনিত হওয়া আবশ্যিক, আমাদের এখানে সেইটি পরিবর্দ্ধিত করা উচিত। সুতরাং ইংলণ্ডের অনুকরণে আমাদের ইষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম কণিষাকেরই বড় আমরের বট। কিন্তু প্রথম লইয়াই নভেল লেখকদের ব্যবসা। কিন্তু এই প্রণয়ের ভাব ইংলণ্ডে একরূপ ও আমাদের দেশে অন্যরূপ। ইংলণ্ডীয়দের নভে প্রথম হৃদযেৎ কার্য। হৃদয় বলিল, অনুকুলে ভালবাস, অমনি তাহাকে ভালবাসিলাম। হৃদয় বলিল, অনুকুলে ভালবাসিও না, অমনি আমরাও ভালবাসা বন্ধ হইল। আমার একজন স্বামী আছে। কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারি না। কেন? আমার হৃদয় আমাকে এ বিষয়ে সঙ্গতি দেয় না। হৃদয়ের কথা যে সকল সময়ে আমাকে স্মৃতিতে হইবে তাহা নয়। হৃদয় আমাকে অনেক সময় অনেক অনায়াসে কাঁদা করিত

বলে। জন্মের সময় হৃদয়, কল খাইতে বসে; অল্পের টাকা ধার লইলে হৃদয় আর তাহা শোধ করিতে চায় না, ইত্যাদি। এ সকল সময়ে হৃদয়কে কষিত করিতে হইবে। কিন্তু প্রণয়ের বেলা হৃদয় যাহা বলিবে, তাহাই শিরোধার্য। শৈবলিনীর স্বামী উদার, মহান এবং সর্ব্বব্যাপী। শৈবলিনী তাঁহাকে অগ্রসার্য্য কবিয়া পতিব্রত বরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি? শৈবলিনীর হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে সম্মতি দিল না। শৈবলিনী অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল, কিন্তু হৃদয় রাজি হইল না। সুতরাং শৈবলিনী প্রতাপকে বিবাহের পরেও পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল। ইহাতে শৈবলিনীর দোষ হইল বটে, কিন্তু সে দোষ অতি অল্প। কেন অল্প? শৈবলিনীর হৃদয় তাহাকে ভালবাসিতে বলে নাই। কুম্ভবেটার্ণাঠী হৃদয়কে অনেক বুঝাইল। তধু কুম্ভ কেন? কুম্ভ বুঝাইল, কুম্ভ বুঝাইল, হুগুমুখী বুঝাইল। কিন্তু কুম্ভের হৃদয় বুঝল না।" ইহাতে সে কুম্ভের দোষ হইল না, তাহা নয়। কিন্তু সে দোষকে যদি তুমি দোষ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি নিঃস্বপ্ন হৃদয় পাওও। কেন কুম্ভের হৃদয় তাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিল!

পূর্ব্বের ভাবগুলি ইংরেজদের। ইং-

রেজের দেশে ইহা সম্ভব। কারণ পাণ্ডাকাল হইতেই যুবতী প্রণয়সময়ে আপনাকে স্বাধীন দেখিতে পায়। তাহার বাহ্যকে উচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিতে পায়। ইহাতে তাহার সমাজে নিন্দা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে বিবাহের পর হইতে প্রণয়ের অক্ষুর আরম্ভ হয়। বিবাহের পূর্ব্ব পাণ্ড কন্যা কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। আমাদের দেশে প্রণয় সমাজপ্রথার অধীন রাজ। তোমার হৃদয়কে ইহাতে সমাজের বশে চলিতে হইবে। যেমন অন্য অন্যত্রনে, তুমি হৃদয়কে সমাজের বশবর্ত্তী করিতে চেষ্টা কর, প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। হৃদয় তোমাকে আইনের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে নিষেধ করে, হৃদয় তোমাকে অন্যের উপার্জিত অর্থ বলাপূর্ব্বক লইতে বলে। তুমি এ সকল স্থলে হৃদয়ের আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সমাজের উপদেশমতে চলিরা থাক। প্রণয়ের বেলাও তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। পিতা, মাতা বাহাকে স্বামী কি স্ত্রী বলিয়া আমার সম্মুখে উপনীত করিলেন, আমি তাহাকে যাবজ্জীবন ভালবাসিব, হৃদয়ের হৃদয়ে তাহাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিব। যদি হৃদয় ইহাতে কোনরূপ অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করে, আমি সেই

* নগেন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "আমি নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, কিন্তু আমার হৃদয় বশ হইল না।"

পাশিষ্টে স্বরসকে শব্দতলে দ্বিগত করিব, প্রয়োজন হইবে যত্ন যত্ন করিয়া ছিড়িয়া ফেলিব, কিন্তু আমার হৃদয়মন্দিরের দেব বা দেবীকে সিংহাসনচ্যুত করিব না। যোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে, জুগে, সুখে চারার ন্যায় উহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। যশস্বে কি আছে দেখিব না, পার্শ্বে কি আছে দেখিব না। যদি স্বামী হই, স্ত্রীকে বঞ্চে করিয়া যাব-জীবন কাটাইব। যদি স্ত্রী হই, স্বামী-পদে যত্নক রাখিয়া জীবন কাটাইব।

ইহাই বঙ্গদেশের প্রণয়ের লক্ষণ। যাহারা হৃদয়ের প্রোভনে মোহিত হইয়া ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাহারা আনন্দের দেশে ঘূর্ণ্য। ইংরেজদের মত বাহাদুরের বেশে সত্য হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমরা ইহাকে প্রাণ ধরিয়া আমাদের দেশে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যকে মনের ভ্রম বলিয়া বুঝাইতে পারেন, দার্শনিকেরা সত্যকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সত্যই আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের একমাত্র উজ্জ্বল মণি। ইংরেজ কি জন্য পুর্নোক্ত মস্তকের আদর দিন-দিন বাড়িতেছে, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। জর্জ হিল-বট্ হইতে সামান্য নভেল লেখক পর্যন্ত কি জন্য প্রণয়কে এই অপবিত্র আকারে চিত্রিত করেন, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। ইংরেজেরা স্বাধীনতাশ্রম। যোম হু প্রণয়সম-

কেও স্বাধীনতা আনিতে ইহারা ইচ্ছা করেন। আমরা অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতার ইচ্ছুক হইলে হইতে পারি, কিন্তু আমরা প্রণয়ের স্বাধীনতা চাই না। ড্রাইডেন বলিতে পারেন—
“One to one was cursedly confined.”
আমরা বলিব—“One to one was blessedly confined.”

বাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল, যে ইংলণ্ডেরা প্রণয়কে যে আকারে চিত্রিত করেন, আমাদের দেশে তাহা লাম্পট্য-লুচক এবং অতীব ঘৃণাজনক। সত্যের বৃদ্ধিতে যে সমাজের অধিবৃদ্ধি হয় তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি প্রণয় হইতে এই সত্যটুকু বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পশুভাব ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে প্রণয়সম্বন্ধে ইংলণ্ড আজিও সত্য-পদবীতে আরুঢ় হন নাই। কারণ যে দেশ যত সত্য হইবে, সে দেশে সত্য-ভের আজ্ঞা ততই সম্মানার্থ বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং যদি ইংলণ্ডীয় প্রণয় ভাব আমরা অবিকল অনুকরণ করি, তাহাতে আমাদের এই লাভ হইবে যে আমরা স্বদেশীয় সত্যের প্রতি দীর্ঘদৃষ্টি হইয়া প্রণয়কে কেবল পশুভাবপূর্ণ বলিয়া মনে করিব।

যাহারা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, আমাদের দেশের অভাব সমস্ত হৃদয়হর কবিতা, সেই সমস্ত অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় নভেল লিখিবার প্রয়াস পাইবেন,

তাহাকে আমরা আমাদের যথার্থ হিতৈষী
খরিদা সহজ সহজ ধন্যবাদ দিব। আর
বাহারা শুভ মনোপ্রজন্মের উদ্দেশ্যে ইং-
রেজী ভাব সমস্তের অবিকল “তরঙ্গমা”
করিয়া আমাদের সমুখে উপস্থাপিত

করিবেন, তাহারা প্রতিজ্ঞাশীল হইতে
পারেন, কিন্তু তাহারিগকে কখনই দেশের
ধন্যবাদই বলিয়া বনে করিতে পারিব
না।



স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষাকর।

প্রথম অবস্থায় লোকে আপন গ্রামো-
জনীয় সমস্ত পদার্থ আপনি নিখাঁব
করিয়া লইত। তখন পরস্পর দ্রব্য
বিভিন্নরূপে যে কত শ্রমসাধ্য হয়, তাহা
লোকে জানিত না। ক্রমে যাহারা
নিভাত কাছাকাছি থাকিত, তাহারা
আপন প্রতিবেশীর সহিত আপন দ্রব্য
বদলাইয়া লইত। রাম তাঁত বোনে,
শ্যাম ধান রোয়, শ্যামের ধানে রামের
পরিবার প্রতিপালন হয়, রামের কা-
পড়ে শ্যামের পরিবারের শীত নিবারণ
হয়। হরি লোহার কর্ম করে, ক্রয়
দ্রুতের ব্যবসা করে, ব্রজ নাপিত।
পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে, পাঁচ
জনই আপন আপন কার্যদ্বারা আর
চারিজনকে সাহায্য করে, এবং তাহা-
দের সহায়তার নিষ্ফলও চলে। এই
গ্রাম ভারত। ক্রমে হরি যদি এত
লোহার অল্প তৈয়ার করিতে পারে যে
মিলগ্রামে তাহার প্রয়োজন হয় না।
হরি কি করিবে? আপন গ্রামে বড়
প্রয়োজন তাহাই করিয়া বলিয়া পা-

থাকিবে, না বাহিরে বিক্রয় করিবার
চেষ্টা করিবে।

যেমন এক সময়ে সকল লোকই আ-
পন আপন দ্রব্য উৎপাদন করিত,
তেমনি এক সময়ে সকল গ্রামই আপন
আপন দরকারী জিনিস তৈয়ার করিয়া
লইত। ক্রমে তাহারা দেখিল যে,
পরস্পরের সহায়তা পাইলে সুবিধা হয়।
হরিপুর দেখিল যে বিষ্ণুপুরে একজন
কর্মকার আছে, সে অল্প সময়ে অনেক
লোহার অল্প তৈয়ার করিতে পারে,
তাহার নিজের গ্রামের বড় দরকার
তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সে তৈ-
য়ার করে। সুতরাং হরিপুরের লোক
বিষ্ণুপুরের হরির কাছ হইতে সমস্ত
লোহার কাজ লইতে লাগিল। হরি-
পুরের কর্মকার চাম করিতে লাগিল।
এইরূপে একজন নাপিতে ছই গ্রামের
চলিল। হয় ত হরিপুরের জমীতে
অরহরের দাল বড় চমৎকার হয়।
বিষ্ণুপুরের লোক অরহরের দাল চাম
আর না করিয়া লোহার কাজ ও নাপিত

দ্বিতীয় অর্থের দান পাইতে লাগিল। দুইবোতাই কিছু কিছু শাস্ত্র হইল, শব্দ ও বাস লাগব হইল।

কমে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর সাহায্যকারী অনেকগুলি গ্রাম একত্র হইয়া একটি গ্রামসমবায় হইল। এই গ্রামসমবায়ের নাম জেলা বলিলাম, এই এক এক জেলার লোক আপন প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই জেলার মধ্যে প্রেরণ করিয়া লয়। জেলার মধ্যে যে জায়গায় যে জিনিষটি ভাল হইতে পারে, সেখানকার লোক কেবল সেই জিনিষটাই তৈয়ার করে, অপর বস্তু তাহাদের প্রতিবেশবাসীদের নিকট আপন জিনিষের বদলে পায়। মনে কর, জেলার নাম বরিশাল। বরিশালের লোক দেখিল যে চাউল তাহাদের দেশে এত উৎপন্ন হয় যে, তাহারা চাউল অনারামে বাহিরে পাঠাইতে পারে। ঢাকার লোকও দেখিল যে তাহারা যত কাপড় তৈয়ার করিতে পারে তত কাপড় তাহাদের দরকার হয় না; সুতরাং তাহারাও কাপড় বিদেশে পাঠাইতে লাজী হইল। চাই বলই রাঙ্গী, বন্দোবস্ত হইল, ঢাকার লোকের চাল বরিশালে দিবে, বরিশালের কাপড় ঢাকা দিবে। আগে সেমন রামে ও শ্যামে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এখন ঢাকা ও বরিশালে তাই জাবার হইল। কিন্তু এবার বরিশালে তাহারা কাপড় তৈয়ার করিত তাহারা ও ঢাকার তাহারা চাউল তৈয়ার

করিত তাহারা প্রায় দুই তিন খানের লোক। ইহারা কাজ পাইল না, ইহাদের দশার কি হইবে। ইহাদের দিন-কতক খুব দাতি হইবে। বরিশালের তাঁতীদের মধ্যে যাহারা ভাল তাহারা ঢাকার চলিয়া যাইবে, যাহারা ভাল চান করিবে। কতক অন্য অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, কতক এই ইিপায় মরিয়াও যাইবে। ঢাকার চামারাজ কতক তাঁতীর কাজ দিখিবে, কতক অন্য ব্যবসাতে যাইবে, কতক বরিশালে চলিয়া যাইবে। হুগলিচন্দ্র না থাইয়াও নারী থাকিবে। ঢাকা ও বরিশাল ত প্রথম হইতেই পরস্পরের কাপড় ও চাউল যত দরকার সবই নিতে পারিত; আর ঢাকার তাঁতী বাড়িল, বরিশালে চামা বাড়িল। ঢাকায় অনেক অধিক কাপড় হইতে লাগিল, বরিশালে অনেক অধিক চাউল হইতে লাগিল। লোকের সম্বল হইয়াও বাড়িতে লাগিল। তখন লোকে কুশল মানদহে উৎকৃষ্ট জ্ঞান হয়, দেশের আমে টক বিহার। অগ্নি ঢাকা ও বরিশালে দুই জায়গার লোকই নন্দ করিল যে, আমাদের বাড়তি কাপড় ও চাউল দিয়া আইস খুব করিয়া জ্ঞান ভরন করা নাড়ক। মানদহের লোকও দেখিল মন্দ নয়, অনারামে চাউল ও কাপড় মিলিবে; মানদহের চামা ও তাঁতী সবাই নিম্ন নিম্ন ব্যবসায় জাগে করিয়া আমেরই বাসন তৈয়ার করিতে

লাগিল। ঢাকা ও বরিশালে যাহাদের
আমের বাগান ছিল, তাহারা নিজ নিজ
বাগান বেড়িয়া আবার কাপড় ও চাউল
বৈদ্যার করিতে লাগিল। মালদহও
সেখানে দেখিল যে তাহারা ঢাকা, বরি-
শাল ও মালদহের লোককে পেট ভরিয়া
আত্র জঞ্চন করাইয়াও প্রতিলব্ধমূল্যে
১২১৩ লক্ষ আন ইচ্ছাইতে পারে,
তখন তাহারা ভাবিল আম বৎসরে দুই
নাম বই পাওয়া যায় না; সুতরাং আম
খাওয়া যায় ইহাও কোন উপায় হয় না
কিছু কামে বাছির হইল, যে, যদি আনের
দল শুকাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে
সম্পদ্যব চলে। আর কাঁচা আম কাছা-
কাছি রাখে গেলে খেতে দূরে পাঠান
যায় না শুকাইয়া রাখিলে আরো অনেক
দেশে পাঠাইতে পারা যাইবে। ঢাকা
ও বরিশাল হইতে চাউল কাপড়ের
সংগ্রহ হইতেছে, অন্য জায়গা হইতে
আরও নানা জিনিস মিলিবে। ঢাকা
বরিশালের হাঁড়ী ও চাসা আবার বাড়ি-
ব্যাছে; তাহারা অন্য অন্য জেলার
আগুন আপন কাপড় ও চাউল পাঠা-
ইতে লাগিল। মালদহে আম শুকা-
ইয়া আমবাজ করা একটি নূতন আবি-
ষ্কার হইয়াছে; ইহাদের তাহার আর
অয়োজন নাই। এইখানে স্বাধীন
বাণিজ্যাবস্থা এই ব্যস্ত হইল যে, যে
দেশের লোক যাহা সুবিধায়ত প্রাপ্ত
করিতে পারে, সে তাহাই প্রাপ্ত
করিতে লাগিল। তাহাতে গরিবদের

অনেক লাঘব হইল। উৎপন্ন অধিক
হইল। একটি নূতন আবিষ্কার হওয়াতে
সমুদ্রের লোক আমের স্বাদ প্রাপ্ত করিতে
লাগিল। আর এক জেলার কতকগুলি
লোক, যিনি জেলায় মর্কদা যাত্রায়
করার দরুন ইহাদের বুদ্ধিবুদ্ধি হইল।

আমরা এতক্ষণ মনে করিতেছিলাম
যে বাবসায়ের জন্য বরিশালে কাপ-
ড়ের কারবার উঠিয়া গেল, ঢাকার
চাউলের চাস উঠিয়া গেল ও মালদহ
হইতে দুই উঠিয়া গেল। বাস্তবিক
তাহা হয় না, জীবনধারণোপযোগী নি-
তান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু কখন একেবারে
কোন বিজ্ঞাত ভূভাগ হইতে উঠিয়া যায়
না। কিছু না কিছু পরিমাণে থাকিয়াই
যায়। কিন্তু সে কথায় কোন আশা
না করিয়া আমরা যেভাবে বলিয়া আনি-
তেছি সেই ভাবেই বলিয়া যাই।

মালদহে আম উৎপন্ন হইল। বরি-
শালে ধান্য উৎপন্ন হইল, ঢাকার বস্ত্র
উৎপন্ন হইল। তখন এই তিন জায়-
গার লোক দেখিল এত জিনিস মিথ্যা
অপচয় না করিয়া সমুদ্রের পারে বা
হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরভাগে এ সকল
প্রেরণ করিলে অনেক জিনিস পাওয়া
যাইবে, যাহাতে আমাদের সুখস্বচ্ছন্দ্য
বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং তাহারা আপন
আপন জিনিস লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে
যাইতে আরম্ভ করিল। আরাকান বা
উড়িষ্যায় যাইতে হইলে, বড় নৌকার
অয়োজন হতবাং বড় নৌকা প্রস্তুত

হইল, আরাকান হইতে নানা প্রকার শিল্পসম্পদ ত্রাণ আনিতে লাগিল। আরাকানওয়ারার শিল্পকার্য্য বিস্তৃত করিয়া চাউলাদির জন্য কিয়ৎপরিমাণে বস্ত্রশালের উপর নির্ভর করিতে লাগিল আর নূতন জিনিস আমদান্য পাইতে লাগিল। দিনকতক আমদান্য খাইয়া তাহাদের সুখ গেল যে আম খাইতে হইবে। অনেক চেষ্টার পর অস্ত্র preserve করিবার উপায় উদ্ভাবন হইল, আরাকানের লোক ইচ্ছা করিলে এখন আমও খাইতে পাইল।

এইরূপে ক্রমশঃ বাণিজ্য বিস্তার হইলে ক্রমে লোকের জ্ঞানস্বচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সম্ভা হয়, নূতন নূতন আবিষ্কার হইয়া কড় জগতের উপর সমুদায় আধিপত্য বৃদ্ধি হয়, বহুঘোর পরিশ্রম কম হয়, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানব জাতির সহিত মহাভুক্তি করিতে লিখে, জগৎ জুড়ি ভাই ভাই হইয়া দাঁড়ায়।

যদি জগৎ শুদ্ধ লোক বসিমাণ ঢাকা ও মালদহের মত সোজা বুকে, তবে যে দেশে বাহা সহজে উৎপন্ন হইতে পারে সে দেশে তাহাই উৎপন্ন করা কর্তব্য। সকল লোকে সকল জিনিস সম্ভা পায়। জগতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও লোকের সামগারিক দুঃখ কমিয়া যায়। ইংলণ্ডের টাকা অনেক, ইংলণ্ডের লোক খুব পরিশ্রম করিতে পারে, ইংলণ্ড

সম্রাট ইংলণ্ডে নানাবিধ কণের প্রাপ্য হয়। সুতরাং ইংলণ্ডের উচিত যে চান বাস একেবারে তাগ করিয়া কেবল নানাবিধ শিল্পের অনুশীলন করা। ক্রাফ্ট উৎকৃষ্ট ক্রাফ্ট হায়ে, উৎকৃষ্ট রেশম তৈয়ারি হয়, অতএব ক্রাফ্টের উচিত গৃহীতীর সমস্ত দেশের সদা ও রেশমের কাপড় সরবরাহ করা। ইতালীর লোক চিত্রকর্মে অভ্যন্তরীণ, ইতালীর জল ও বায়ু এবং ইতালীর নির্দেশ পরিষ্কার গগনমণ্ডল চিত্রকর্মের অনেক সুবিধা করিয়া দেয়, অতএব ইতালীর উচিত কেবল চিত্রকর্মে মনঃসংযোগ করা। ভারতবর্ষ শু ইউনাইটেড স্টেটে অপর্ণাপ্ত উৎসর্গা ভূমি আছে, অতএব ইহারের উচিত কেবল চাষবাস করা, কৃষিয়ার অপর্ণাপ্ত অহুসরা ভূমি আছে সেখানে অনেক পণ্ড পালিত হইতে পারে, সুতরাং তাহাদের উচিত পশুপালনবৃত্তি অবলম্বন করা।

কিন্তু লোকের কেমন ছুঁকি, তাহারা মনে করে তাহারা যতই বেশী খরচ করিয়া আপন আপন দেশে সকল ত্রাণ প্রাপ্ত করিলে ততই তাহাদের বাহাদুরী বেশী। ইংলণ্ডে অপর্ণাপ্ত লবণ পাওয়া যায়, প্রাপ্ত করিতে হয় না। ক্রাফ্ট শুদ্ধ বহনের খরচ মিলে সেখান হইতে অপর্ণাপ্ত লবণ পাইতে পারে। কিন্তু ছি। ইংলণ্ডের লবণ ক্রাফ্ট পাইবে। কখনই হইতে পারে না। ক্রাফ্ট প্রতি বৎসর এক কোটি মুদ্রা ব্যয় করে লবণ প্রাপ্ত

করিয়া লইবে তথাপি নিকাশ অন মূল্যে ইংলণ্ডের লবণ লইবে না। অনেক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইংলণ্ডের লোক গিয়া কেন ফ্রান্সে লবণ বেচিয়া আসে না? তাহা হইবার ছো নাই। ইংলণ্ড হইতে লবণ গেলেই তাহার উপর এত ট্যাক্স দিতে হয় যে বেচিয়া লোকসান ঘই লাভ হয় না। মনে কর ফ্রান্সে লবণ তৈয়ারি করিতে মণ করা দুই টাকা খরচ হয় ও ইংলণ্ড হইতে আনিতে চারি আনা খরচ হয়। তাহাতে ক্যামের গবর্ণমেন্ট আইন করিলেন, যে ইংলণ্ড হইতে লবণ আনিবে শতকরা সাড়ে সাত শত টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। চারি আনার জিনিসে সাড়ে সাত টাকা ট্যাক্স। ইংলণ্ডের লবণের দাম ফ্রান্সে গিয়া হইল ২৮০ হইবার উপর ব্যবসায়দারদিগের মুনাকা আছে সুতরাং ফ্রান্সে ইংলণ্ডের লবণের দাম ফ্রান্সের লবণের দাম অপেক্ষা বেশী হইল; আর কেহ ইংলণ্ডের লবণ কিনিল না। এইরূপ নিজদেশে সব প্রকার শিল্পকার্য রক্ষার জন্য ট্যাক্স করার নাম নাম Protection অথবা রক্ষা করা। ইংলণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর তাহাৎ দেশেই এইরূপ রক্ষা-কর প্রচলিত। অন্য দেশের জিনিস ইংলণ্ডে গেলে ট্যাক্স দিতে হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের জিনিস অন্য দেশে গেলেই ট্যাক্স দিতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ইংলণ্ডের টাকা বেশী। এত বেশী যে ইংলণ্ড প্রায় প্রতিবৎসর খরচ খরচা বাবে

২৭ কোটি টাকা বিদেশ হইতে লইয়া পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের লোকের ব্যবসায় বুদ্ধি অতি উৎকৃষ্ট, ইংলণ্ডের লোকের এমন ক্ষমতা আছে, যে তাহারা পৃথিবীর সকল ছুরী কাঁচি তুলার কাপড়, পাটের জিনিস, লোহার সবরকমের জিনিস, গরম কাপড়, ঠিকি কতক কতক কাঠের জিনিসও দিতে পারে। কিন্তু রক্ষা করের জন্য অনেক দেশে ইংলণ্ডের জবাবদি যাইবার ছো নাই। ইউনাইটেড ষ্টেট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে বিদেশ হইতে কোন জিনিস আনিতে দিবেন না। এমন কি কুমারের জিনিসের উপর শতকরা ৫০ টাকা রাজস্বের বসাইয়াছেন। লেডি ফসেট ইউনাইটেড ষ্টেটের রক্ষাকর সম্বন্ধীয় আহ্বানিকর এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ইউনাইটেড ষ্টেটের লোক যে পোষাক পরে, তাহার সুতার উপর ট্যাক্স, কাপড়ের উপর ট্যাক্স, গজাবের কাপড়ের উপর ট্যাক্স, বোতামের উপর ট্যাক্স; এইরূপে সমস্ত জামাটির নিয়মিত মূল্যের উপর শতকরা প্রায় ৫০ টাকা দিতে হয়। নিম্নে লেডি ফসেটের সেই প্যারা-গ্রাফটি অম্বুদিত হইল।

“আমেরিকানেরা যে পোষাক পরিয়া থাকে তাহার উপর ট্যাক্সের তালিকা। টুপি, টুপির রেশমে শতকরা ৬০ টাকা, ফিতার শতকরা ৬০ টাকা ধারে যে আলপাকা থাকে তাহাতে শতকরা ৫০ অথবা ৩৫, স্টিভরের চামড়া ৩৫, মসলিন

এক বর্গ মার্চ ৭, আটা শতকরা ২৩
টাকা; কোটি—কাগড়ে শতকরা ৫৫
বিশমে ৬০, আগপাকা ৫০, বোতাম
এক পাউণ্ড ২০ সেন্টেব্রেড এক পাউণ্ড
৫০, সেট, গলাবন্দে যে মকল থাকে
তাহাতে শতকরা ৬০ টাকা। ইত্যাদি
ইত্যাদি।

এই বন্ধা করের জন্য পৃথিবীর যে
কত অনিষ্ট হইতেছে তাহার সংখ্যা করা
যায় না। প্রোফেসর ফস্টেইনাব করিয়া
দেখাইয়াছেন যে শুধু লণ্ডনের রাসার কত
ফ্রান্সকে প্রতি বৎসর ১ কোটি করিয়া
টাকা লোকমান দিতে হয়, অর্থাৎ ইং-
লণ্ডের লণ্ডনে ও ফ্রান্সের লণ্ডনে দাম
এত তফাৎ যে ফ্রান্সের লণ্ডন কেনার
বন্ধু এই টাকা প্রজাতিগকে লণ্ডনের
দামে বেশী দিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে এই
টাকা গবর্ণমেণ্ট গান কতরাং বন্ধাকর
একটি টাকা প্রজাতিগের পকেট হইতে
না আনিয়া বিদেশীয় বণিকগণের পকেট
হইতে আসে, বেলতা। কিন্তু তাহা
নহে। মনে কর ফ্রান্সে কোটি মণ লব-
ণের মদলার ফ্রান্সে ৭৫ লক্ষ মণ
লবণ প্রস্তুত হয়, প্রতি মণের গড়তা
বার আনা। ইংলণ্ড হইতে আসে ২৫
লক্ষ মণ এই ২৫ লক্ষ মণের উপর
মদলার ১০ আট আনা টাকা দমিল।
গবর্ণমেণ্টের সাড়ে বার লক্ষ টাকা আদায়
হইল। কিন্তু প্রজাদের দিতে হইল
কত। ইংলণ্ডে কিছু লবণ এত সস্তা

নয় যে আট আনা টাক্স দিয়া বার
আনার বিক্রয় করিতে পারে যতরাং
ইংলণ্ডের লবণ এক টাকা দুই আনার
বিক্রয় হইল। কিন্তু লণ্ডনের বাজারে কতক
১০০ কতক ৮০ আনার বিক্রয় হইতে
পারে না সবই বিক্রয় হইল ১০০। সুত-
রাং ফ্রান্সের লোককে আগনাদের
৭৫ লক্ষ মণে মণকরা ছয় আনা দাম
অধিক দিতে হইল। আবার যদি টাক্স
না থাকিত তাহা হইলে হয় ত ইংলণ্ড
হইতেই কোটি মণ লবণ আনিয়া মণ
আনার বিক্রয় হইত। মণকরা আট
আনা অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর
ফ্রান্সের লোককে লোকমান দিতে
হইল। লণ্ডনমেণ্টে সাড়ে বার লক্ষ
আদারে প্রজাদের দিতে হইল ৫০ লক্ষ
লাভ হইল ফ্রান্সের জনকত ব্যবসায়
দারের, সমস্ত প্রজার নিকট হইতে ৫০
লক্ষ টাকা আদায় করিয়া কেন জন
কতক ব্যবসায়দারকে বকসিস দেওয়া
হইল।

আমাদের দেশে যে মকল কর আছে
তাহার মধ্যে কেহই বন্ধাকর নাহে।
কারণ বিদেশীয় অন্য আমাদের দেশ
না আসুক, এ অভিপ্রায়ে কোন করই
স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু এমন অনেক
জিনিস আছে বাহ্যর বিরুদ্ধে দেশে
উৎপন্ন হয় ও কিয়দংশ বিদেশ হইতে
আসে। একগ অধিকার যে দেশ বি-
দেশ হইতে আসে শুধু তাহার উপর
কর বসাইলে যে দেশ দেশে উৎপন্ন

হয় তাহার অনেক সুবিধা হয়। বিদেশীয় ভ্রাবোর আমদানী তাহাতে কিছু কম হইবার সম্ভাবনা। এক বাজারে এক জিনিস দুই দরে বিক্রয় হয় না। বিদেশীয় জিনিস ট্যাক্স দেয়, স্থতরাং তাহার দাম অধিক, দেশীয় জিনিস ট্যাক্স দেয় না, তাহার দাম কম। বাজারে দুই আদিয়া পড়িল, দেশীয় ও বিদেশীয় দুইয়েরই সমান দাম হইল। দেশীয় জিনিস লাভ হইল বেশী, বিদেশীয় জিনিসে লাভ কম। দেশীয় সপ্তদাগারের দাম শতকরা দশ টাকা কমাইয়া দিলেন, তাহারের জিনিস বিক্রয় হইল, বিদেশীয় জিনিস কেহ লইল না। যদি কখন এমন হয় যে, দেশীয় জিনিস বাজারে নাই, তবেই বিদেশীয় জিনিস বিক্রয় হইবে; নচেৎ বিদেশীয়দিগকে লোকলান দিতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় ওকণ কর রক্ষাকর হইয়া উঠে; এই জন্যই ইংলণ্ডে দুই প্রকার বস্তুর উপর সমান ট্যাক্স বসান, ইংলণ্ডের সদরকতক দেশে, কতক বিশেষ ক্ষেত্রে। দেশীয় মদের উপর একসাইট ও বিদেশীয় মদের উপর কষ্টম ডিউটি লওয়া হয়। অতএব ইংলণ্ডে রক্ষাকরের কোন কথাই নাই। আমাদের দেশে রক্ষাকর নাই। কিন্তু আমাদের দেশের কাপড় কতক দেশে টিকরাতি হয়, কতক মাক্কেটের হইতে আসে। মাক্কেটের কাপড়ের উপর আমরা শতকরা পাঁচ টাকা টেক্স

নাই। এইটি পাকটঃ রক্ষাকররূপে হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য মাক্কেটের বণিকেরা গবর্ণমেন্টে জানান। গবর্ণমেন্টে ঐ করের নিরপেক্ষ উঠাইয়া দেন। অর্থাৎ সর্বত্র ১৭ কোটি টাকার বিদেশীয় কাপড় আমাদের দেশে আসে, তাহার কর হইতে পাঁচশি লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়; ঐ টাকার বিশলক্ষ গবর্ণমেন্টে উঠাইয়া দেন। মাক্কেটের বণিকদিগের কথায় গবর্ণমেন্টের একপ কার্যো হস্তক্ষেপ করা কতদূর সুজিনিছ তাহা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু এরূপ কর উঠাইয়া দেওয়া যে উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ কর যে রক্ষাকর তাহা ফরসেট সাহেব তাহার Free Trade and Protection নামক গ্রন্থে শেষ পারাগ্রাফে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উহা রক্ষাকর হইলেও তিনি উহা উঠাইয়া দেওয়ার বিরোধী, কারণ তিনি বলেন, গবর্ণমেন্টের সময় ভাল নয়, উঠাইয়া দিলেই কোন নূতন কর লইতে হইবে সেটা বড় অত্যাচার হইবে। অতএব তাহার কথায় এই বুঝা যায় যে, গবর্ণমেন্টের সময় হইলে শত কার্য ত্যাগ করিয়া আগে ইহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

আমরা উক্ত টেক্স উঠাইয়া দেওয়ার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী; কারণ উহাতে দেশীয় জিনিসের পর্যাপ্ত দর বাড়ান হয়। আর আমাদের মত এই যে, যে সকল সুব্যবসায়, বৃত্ত, ভৃত্ত, পরিগ্রহ সকলেরই

নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মূল্য যা-
হাতে কমে, তাহা গবর্ণমেন্টের দেখা
নিতান্ত প্রয়োজন। এমন অবস্থায় যে
কোন উপায়ে ঐ টেক্স উঠাইয়া দেওয়া
নিতান্ত আবশ্যিক। প্রজাগাধারের
হিতচিন্তা গবর্ণমেন্টের কাজ। যেটি
সাহায্যে হয়, গবর্ণমেন্টের সেইটি করা
সকলের আগে। ঐ টেক্স উঠাইয়া
দিলে ৮৫ লক্ষ টাকা দরিদ্রপ্রজাদের
ঘরে জড়াইয়া পড়িত সন্দেহ নাই।
কারণ ধনীলোকে আজিও দেশীয় ক্ষুদ্র
স্বল্প (গাছার মূল্য অত্যন্ত অধিক) ব্যবহার
করিয়া থাকেন। জড়াইয়া পড়িলে যে
চামচামের সুবিধা হইত, তাহার আর
সন্দেহ নাই।

ইংরেজি সম্বাদপত্রগুলারাই ঐ টেক্স
উঠাইয়া দিনান্ত সময় বড়ই চীৎকার
করেন, তাহারা বলেন একপ করিলে
বোম্বায়ে যে সকল তুলাকল হইয়াছে,
তাহার ক্ষতি হইবে। এটি সম্পূর্ণ ভ্রম
কারণ বোম্বায়ে যে সকল কল আছে,
তাহারা ৮৫ বৎসর কাল চালাইতেছে।
মাক্ষেত্র অপেক্ষা তাহাদের অনেক
সুবিধা। মাক্ষেত্রকে এদেশ হইতে
তুলা কিনিয়া বহনি খরচ করিয়া লইয়া
বাইতে হয়; আবার বহনিখরচ করিয়া
ফিরাইয়া দিয়া বাইতে হয়। ইংলণ্ডে
বজুরি বড় অধিক, এখানে মজুরি বড়
কম। ভারতবর্ষীয় বাস্তবের মাক্ষেত্র
অপেক্ষা বেশত বোম্বায়েগুলাদের প্রভুত্ব
অধিক। বোম্বায়েওলা ইংলণ্ড হইতে

অল্প ব্রহ্মে টাকা লইয়া এইখানে বসিয়া
হইবারকার বহনি বাচাইয়া, অল্প মজু-
রিতে যদি মাক্ষেত্রকে ডরান, তাহা
তাহাদের ব্যবসায় না করাই ভাল।

মিল বলেন যে, যখন বিদেশে একটা
কাল অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে,
দেশে সেই কাজটা আরম্ভ করিতে হ-
ইবে, তখন তাহাকে রক্ষা না করিলে,
বিদেশীয়দিগের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে
পারিবে কেন? একপ করা কমেট
সাথেব যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না।
কারণ তিনি বলেন, যাহাদিগকে এক-
বার রক্ষা করা হয়, তাহারা চিরকাল
“রক্ষাকর রক্ষাকর” বলিয়া চীৎকার
করে, তাহারা আগ্রনির্ভর শিখে না।
আমরা কমেটের যুক্তির সম্পূর্ণ অস্ব-
স্বোদয়ন করি না; কারণ রক্ষা করা না
করা রক্ষিতদের কথাচুসারে ত হইবে
না, তাহার জন্য একটা গবর্ণমেন্ট
আছে, গবর্ণমেন্ট নিজে যখন বুঝিবেন
যে, রক্ষা আর উচিত নহে, তখন রক্ষা
উঠাইয়া লইবে। অতএব প্রথম অব-
স্থায় মিলমতানুযায়ী হইয়া রক্ষা করা
উচিত। একপ রক্ষা বোম্বায়েওলাদি
৮৫ বৎসর পাইয়াছেন, এখন গবর্ণ-
মেন্ট যেমন বুঝিবেন তেমনি করিবেন,
তাহাদের আর রক্ষা চাওয়া অন্যায়।

আমাদের দেশীয় লোকেরও টেক্স
উঠিরা গেলে সুবিধা বই অসুবিধা
নাই, সুতরাং দেশীয় সম্বাদপত্রগুলারাই

সে কেন উহার বিরোধী হইয়া উঠাই। তাহারা আনিও যৌবন গড়ানিকা
হাহিলেন তাহা আমরা জানি না। এখানেও অগ্রণীর পথানুসরণ করেন।

নৈষধ সমালোচনা।

মেঘপীঠের মিল্টন প্রভৃতি অধিতীর
কবিগণের রূপায় ইংরেজি সাহিত্যভাণ্ডার
অপূর্ণাধি রূপে পরিপূর্ণ। এই সকল
কবি মিল্টন প্রণীর মধ্যে, এক একটি
এক একখানি কহিনুর। সামান্য রত্নের
ত গণনা করা যায় না। শতাব্দীর
নৈষধগণের নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় রক্ত চামি
দিকে ভ্রমণ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য-
ভাণ্ডারে রত্নের এত ছড়াছড়ি নাই
যে, কিন্তু কাণিঙ্গাম ও ভবভূতির অট-
প্রভে কহিনুরের অভাব নাই, তবে
সংখ্যায় অল্প। কিন্তু ইংরেজিগণের
ভাষায় যেমন যে যবের রক্ত ধুঁজিবে,
তাহাই নিলিবে, আশীশগণের ভাষায়
হেমনটি হইবে না; কহিনুরের নীচেই
একশতের কুঁটো। কাণিঙ্গাম ভবভূতি
প্রভৃতি দুই একজনকে পরে প্রকৃত কবি
হইয়া আমাদের নগরে তৈকে না। তবে
কি আশা! নগর কিছু উচু ও তাহা
নহে, বাক্তবিক্রই কবিনাদের বেগ্য
পাওয়াবির অতি বিরল। কাণিঙ্গাম
প্রভৃতি যে দুই একজন আছে, তাহা-
দেরও এই মেঘপীঠের ইত্যাদি নাম
নাম্বার অধিক নহে। আমাদের বিশে-
ক্রম উহার দুইটি কারণ আছে।
এবং প্রায়শঃই অজ্ঞান, দ্বিতীয় রোজ

কর্তৃক বিলোপ। যে কারণেই হউক,
কলে আশাশ্রয়ের কবি ও কাব্য অতি
অল্প। কুমার, হুম্ব, শকুন্তলা, মেঘদূত,
কিন্দাহার্কুনীর, শিশুপালরথ, নৈষধচরিত,
রত্নাবলী প্রভৃতি কল্পখানি কাব্য সাধারণতঃ
উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইয়া
থাকে। ইহাঙ্গিগণের মধ্যে এই প্রস্তাবে
নৈষধের সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য।
পূর্বেই বলিয়া রাখা উচিত যে, বঙ্গীয়
সুবেশেরা বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত;
অন্য অধিকার সমালোচনাতারা অনেক
আমাদের উৎসাহিত এই নামে বলঙ্গ
করিতে চাহি না।

বঙ্গদেশ বহুকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্রের
চর্চার জন্য সমৃদ্ধি বিখ্যাত। বারা-
নসী, পুনা, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা স্থান
হইতে বঙ্গের বঙ্গের দলে দলে ছাত্র
আসিয়া তথ্যাপি নবদীপে ন্যায়শাস্ত্র
পাঠ করিয়া থাকে। ভিন্নদেশে বিশে-
বৃত্ত: পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গীয় নৈষধিকদিগের
বিশেষ প্রতিপত্তি এবং স্বদেশেও নৈষা-
য়িকেরা সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়া
থাকেন। ন্যায়শাস্ত্র যে বিশেষ গৌর-
বের বস্তু তাহার এক প্রমাণ এই,
এতদেশীয় যাবতীয় উপাদিই (বিদ্যা-
নিধি, শিখোমনি প্রভৃতি কয়েকটি বা

কী) নায়শাস্ত্রটি কোন না কোন শব্দ লইয়া রচিত; অর্থাৎ নায়শাস্ত্র না জানিলে কেহই পণ্ডিত নাম পাইবার যোগ্য নহেন। এবং নৈয়ামিকদিগেরও এমন একটু কুস্তিমান আছে যে, তাঁহাদের মত স্তম্ভবুদ্ধি জতি অল্প লোকের আছে। এ কথা কতদূর সত্য তাহা এস্থলে আমাদের বিবেচ্য নহে, আমরা প্রকৃত ঘটনা বর্ণন করিতেছিলাম। বঙ্গদেশের মুখোজ্জলকারী এই পণ্ডিতদিগের নিকট নৈয়ামের বড় আদর; নৈয়ামের প্রশংসা তাঁহাদের মুখে ধরে না। বাস্তবিকও তাঁহাদের প্রশংসা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। নৈয়াম একঘন কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ামিকের রচিত। যিনি যে বিষয়ের চর্চা করেন, তাঁহার সেইটাই ভাল লাগে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রব্যবসায়ীরা যে কিছন্ন নৈয়ামকে উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণনা করেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধরিল না। ভট্টাচার্যসহস্রালে নৈয়ামের প্রায় আদর যে, ইহার প্রশংসার জন্য দুই তিনটা কবিতা চলিয়া গিয়াছে।* অথবা ভট্টাচার্য মহাশয়েরা যে এরূপ বলিবেন, তাহা বিচিহ্ন নহে। কারণ তাঁহারা বলেন, “রঘুরূপি কাব্যে তদপি চ পাঠ্যং।” ইহারা কবির লক্ষণ কি, কি কি গুণ থাকিলে কোন গ্রন্থকে কাব্য বলা যায়, তাহা জানেন না। ইহাদের মতে

যাহাতে নূতন নূতন ভাব ও অলৌকিক বর্ণনা আছে, তাহাই কাব্য। যদি এই কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে আরব্য উপন্যাসের রচয়িতার হার উৎকৃষ্ট লেখক কোন কালে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই। মৌলবীসৃষ্টিই কাবির প্রকৃত উদ্দেশ্য। নৈয়ামকার কবি নহেন, একজন নৈয়ামিক, সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তাঁহার দৃষ্টি নাই। কতকগুলি অসম্ভব বিষয় বর্ণনা করিয়া গুরু পরিপূর্ণ করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে, নৈয়ামে কবিতা-শক্তির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে ইহাতে লেখকের অসামান্য ক্ষমতা ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বটে।

এই গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে। মল্লময়ভট্ট, সার্বভৌমভট্ট ও শকুন্তলা প্রভৃতির প্রণয় লইয়া বহু কবি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। কালিদাস ও শ্রীহর উভয়ে একই পুস্তক অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, সুতরাং উপাখ্যান ভাগ লইয়া উভয়ের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে কে কিরূপ কবি। চিত্রকর আপন হইতে বঙ্কিনিয়া লইয়া সেইগুলি মিশাইয়া নূতন নূতন বহু প্রকৃত করে, এবং তাহাতে এরূপ সুন্দর ছবি আঁকে যে দেখিলে মর্শ্বের নয়ন জড়ার

* “উনিতে নৈয়ামে কাব্যে ক কাব্যঃ ক চ ভারবিঃ।”

“নৈয়ামে পদগাথিত্যং।”

ও মন মুগ্ধ হইয়া যায়; সংকষিও সেই
রূপ কোন পৃথক হইতে উপাখ্যান
লইয়া নিজ কল্পনোচিত ঘটনায় লিখিত
মিলাইয়া এমন অপূর্ণ কাব্য রচনা ক-
রেন যে, অধ্যয়ন করিলে পাঠকের
ক্লম আনন্দে মৃত্যু করিতে থাকে।
কালিদাস মহাভারত হইতে শকুন্তলার
ইতিহাস লইয়া আপনি বুদ্ধিপ্রভাবে
যে অপূর্ণ নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন,
আজি দুই হাজার বৎসর পরেও লোকে
তাহা পাঠ করিয়া নিরুপম আতি
স্বস্ত্যব করিতেছে। কিন্তু ক্রীত্ব লইয়া
মহাভারত হইতে শকুন্তলা অপেক্ষা
বহু অধিক মনোরম উপাখ্যান লইয়া যে
কাব্যপ্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে আতি
দূরে যাউক, প্রত্যুত বিরক্তি জন্মে।
মহাভারতের নবোপাখ্যান অতি মিষ্ট;
মলদমস্বতীর প্রণয় অতি মধুর ও পরিষ্ক-
ল প্রেমের শব্দীর সংশ্লব নাই, কেবল
দাদরই তাহার রসময়; যখন মলদমস্বতী
কলিন প্রভাবে বুদ্ধিপ্রসঙ্গে নিজ জা-
তাবে একাকিনী বনমধ্যে পরিত্যক্ত
করিতে উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার
মুখের ভাববর্ণনা পাঠ করিলে মহাভারত-
করকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়,
আবার তাহার ক্রিয় পরে স্বামীকর্তৃক
তাহার অসহায়্য দময়ন্তীর বিলাপ পাঠ
করিলে, কোন পাখ্যবস্তুর মননহুটি
হইতে অসহায় অশ্রুধারা নির্গত না হইত।
অনন্তর উভয়ের মিলন বিস্তারিত কলতঃ
মহাভারতের নগরস্বতী এক অপূর্ণ

পদার্থ। নৈমধকালের অঙ্কিত মলদম-
স্বতীটির ইহার ঠিক বিপরীত। ভারত-
চক্রের বিলাসস্বতীর তাদৃশ মলদমস্বতীর
প্রণয় শব্দীরই শেষ হইয়াছে; বদলে
প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমরা
সংস্কৃত পুস্তকাদিতে চম্পুরাণের বর্ণনাই
দেখিতে পাই কিন্তু নৈমধে আবার প্রণয়
রাগ পাউলাম; লোকের মুখে ও হংস-
মুখে পরম্পরের রূপ ও গুণবর্ণনা প্রণয়
করিয়া নল ও দময়ন্তী পরম্পরের প্রতি
অন্তরল হইলেন। শুধু তাহাই নহে, তখন
এমন উৎকট বিরহবাণী উপস্থিত হইল
যে, তখন চিন্তাসক আনা আবশ্যক
হইয়াউঠিল। আমাদের দেশে প্রবাদ
আছে যে, নির্ধনচোর নির্ধকটী গড়া-
ইবার জন্য একতুলা কড়ি রাজিশেষে
কামার শালে রাখিয়া আসে, প্রভাতে
কামার তাহা দেখিয়া সঙ্কেত সুনিয়া নির্ধ-
কটী গড়ে ও সন্ধ্যাকালে রাখিয়া চলিয়া
যায়। নির্ধকচোর আসিয়া তাহা নাই
যায়। চোরে কামারে দেখা সাক্ষাৎ
হয় না, অথচ মধ্যে মধ্যে নির্ধকটি
তৈয়াগি হয়। আমাদের নৈমধকারবিরহ
প্রণয়ও ঠিক বৈকল্য। নাথক নারি-
কালে দেখা শুনা নাই অথচ মধ্যে
মধ্যে প্রেমবিরহ প্রভূতি সকলি হইয়া
গেল। অবিদ্যাজিরপ্রভাষ। হে অধু-
নিক বঙ্গীরলোকসমাজ! কেন তোমরা
তুণ্য গর্ভবতীজায়া বাফালিদিগকে বিবাহ-
প্রথার জন্য অনায়াসে মিলি কর, কেন
বল বরকন্যার বিবাহ না হইয়া আজি

কালি বরকতী ও কন্যাকর্তার বিবাহ
হয়। দেশে গেলোও একথা চলিত
ছিল। মেটী কথা আমাদের বিবেচনার
নৈবদ্যবিশিষ্ট প্রথম অঙ্গকূট প্রথম। এনি-
য়ে কখনওসে আদিগণের জনস্বকন্দনের
হার উদঘাটিত করিয়া দেখ, বাহা আদি-
কবির জনবিনোদনকারিনী এইকাল-
মিত্যা নৈবদ্যে সেই কখনওসের একাঙ্গ
অভাব। যে অংশে এই শক্তি প্রকাশ
করিবার সম্পূর্ণ অবকাশ ছিল, নৈবদ্যিক
কবি উপাখ্যান ভাগের সেই অংশ গতি-
ভাগ করিয়াছেন। জনকর্তৃক দমনপ্রী
ভাগের বিষয় নৈবদ্যে বর্ণিত হয় নাই।
বিবাহানন্তর কন্যার পতিগৃহাগমন
পর্যন্ত চিহ্নভে বর্ণিত আছে। এবং
এই কারণেই এতদূর প্রকাণ্ড এত
ঘটনাসংখ্যা আর হইয়া পড়িয়াছে।
অতঃপর ইহা পাঠ করিতে দিবলি সন্নিহা
হয়।

সমগ্রের ভাব মকলি হয়। মহাভা-
ষায়ের পণ্ডিতগণ যে মনস্ত উৎকৃষ্ট
উৎকৃষ্ট বিষয় নিজগোষ্ঠে বিবৃত করিয়া
আশ্রয় আভিলাষ করিয়া গিয়াছেন, সে
মকলও সমগ্রের ফল। অনেক বঙ্গের
ধর্ম্মা ভিন্ন ভিন্ন মহাত্ম্যের কারণে সেই
কাবলি আবির্ভূত হইতেছিল, একজন
পণ্ডিত জন্মিয়া সেইগুলি গুরুত্বপূর্ণ
বা জনসাধারণের প্রকাশ করিলেন
মাত্র। একজনগণের অভ্যাসের ভাণী-

জিত হইয়া, যাকে তালাগের হই
হইতে নিকৃতি পাইবার জন্য মনো-
হইতে মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে-
ছিল, শাক্যদিহ জন্মিয়া তাহা সাধন
করিলেন। তবে রক্তর, শেকর, উত্ত-
ফিল প্রভৃতির মার হই একজন
মহাত্মা মনঃকণ্ঠে অতিক্রম করিয়া
উঠেন মহা। কিন্তু যেকোন লোক হইতে
করই জগৎগমন করিয়াছেন। যদি এই
কথা মত। হয় তবে প্রাথমিক সময়ে
পাদুভূতি জন, সেই সময়েই সমান
নীতিমতে অতি শোভনীয় অর্থদ্বার
পতিত হইরাছিল বলিতে হইবে।
নৈবদ্যে একথা বর্ণনা অনেক আছে
যাহা স্মৃতির বিরুদ্ধ। যখন স্থানে
জীলোকদিগের উজ্জ্বলিতও একথা কখন
ভাব নিপিত হইয়াছে যে, তাহা ভয়-
ভোক্তের অপাতী। যোদ্ধা মর্মে ভয়-
ভীর সঙ্গীনের পরিত্যক্ত বর্ণনা পাঠ
করিলে, আমাদের কথা মত কি না,
পাঠক বুঝিতে পারিবেন। এই সকল
বর্ণনা সমগ্রের ইতিহাসের পরিচয়
দিতেছে। বাস্তবিকও ইতিহাসপাঠে
অবগত হওয়া যায়, যে সকলেই
রাজ আদেশ পাওয়া যাইত না বলিত
আদিপুত্র জনোক্ত হইতে পক্ষ আদেশ
আসন্ন করেন, প্রীর ইত্যাদির মধ্যে
একজন। প্রীর যে মহাত্ম্যের বিবাহ
ভাষার গুরুত্ব পাঠে বিলক্ষণ অবগত
হওয়া যায়।

* চতুর্দশ সর্গে বর্ণিত আছে যে বনয়ন্ত্রী মনকে পতিগৃহে বহু ব্রতিলে পুত্র
স্বকলীয়া উপস্থাপিত করিল।

আমরা নৈমগ্নের দুই একটি বর্ণনাও
বিবরণ এই স্থানে উল্লেখ করিব। সমু-
দায় উল্লেখ করিতে গেলে, পাঠকগণের
বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা। নৈমগ্ন
খুলিয়া প্রথমেই রূপবর্ণনা করিলে পড়ে-
বিশেষ বুঝাঠকগণের যুবতীর রূপ-
বর্ণনা বড় ভাল লাগে। সুতরাং প্রথমে
রূপবর্ণনাই আরম্ভ করা বাউক। শ্রীহর্ষ
ও কালিদাস উভয়েই রূপবর্ণনা করি-
য়াছেন, ইছাদের উভয়ের তুলনা করি-
য়েই বুঝা যাইবে যে, নৈমগ্নকার বিরূপ
বর্ণনা করিতে সক্ষম।

নৈমগ্নে দুই স্থানে ব্যঙ্গিকার রূপ বর্ণিত
হইরাছে, প্রথম, দ্বিতীয় সর্গে হেমমুখে,
দ্বিতীয়, সপ্তম সর্গে নারকমুখে। দ্বিতীয়
সর্গে ২১টি এবং সপ্তম সর্গে ৮টি শ্লোক
কবি রূপবর্ণনা শেষ করিয়াছেন। বর-
বুড়ি কালিদাস রূপবর্ণনার মোটে ১৬টির
বেশী শ্লোক লিখিতে পারেন নাই।
নৈমগ্নারকমহাশয়দ্বিগের পরমাণুরও অল্প
বুড়িতে এইটি শ্রীহর্ষের অসাধারণ ক্ষম-
তার পরিচয় দিতেছে; একটি বিষয়
হইয়া কালিদাস ১৬টি বই কবিতা লি-
খিতে পারিলেন না; কিন্তু স্বর্গীয়শক্তি-
সম্পন্ন শ্রীহর্ষ একেবারে খসিকা নাতিয়া
দিলেন; একি নাম না থাকিলে কর্মই।
কিন্তু ভট্টাচার্য্যমহাশয়দ্বিগের এইরূপ
জ্ঞান নাই যে কবিতা ও বর্ণনা-বিষয়
(proliant) পরস্পর বিকল অগ্রপাত
(Inverse Ratio) বিশিষ্ট কবিত্বশক্তি
যত করিতে থাকে, বর্ণনাও তেমনি

বাড়িতে থাকে। কবিবির লিখিয়া আর
আকাঙ্ক্ষা নহে না, তিনি যতই লিখুন
না কেন, তাহার বোধ হয় বুঝি আরও
কিছু লিখিলে সম্পূর্ণ হইত, এখনও
বাঁকি আছে। তাহার বুঝিতে পারেন
না যে, কতকগুলি রঙ চানিরা দিলেই
চিত্র স্থল্লব হয় না। যদি তাহা হইত
তাহা হইলে ভগতে সকলেই এক এক
মন উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইত। সুচিত্রকর
যেহানে যতটুকু রঙ দরকার হয়,
তাহা অপেক্ষা একটু বেশী দেন না।
কাব্যমুখে আবার সংক্ষেপই নাকি।
পোক্ষা স্থল্লব, দুই একটি কথাই ভিতর
এত কবিত্ব থাকে যে, তাহা প্রকাশ
করা হুঃসাধ্য; কবি ভিন্ন মিষ্টর কেহই
অভূতব করিতে পারেন না। কালি-
দাস 'মুকাওগ্রং শাস্ত্রমুগপ্রচারঃ' এই
একটি কবিতার বসনধো নিশ্চক্ৰতার যে
চমৎকার ও দীপ্যমান বর্ণনা করিয়া-
ছেন, নৈমগ্নকার স্বাক্ষ লক্ষ কবিতা
লিখিয়াও কোন স্থানে সংক্ষেপ কবিত্তে পা-
রেন নাই। বাস্তবিক সংক্ষেপ (Brevity)
কবিত্বশক্তির একটি প্রধান লক্ষণ।
'হে "কি বীজরশ্মি সং পিঅনহি মে"
বুঝিয়াছে সেই সংক্ষেপের সূর্য্য জ্বলি
য়াছে। যাহা হউক এক্ষণে প্রকৃতমাত-
সবায়। কালিদাস পার্শ্বীয় সৌন্দর্য্য
বর্ণনা করিবার জন্য একটি কবিতা
লিখিয়াছেন;—

'খুল্যে প্রাণলোপাইতা বসি মাং মুক্তা-
কলরা সূতবিজরতা।

অতঃপর কুখ্যা বিদ্যনা তস্য। প্রজ্ঞোতি
পরীক্ষকঃ স্মিতস্য ॥”

শ্রীহর্ষও দশমস্তীর দ্বিত্যবর্ণনার্থেইকণ
এই কবিতাটি লিখিয়াছেন,—

“যদি প্রমাদীকুরতে স্বধাংশো রেখা
মহাত্মাংশমপি স্মিতস্য।

তৎ কৌমুদীনাং কুরতে তমেব নির্বন্ধা
দেবঃ সফলং স্বগন্ধা ॥”

প্রথম শ্লোকটি পাঠ করিবার কৈ-
মন একটু অভূতপূর্ব আনন্দ মনোমধ্যে
উদ্ভূত হয়; দ্বিতীয়টির প্রথমতঃ অর্থ
এই হয় না। পরে কথঞ্চিৎ অর্থগ্রহ
হইলে ভাব কিছুমান দেখিতে পাওয়া
যায় না; কবিত্বের ত কথাই নাই।
বাক্যগুলি সংযুক্ত কণা হ্রস্বাকারে
সাজান হইয়াছে এইমাত্র বোধ হয়।
অন্যান্য স্থলেও এইরূপ। বাচল্য ভয়ে
তাঁহা পরিত্যক্ত হইল। নগরাদি বর্ণন
স্থলেও এইরূপ ভ্রমের আকারে সামান্য
সংস্কৃতমাত্র, ভাবের সম্পূর্ণ অভাব।
সুপবর্ণন হলে এরূপ এক বর্ণনা আছে
তাঁহা পাঠ করিলে ইচ্ছা হয় যত শীঘ্র
নৈবদ্য সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লোপ
পায় ততই ভাল; ভারতবর্ষে এরূপ
অসঙ্গী বর্ণনা করিতে সাহস করেন
নাই। অসঙ্গী বর্ণনার দুই একটি উদা-
হরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।
বিদর্ভনগরের বর্ণনার কালে কবি বলি-
তেছেন,—

ঐদর্ভীকেনিশৈলে মরুতশিশিরাত্মৈত
ব্রহ্মসর্পৈত

এ আভাষাত ভরসামজমহতাহী যুত
বাক্যখরঃ।

কসানোজানগরা দিবি স্বরহরভিরাগ
দেশাগতাগে
যদোপ্রাপপ্রদান ঐতহুকৃত মবিশাক
মুজ্জ ভতে য ॥

এই শ্লোকটি পাঠ করিলে বোধ হয়
উচ্চশ্রেণীর চিত্তশক্তি অপথে নিয়ো-
জিত হইয়া এতাদৃশ বিকৃতভাব দারণ
করিয়াছে। কোম উৎকৃষ্ট খাদ্য অন্য
পাটয়া গেলে অধিক ভুগ্ন হইয়া থাকে,
কোন সংকুলজাত ব্যক্তি অন্যায় কর্ত্ত
করিলে সমধিক নিন্দনীয় হইয়া থাকে-
ন। নৈবদ্যকারের উন্নতশ্রেণীর চিত্তা-
শক্তি, কিন্তু উহার দহিত কবিত্বশক্তি
নাই, সুতরাং সেই চিত্তাশক্তি কাব্যে
নিয়োজিত হইয়া এই হাস্যজনক ফল
উৎপাদন করিয়াছে। হংসস্থলে নলের
কীর্তন প্রবল করিয়া দশমস্তী তাঁহার
প্রতি অশ্রুতলা হইলেন; এবং হংস
প্রহান করিলে নলের বিচ্ছেদে একান্ত
অধীর হইয়া সখীকে কহিলেন,—

কুর করে শুক্লমেকময়োখনং বহিরিতো
যুকরক কুরক রে।
বিশতি তজ বদৈব বিধুস্তদা শপি স্থগা-
দহিতং জহি তং ক্রতং ॥

এই কবিতাটি বিষংবেদনা প্রকাশের
যত উপকারী হউক না হউক, হাস্য-
রসের বিশেষ অম্লকুল। এবং ইহা
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কবি ইহা
জানিতেন না, যে বস্তুর তত্ত্বের দ্বারা,
তাঁহার প্রতিবিম্ব ঠিক তত্ত্বের পথে।
শ্রীহর্ষ স্থানে স্থানে একার্থক দুই বা

সংস্কারিক দ্বারা রচনা করিয়া গিয়াছে, এবং সেগুলি যে প্রকৃষ্ট নহে তাহাও বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। যে ব্যক্তি কবি বা বিনি কাব্য রচনা, প্রাদিগিকে বসাইবার আবশ্যক নাই যে ইহা কবিত্বশক্তি অভাবের অন্যতন প্রমাণ।

নৈমগকার যে এত বড় প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাতে কি তাহার কোন কণ্ট দৃষ্টিতে পাওয়া যায় না? নকলই কি আসার? অর্থাৎ কোন বস্তুই কল্পিত নহে, কেবল সোয় বা কেবল ক্ষণ কোথাও দেখা যায় না; নৈমগকারের পথেরই কি কেবল এটুকুটি বিশদীকৃত হইল? তাহা নহে। উহাতে অবশ্যই কোন না কোন গুণ আছে। আমরা এক্ষণে কেবল নিম্না করি যাঁহি, এক্ষণে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়া সম্বরণ সন্মাপন করিব। আমরা যে নিম্না করিয়াছি বলিয়া প্রশংসা করিব তাহা নহে; নৈমগকার যতটুকু প্রশংসা পাইবার যোগ্য, ততটুকু তাঁহাকে দিব। নৈমগের ভাষা অতি চমৎকার, দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, কোথাও একটু ময়লা নাই। পাঠ করিলেই মনে হয় উহার ভিতর কত ভাবই আছে। ভাষা কোন স্থানেই গ্রাম্যতা লোকে দৃষ্টিত হয় নাই, দর্পণই উন্নত ও মধুর। সোয়ের মধ্যে কিছু প্রতি-সহস্রে অগবোধ হয় না। আর যে পরিভ্রমে অণুটুকু বাহির করিতে হয়, তাহার সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, কারণ পুস্তকই বস্তু পিরাতে ভাব অতি আর আছে। সোয় প্রত্যক্ষের লোখাও অবিদ্য, কিন্তু তাহাতে বস্তু থাকাকে পরি-প্রদর সাক্ষ্য হয়, নৈমগে সেটুকু হয় না এই উক্ত্য।

নবজীবন পুস্তক হইতে জীবনে নিরাপ হইয়া যে বিশালা করিয়াছে তাহা পাঠ করিলে নৈমগ হয় নৈমগকার চেষ্ঠা ক-পিলে বর্তমান গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন। বাস্তবিক তাহাতে কবিত্বের ক্ষতি আছে।

মণ্ডনশ মর্জের মধ্যভাগে চারিদিক স্তব বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশটী মনপ পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট অংশ। ইহা শ্রীহর্ষের লম্বা প্রকাশের প্রকৃত সময় এবং উহাতে তিনি যথাক্রমে বস্তুকার্য হইয়াছেন। তিনি চারিদিকের নব এত বিশদরূপে ও প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া বস্তুবর্ণন করিয়াছেন যে তাহা পুস্তক করা অতি দুঃস্বপ্ন। দেবতারা যেক্ষণে তাহা পুস্তক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে তাহা অপ্রমাণ করা প্রমাণ। এই মত পাঠ করিলে অকণ্ড বরাবর যে তদানীন্তন সমাজ পুস্তক ইঞ্জিয়সম্বন্ধে পরম সুব মনুষ্যস্বীকৃতির ন্যায় উদ্দেশ্য মনে করিত। Epicurean মত যেক্ষণে ক্রমে ধীনরমায় উপস্থিত হইয়াছিল, চারিদিক মতও এই সময়ে সেইরূপ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে নৈমগবর্ণিত মনরাজ্য একজন বিলাসী ইন্দ্রিয়শক্ত ব্যক্তির হার হইয়াছেন। উৎকৃষ্ট স্বপ্ন-দেব গুণ তাহার কাব্যে প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীহর্ষের আর একটি ভাষ্যমায় বিষয় এই যে তিনি অমুদ্রণ করেন নাই। ভাবই হউক আর মনই হউক নকল ভাবই নিম্নের, অস্ত্রের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। করণার বলে নুতন জীবন কৃষ্টি করিতে গিয়া, অস্বাভাবিক করিয়া কেলিয়াছেন। মাঘ প্রকৃতির ন্যায় তাহার চুরি নাই।

বঙ্গদর্শন ।

সপ্তম বৎসর ।

৭৪ সংখ্যা ।

বঙ্গোন্নয়ন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বাঙ্গালার বায়ু ।

বাঙ্গালিরা যে পদ্মাবী, উত্তরপশ্চিমা-
ফলবাণী ও অধোবায়ুসীমার অ-
পেক্ষা করিল এ কথা বোধ করি সকলেই
স্বীকার করিবেন। তাহাদের দৌর্বল্যের
কারণ কি ?

কেহ কেহ বলেন যে, তাহাদের
আহারের দোষে তাহাদের শক্তি বর্ধন হয়
না। কেহ কেহ বাঙ্গালিবিবাহ প্রভৃতি
সামাজিক আচারের দোষ দিয়া থাকেন।

তাহাদের সকলের কথা যে অনেকদূর
সঙ্গত হইবে আমরা স্বীকার করি। কিন্তু
তাহাদের এই ভ্রম যে, তাহারা অপেক্ষাকৃত
কারণকে প্রধান কারণ বলেন। বাঙ্গা-
লার বায়ুই বাঙ্গালিদের দৌর্বল্যের প্রধান
কারণ। বেহারের মো, অস, নেব ও
ছাগ বাহা ভক্ষণ করে, বাঙ্গালার গবাদি
তাহাই ভক্ষণ করে; তাহাদের মধ্যে
বাঙ্গালিরাহের নিয়ম নাই; তবে কেন
বাঙ্গালার গবাদি বেহারের গবাদি অ-
পেক্ষা করিল ?*

* বাঙ্গালার ঘাসে জলভাগ অধিক পাঠে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহাও
বায়ুর দোষে। বাঙ্গালার আর সমস্ত পশুই দুর্বল। কিন্তু শাব্দ, গভার ও বন্য-
মহিষ অতিশয় বলবান। ইহার কারণ কি? শুকটন। শুকটনের অজবায়ুতে
কি বায়ুর কোন অনিশ্চয় হয় না? শুকটনের কোর বধোন যে, শুকটনের বায়ুর
বল আফ্রিকার সিংহের বল অপেক্ষা নূন নহে; যতঃ কিয়ৎ দৈনিক হইবে,
ততবাং বায়ুকে শক্তির বল শইতে পারে। ১৮৫৯ সনে ইংলণ্ডে একটি
নিজরবন্ধ সিংহের সহিত একটি বায়ুর যুদ্ধ হয়, সিংহ হত হয়। (Darwin's
Descent of man & Sexual selection, 2nd edition, P. 521.) এই একটি
দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া বায়ু সিংহ অপেক্ষা বলীয়ান বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে
পারে না; কারণ ইহা সম্ভব যে হত সিংহ বায়ু অপেক্ষা অসমর্থ বা শীতলাতর

বাঙ্গালী গ্রীষ্মপ্রধানদেশ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর শুভ কল এই যে পূর্বের আনায়ে আহারের দ্রব্যাদি অনায়াসলব্ধ, আর বস্ত্রেই দারীসরপা হইতে পারে, শীত-নিবারণ জন্য হৃদয়াদির প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। অশুভফল এই যে সপ্ত ও ঋণদক্ষতার ভয় অধিক, এবং ওষাউতা ও জরের অধিক প্রাক্ত্যাব। তবে শীতপ্রধানদেশে অণেক্ষা কামাদি কুফুসের রোগ অনেক কম।

অনেকানেক ইউরোপীয় গণিত বা-
গর উচ্চতা মানবপ্রকৃতির তেলবিত্তি-
হাতির যেমন কারণ বলেন, বস্তুকঃ
তাহা তেমন প্রবল কারণ কি না স-
ন্দেহ। আরবস্থানের বায়ু যেমন উষ্ণ,
এমন উষ্ণবায়ু প্রায় কোন দেশেই নাই,
অথচ আরবদের নায় তেজস্বী জাতি
বিরল। উইলিয়ম ওয়েট গার্ড ও সামু-
য়েল্ নসমান, বাহারা অষ্ট্রেলিয়ার অর্ধ-
খনির বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন,
তাঁহারা বলেন যে ঐ দেশে অদ্যাপি
ওষাউতারোগ প্রবেশ করিতে পারে

নাই। এষ্টেলিয়ার বায়ু অতিশয় বায়ু
কর বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু গ্রীষ্মে তথা-
কার উপকুলেও তাপাংশ একশতের
অধিক হয়।

তাপের সহিত অধিকপরিমাণে জলীয়
গরমায়ুর সংযোগ হইলে যেমন অনিষ্ট
হয়, কেবল তাপে তেমন হয় না।

বাঙ্গালার বায়ু উষ্ণ বলিয়া দৃষ্ট নহে,
প্রচুর বাষ্পপূর্ণ বলিয়া দৃষ্ট। একপ বায়ু
বৃদ্ধাদির পক্ষে ভাল; কিন্তু জীবজন্তুর
পক্ষে ভাল নহে।

বাঙ্গালার ভূমি মাগরপৃষ্ঠ হইতে অত্যধ
উন্নত। নীচদেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে
আর তাহার রক্ষা নাই। তথাকার বায়ু
নিশ্চয়ই বাষ্পহুত এবং অস্বাস্থ্যকর হ-
ইবে। হলও শীতপ্রধানদেশ; এবং
ওলন্দাজগণ ভূমি শুষ্ক করিতে অতিশয়
নরশীল; তথাপি দেশ নীচ বলিয়া,
তথাকার বায়ু বিলক্ষণ বাষ্পময়, এবং
তথায় পানাস্বর, কাশ ও বাতের বিল-
ক্ষণ প্রাক্ত্যাব। বাহাণার আরাকর্ক-
স্থানেই জর দিয়াধমান রহিয়াছে, তবে

ছিল। তবে বিজ্ঞানিহির গণিতদের অনুসন্ধান করা কর্তব্য যে, কিরূপে বাঙ্গালার
আরববল জীব দুর্লভ, কেবল বায়ু, গড়ার ও বন্যমহিষ প্রবল।

আরবদের দিগ্ভ্রমের কথা সকলেই জানেন; তবে তাহাদের প্রদেশেরক্ষা
যেমন প্রশংসনীয়, দিগ্ভ্রমর তেমন প্রশংসনীয় নহে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি যে
তিনদেশের মধ্যে একদে পুণ্ডরী কল্পিতা, এই তিনদেশই শত্রুসৈন্যভুক্ত পূরা-
কাথে গ্লিত হইয়াছিল; আরবস্থানের ভাগে তাহা বটে নাই—Arabia has been
celebrated from time immemorial as the seat of independence and
pastoral simplicity, and it is perhaps the only country in the world
which until it was lately overrun by the troops Mahomed Ali was
never profaned by foreign conquest. *Account of Arabia by David
Buchanan & William Platt.*

সেখানে অনেক বিল, যেখানকার নদীর
প্রোট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ও যেখানকার
অবপ্রণালী ভাল নহে, সেখানে কিছু
অধিক; আর যেখানকার ভূমি কঙ্করময়
বা বাথুকাময় ও শুষ্ক ও যেখানকার অল-
প্রণালী ভাল, সেখানে কিছু কম।

ভূতত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন যে, যদিও
সাধারণতঃ বরষার কার্যে ভূমির অব-
লম্বিত এবং অগ্নির কার্যে ভূমির উন্নতি
হয়, তথাপি যেখানে অগ্নির কার্য প্রতীয়-
মান হয় না, সেখানেও ভূমির উন্নতি
দেখা গিয়াছে। বথুনিয়া উপসাগরের
তট ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়াছে, তাহা
পল্লব বা অগ্নির কার্য নহে। যদি দ্বীপ-
প্রমাণ এই কারণে বথুনিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠ
হইতে অধিকতর উন্নত হয়, তবেই
দেশের মহাসমুদ্র হইবে। মনুস্মার

আমাদে অবিকল্প কতকাণ্য হইবার
বজ্রাবলী নাই। তবে জলনিঃসরণের
উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে, যেখানে
প্রোতবতী নদী আছে, তথাকার বিলের
অপা খান কাটিয়া নদীতে আনিষ্টে
পারিলে, এবং অন্য উপায়ে জল
আর্জিতার দ্বারা করিতে পারিলে কতক
দূর কার্য হয়।

ছগলী ডিনকুলীখ অলা হইতে খান
কাটির গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রজাবর্গের
উপকার করিয়াছেন, উক্তর বাঙ্গালার
রেলওয়ে দ্বারা তত উপকার হইতেছে
কি না মনেহ। যাকুবগের সুবিধা ও
বাণিজ্যের সুবিধা মঙ্গলময় বস্ত্র বটে;
কিন্তু আশ্চর্য নিকটে তাহা কিছুই
নহে।

দ্রাবশঃ

শ্রীতা, প্র, চ।

তর্কপ্রণালী।

(THE SUBJECTIVE AND THE
OBJECTIVE METHOD.)

দার্শনিক প্রবন্ধ দেখিলেই বঙ্গীয় পা-
ঠক তাহাতে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।
তিনি বলেন দর্শন চেকির কচকচি,
দর্শনপাঠে কিছুমাত্র লাভ নাই ইত্যাদি।
যদি দেখিতাম, যে বঙ্গীয় পাঠক দর্শনে
উপেক্ষা করিয়া বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি-
তে মনঃসংযোগ করিতেছেন, তাহা
হইলে তাহার এ উপেক্ষা সহ্য করিতে

পারিতাম। কিন্তু যিনি রামকান্তের
বিবাহ, শ্যামকান্তের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আমার
প্রবন্ধ পড়িয়া সমস্ত সময়ব্যয় করেন,
তাঁহার মুখে দর্শনের অসারতাসম্বন্ধে
কোন কথা সহ্য করিতে পারি না।
কলকাতা বঙ্গীয় পাঠক কিছুর দর্শনে
উপেক্ষা করেন, তারা আমরা জানি।
তাঁহার অভিনিবেশ অতি অল্প, তাঁহার

শরীর দুর্বল, মনও দুর্বল। যে সকল প্রাণকে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে প্রাণ, যে সকল প্রাণকে অজ্ঞানিত অজ্ঞান প্রাণের অস্তিত্ব পাঠ করিতে পারে না, তিনি যে সমস্ত পদ্ধতিতে নিহিত হইয়াছে। সুতরাং দর্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, নীতি প্রভৃতি যাহা কিছু চিন্তাবৃত্তির পরিচায়ক যে সমস্তই তাহার চক্ষুঃপথে।

প্রাণকে বেধানে যে প্রকারের বিবেচনা করাও যেখানে সেই প্রকারের হইয়া থাকে। ইংরেজপদ্ধতিতে গোষ্ঠ মটন ইত্যাদি বিজ্ঞান হয়, বাস্তবপদ্ধতিতে বিজ্ঞান হয়, কল, কলা, শাক, ফল ইত্যাদি। যে দেশে শাক্ত মেজাজের লোকের সেই প্রকারের হইয়া থাকেন। এই জন্যই বাস্তবপদ্ধতিতে মধ্যে মধ্যে অর্থশাস্ত্র নবোত্তম প্রাণকে অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সারগত তত্ত্বসমূহকে বহুবিধরূপে তাহার উপস্থাপিত করিতে পারেন একপ্রকার প্রতীতিশালী লোকের মধ্য। অতঃপর, তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে কি-ফিৎ কৌশলিক প্রয়োজনীয়। অতঃপর, যে আকিৎ প্রকটীকরণ করিতে হইবে তাহা নাই, ইহা আমায় বর্ণিতে

হইবে। হইবে না। ইহা হইবে না বিনয়। বহুবিধ পদ্ধতির উপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠককে কষ্টকর হইবে। অতঃপর হইবে।

তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য প্রাধান্য: দুইটি প্রণালী কল্পিত হইয়াছে। একটির নাম দার্শনিক বা ভাবমানিক প্রণালী, অন্যটির নাম বৈজ্ঞানিক বা প্রত্যক্ষপ্রণালী। এই দুইটি প্রণালী কি, এই দুইটির পৰস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ, ইত্যাদি যথেষ্ট কোনটী ঠিক, কোনটী ভুল প্রভৃতি প্রশ্নগুলির দ্বাৰা মাঝে মাঝে করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রথমে আমরা দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই প্রণালীদ্বয়ের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন একদিন চন্দ্রমণ্ডল হইতে দুইটি পুরুষ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহারা নানা বস্তু দেখিতে দেখিতে (পৃথিবীর সকল বস্তুই তাহাদের নিকট নূতন) এক স্বভিৎসবায় দো-কানে উপস্থিত হইলেন। যদি তাহাদের নিকট এক নূতন জবা। যদি এই দুই পুরুষের মধ্যে একজন দার্শনিক ও অন্যো বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করেন তাহা হইলে তাহারা কিরূপে তর্ক করিবেন, নিম্নে তাহা নির্ণয় হইতেছে।

- { Subjective method—আত্মমানিক প্রণালী
- or
- { Metaphysical method—দার্শনিক প্রণালী
- or
- { Objective method—প্রত্যক্ষ প্রণালী
- or
- { Scientific method—বৈজ্ঞানিক প্রণালী

দার্শনিকপ্রণালীর প্রয়োজ্য (যথাক্রমে আমরা ইহাকে বলিয়া উল্লেখ করিব) বলিবেন ঘড়িটি একপ্রকার জীব। উহার হৃদয়টি কাটা তাহার নিকট হইতে পানি হাত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ঘড়ির অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রটি তিনি উহার দ্ব্যর্থক বলিয়া মনে করিবেন। ঘড়ি হইতে যে অনবরত টুকটাক শব্দ নিঃসৃত হয় তাহাকে তিনি উহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ বলিয়া নির্দেশ করিবেন। মধো মধো যে ঘড়ির টুং টাং শব্দ হয় সেইটী তিনি ইহার ক্রন্দনধ্বনি বলিয়া মনে করিবেন। এইরূপে, জীব বলিলে আমাদের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, ঘড়িতে তাহাদের কতকগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি উহাকে এক জীব বলিয়া অভিহিত করিবেন।

কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিকপ্রণালীর প্রয়োজ্য (আমরা ইহাকে সংক্ষেপে বলিয়া জ্ঞাপিব) তিনি বলিবেন "ইহা জীব বলিয়াই অনুমান হইতেছে। কিন্তু শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাকা অবধারণ।" এই বলিয়া তিনি, আমরা যেকোন স্থানখানে জীবের শরীর স্পর্শ করি, সেইরূপে ঘড়ির শরীর স্পর্শ করিবেন। ইহাতে ঘড়ির কোন ইংসঙ্গতা না দেখিতে পাইয়া তিনি এরিতে হৃদয়ে প্রবর্তিবেন। পরে ইহা

সারথানে খুলিয়া উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কল, দড়ি ইত্যাদি সমস্ত তর তর করিয়া দেখিবেন। এই সমস্ত দেখিয়া ভুলিয়া তাহার বোধ হইবে যে ঘড়ি জীব নহে। উহা একপ্রকার কলমাত্র।

ম এবে এই উভয়ের মধ্যে কাহার মীমাংসা নির্ভুল? আমরা সকলেই জানি ঘড়ি একপ্রকার কল। সুতরাং এখানে প্রয়োজ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। কিন্তু অনেক স্থলে এটরূপ মীমাংসা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। দুঃস্থস্বরূপ আমরানিজে একটা উদাহরণ বিবৃত করিতেছি।

পায় ৩৭ বৎসর পূর্বে কলিকাতার প্লাকেট লইয়া বড় ধুমধাম হইয়াছিল। অনেকে বিশ্বাস করিতেন, এবং এখনও করেন, যে প্লাকেট ভূতের কাণ্ড। প্লাকেটে ভূত ভবিষ্যৎ জানা যায়। কাহার প্রণিতামহের নাম কি, কাহার অতিবুদ্ধ প্রণিতামহ কোন সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন প্রভৃতি প্রশ্ন প্লাকেটকে জিজ্ঞাসা করা হইত। কালেরের জাহ হইতে নিবন্ধর চামা পর্যন্ত সকলেই প্লাকেটকে আপন আপন জবিষ্যতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন। এই সকল ব্যক্তির দার্শনিক প্রণালীমতে তর্ক করিতেন। ভূত জবিষ্যতের কথা জানিতে পারা মনুষ্যের সাধ্যাত্তম নহে। প্লাকেট তাহা জানিতে

† একজন চামা ঘড়ির মধো একপ্রকার কীটের অবস্থিতি আশঙ্ক্য করিয়া, ঘড়িটি মুচুতাইয়া জোড়িয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতেও কীটের শব্দ শামিল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পথদ্বারেতে ইহা চুইয়া দিয়া ফেলেন।

পারিতোষে, অতীত প্রাক্টে ভূত বলিয়া
গহকৈই অল্প মত হইত।

কিন্তু বাহ্যিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনু-
শ্রবণ করিয়া তর্ক করিতেন, তাহারা
বাহ্যিক বলুন না কেন, প্রাক্টেই অল্প
প্রত্যক্ষ বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ না ক-
রিয়া তাহারা কোনরূপ নীমাংসা করি-
তেন না। তাহারা দেখিতেন, যে
প্রাক্টে এইরূপে নিশ্চিত যে ইহার উপর
অল্প চাপ পড়িলেই ইহার চাপা ঘূর্ণিত
ধাকে। তখন বাহ্যিক প্রাক্টে ধরিয়া
ধাকেন, তাহাদের মনের ভাব সমস্ত
তাঁহাদের অজ্ঞাতে উহা হইতে বাহির
হইয়া পাবে। ব্রাহ্ম প্রাক্টে ধরিলে
ব্রাহ্মধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম বলিয়া লেখা
বাহির হয়। আবার হিন্দুতে প্রাক্টে
ধরিলে হিন্দুধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম বলিয়া
লেখা বাহির হয়। আবার নিরক্ষর
বাসি প্রাক্টে ধরিলে কোন প্রকারের
লেখাই বাহির হয় না। এই সকল
দেখিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োজ্যতা
সীমাংসা করেন, যে প্রাক্টেই নিশ্চয়-
কৌশল আছে বটে, কিন্তু ইহা ভূত নহে।

এখানে গ ও ব ইহাদের মধ্যে কাহার
সীমাংসা নির্ভুল ঠিক করিয়া বলা যায়
না। অতএব এ বিষয়ে সাধারণের
ঐকমত্য নাই। অনেক ভূতবিদ্যাবাস্তি
আদিও প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন।

সে বাহ্যিক হউক, এক্ষণে বোধ হয়
ভুক্তিতে পারা যাইবে যে, বৈজ্ঞানিক ও

দার্শনিক প্রণালীতে প্রত্যেক কি। দার্শ-
নিক প্রণালীতে কোন এক বস্তু দেখিয়া
তদ্বিবরে অনুমান করিয়া লইয়া হয়,
যাহাতে সেই অনুমানটী সম্পূর্ণরূপে
হয়, তদ্বিবরে চেষ্টা করা হয়, কিন্তু
অনুমানটী অনুমানের বস্তুর সহিত মিলিল
কি না তদ্বিবরে কোন অনুমান করা
হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
বস্তু দেখিয়া যে অনুমানটি করা হয়,
সেইটির সহিত বস্তুটি সম্পূর্ণরূপে মিলিল
কি না, তাহা দেখা নিত্য প্রয়োজনীয়।
যদি অনুমানটি বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে
না মিলে, তাহা হইলে ঐ অনুমানটি
হাড়িয়া দিয়া অন্য একটি অনুমান প্রস্তত
করা হয়। এইরূপে বস্তুখন না অনু-
মানটি বস্তুর সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলে
ততক্ষণ কোনরূপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত
হয় না।

কোন এক বস্তু দেখিয়া তদ্বিবরে
অনুমান করা সহ্যমোর স্বভাববিশিষ্ট ধর্ম।
দার্শনিক প্রণালী এই অনুমানটী পরীক্ষা
বাহ্যিক ফলত হয়েন, তিনি ঐ অনু-
মানের অঙ্গপারিপাটী সম্পাদন করেন।
তিনি কখনই অনুমানের বাহ্যিক মান
না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুমান-
টীকে বস্তুর সহিত বিশেষরূপে মিলাইয়া
দেখেন। পণ্ডিতের আশঙ্কায় প্রকাশ
করিলে, এই প্রণালীকে দুইটি নিয়-
মিতরূপে সজ্জিত করা যাইতে পারে।

দার্শনিক প্রণালী = বস্তুর দর্শন + অনু-
মান

বৈজ্ঞানিকপ্রণালী = বস্তুর দর্শন + অন্বেষণ + বস্তুর সহিত অন্বেষণ মিলিত কি না তাবিষয়ক পরীক্ষণ।

পৃথিবীর আদিকাল হইতে মানুষ অন্বেষণের প্রতি নির্ভর করিয়া আসিতেছে। কি অসত্য অবস্থায়, কি সত্য অবস্থায় সকল সময়েই মানুষ সকল কার্যেই অন্বেষণের আগ্রহ লইয়া আসিতেছে। যখন মানুষ অতি অসত্য ছিল তখন পৃথিবীতে কর্মক্ষমতার অধিকতর প্রয়োজন ছিল। চতুর্দিকে প্রকাণ্ড-শরীর, বিপুলতেজস্ক, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর সহিত অন্বেষণ বৃদ্ধ করিতে হইতেছে। পৃথিবীর অভাবের, পর্বত-শৃঙ্খলায়, বৃক্ষকোটে আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে হইতেছে। প্রতিদিন প্রতিদিনে আহ্বারের সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিতে হইতেছে। যখন জীবিতচেষ্টা (struggle for existence) এত প্রবল, তখন অন্বেষণ অতি অগরিপকরূপ হইত। মেঘ ডাকে কেন, মেঘের মধ্যে এক হাতী আছে সেই হুকুর করিতেছে। গুল জটে কেন, বনে এক বনদেবী আছেন, তিনি সমস্ত কলিকাতাকে প্রভুত্ব করিয়া দেন। মানুষের বিপদ হয় কেন, এক দেবতা আছেন, তিনি এই সকল বিপদে মানুষকে ফেলিয়া থাকেন; এইরূপে সকল প্রশ্নের সমস্তা এক এক কথায় পাওয়া যাইত। যে সকল প্রশ্নের অন্বেষণ থাকা করিতে এক এক মহাপণ্ডিতের সমস্ত জীবন

ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে, তখন এক কথায় সে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইত। অমুক জিনিস কেন ওরূপ হইল; একজন দেবতা উহা ওরূপ করিয়া দিয়াছেন।

যখন মানুষের জীবিতচেষ্টা কিছু কমিল, যখন বলাচক্ৰ সমস্ত মানুষের বশবর্তী হইল; যখন অসত্য অবস্থার অনিশ্চিত জীবনের পরিবর্তে মানুষের জীবন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিততর হইল, তখন অন্বেষণের প্রকৃতিবত্ত পরিবর্ত হইল। পূর্বে এক এক কথায় সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইত। এখনও তাহাই হইতে লাগিল; কিন্তু এখন অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে অল্পে অল্পে প্রশ্নের যোগ দেখা যাইতে লাগিল। এই সকল প্রশ্ন অনেক সময়ে অতি বিচিত্র প্রশ্নালী হইত। একজন দার্শনিক বলিলেন, সংখ্যাই সমস্ত বস্তুর আদিকারণ, সকল বস্তুই হয় এক বা তদন্বিত সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। কেহ বলিলেন, অগ্নিই সমস্ত বস্তুর আদি, কেন না অগ্নির নিজের দাহিকাশক্তি আছে। এইরূপে বাদার যে ইচ্ছা হইত, সে সেইরূপ প্রশ্ন প্রয়োগ করিত। ইচ্ছাতে এই ফল হইল, যে ক্রমে অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন প্রয়োগ আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

“অন্ধকারে ডেলা ফেলার” মত এই সকল প্রশ্নের মধ্যে কোন কোনটা কখনও সত্য হইয়া গড়িত। কিন্তু

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার ও
অমৌক্তিক হইল। এইরূপে অনেক
দিন কাটিয়া গেল; যেমন পৃথ পৃথিকার
না থাকিলে, নগরের মধ্যে প্রবেশ
করিতে পারা যায় না, ঠিকপথে গে-
লেও তাহা ঠিকপথে বলিয়া বোধ হয়
না, সেইরূপ তর্কপ্রণালী অবিকৃত
আকারে তত্ত্বনির্ণয় সুদূরপরাহত হইয়া
পড়িল।

এই সময়ের মধ্যে কত প্রকারের কত
কত যে আবিষ্কৃত হইল তাহা কে বর্ণনা
করিতে পারে। যেমন বর্ষাকালে প্রাদ-
্যোপরি একটির পর আর একটি বৃদ্ধদ
উদ্ভিত হয়, প্রত্যেক বৃদ্ধদটি ইহার পূর্ব
বৃদ্ধদ অপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল, কিন্তু
সকলগুলিই কিয়ৎকালের মধ্যে জল-
গাশির সহিত মিশিয়া যায়, সেইরূপ
একজন দার্শনিকের পর অন্য দার্শনিক
আবিষ্কৃত হইতে লাগিলেন। আজি
ব্রাউন সমস্ত জগৎকে স্বীয় মতে আন-
য়ন করিবার জন্য পূর্ব পূর্ব সমস্ত
দর্শনের ভ্রম প্রতিপন্ন করিলেন। কালি-
হার্মিণ্টন আসিয়া বলিলেন, ব্রাউন বাহ্য
কিছু বলিয়াছেন সমস্তই ভ্রান্ত। পরশ-
মিন আসিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, হার্মি-
ণ্টনের সমস্ত কথাই ভ্রান্ত। এইরূপে
বৎসরে বৎসরে মাগে মাসে নূতন নূতন
দর্শন বাহির হইতে লাগিল। জন্মকালে
সকল দর্শনই সম্প্রশ্রেষ্ট বলিয়া বোধ
হইত। কিন্তু কিছুদিন পরেই আর এক
জন দার্শনিক আসিয়া প্রমাণ করিয়া

দিতেন, যে পূর্বের দর্শন সম্পূর্ণ ভ্রম-
মূলক। সুতরাং সহজেই লোকের মনে
বিশ্বাস হইত যে দর্শন অপ্রায়োজ্যনীয়া।
বাহ্যতে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হয়
না, তাহাতে লোকে কেন আদর ক-
রিলে?

মহুয়া যতই সভ্যতার সোপানে আ-
রুঢ় হইতে লাগিল, ততই তাহাদের
চিন্তাপ্রণালী পরিবর্তিত ও পরিভ্রম-
হইতে লাগিল। তখন আর যে যে
প্রমাণ মনুষ্যের গ্রাহ হইত না। পূর্বের
প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিলেই তাহা
অতি আদরের সহিত গৃহীত হইত।
কিন্তু এক্ষণে প্রমাণের দোষ স্বয়ং বিবে-
চিত হইতে লাগিল। কোন প্রমাণটি
ভাল, কোন ভাল, অন্য অন্য প্রমাণের
দোষ কি প্রভৃতি প্রশ্ন উদ্ভিত হইতে
লাগিল। পরে যখন মৃত্যাবলী আবিষ্কৃত
হইল, যখন বিদ্যাশিক্ষা শুদ্ধ জনকতক
লোকের মধ্যে শুল্লভ হইয়া রহিল
না, যখন আপাদর সাধারণেই বিদ্যার
রনাস্বাদ ও আলোচনা করিবার অধিকার
প্রাপ্ত হইল, তখন প্রমাণ প্রয়োগের
প্রণালীও উন্নততর হইতে লাগিল।
এই সময়ে ইংলণ্ডে বেকন ও ক্যাম্বো-
ডেকার্ট (Des Cartes) জগৎগ্রহণ করি-
লেন।

ডেকার্ট প্রমাণের আবশ্যকতা বুঝি-
লেন। তাহার নিকটে সকল বস্তুই
প্রমাণের আবশ্যকতা আছে ইহা প্রতীয়-
মান হইল। জগদীশ্বর আছেন, মন

আছে, আমি আছি প্রভৃতি যে সকল প্রেমের তুমি আমি কোনই প্রমাণ দেখিতে পাই না, ডেকার্ট সেইগুলি নিরনন্ড, রেখাগণিতের প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করিয়া দিলেন। ডেকার্টের জগদীশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রমাণটি নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

জগদীশ্বর আছেন।

কারণ—জগদীশ্বরসম্বন্ধে যে ভাবটি আমাদের মনে আছে, সেইটি জগদীশ্বরই তথ্য সেই প্রকারে রাখিয়াছেন।

যদি বল—ঐ ভাবটি আমি নিজেই আমার মনে রাখিয়াছি, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া উহা বিনষ্ট করিতে পারি না কেন? যে ভাবটি আমি নিজে প্রস্তুত করিতে পারি সেই ভাবটি আমি নিজেই বিনষ্টও করিতে পারি।

সুতরাং—প্রমাণ হইল যে জগদীশ্বরের ভাবটি জগদীশ্বরই আমাদের মনে রাখিয়াছেন। কারণ পূর্বে প্রমাণ করা হইল, যে ঐ ভাবটি নিজে প্রস্তুত করি নাই।

সুতরাং—জগদীশ্বর আছেন।

এইরূপ প্রমাণ ঠিক হইল কি না আমরা যে বিষয়ের চর্চা করিতেছি না। আমরা শুদ্ধ দেখাইতেছি যে, ডেকার্ট প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অতিসুন্দররূপে অবদান করাইয়াছেন। পূর্বে জগদীশ্বর আছেন বলিলেই পর্যাপ্ত হইয়া বাইত; কিন্তু এক্ষণে আর তাহা হইত না। এক্ষণে রেখাগণিতের ন্যায় প্রমাণপ্রয়োগ হইতে আরম্ভ হইল। প্রমাণ আবৃদ্ধ

হইতে আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু মনই প্রমাণের সভ্যসভাতার বিষয়ে একমাত্র বিচারকর্তা রহিল। নক্ষত্রসকল বুভাকারে ঘুরিয়া থাকে। কেন? আমরা মনে মনে জানিতে পারি যে বুভাই সম্পূর্ণ ক্ষেত্র। মন আরও বলে, যে জগদীশ্বরের কোন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং নক্ষত্র বুভাকারে ঘুরিয়া থাকে।

এইরূপে ডেকার্ট অন্য অন্য অনেক বিষয় প্রমাণ করিলেন। আমি আছি, কারণ আমার মন বলে যে যাহা কিছু চিন্তা করিতে পারে তাহাই আছে; আমি চিন্তা করিতে পারি, সুতরাং আমি আছি। প্রেমের যাহাই হউক না কেন, বাহ্যজগতের কথাই হউক বা অন্তর্জগতের কথাই হউক সকলস্থলেই মন একমাত্র বিচারকর্তা। যে প্রশ্নই উত্থিত হউক না কেন, মন তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া স্থির করিয়া দিবে। ফ্রাঙ্কো ডেকার্ট এই মত প্রচার করিলেন। তাহার পর ইউরোপের অন্য অন্য দেশে তাহার এই মত প্রচলিত হইতে লাগিল। ডেকার্ট, ম্যালব্রান্স, স্পিনোজা, লাম্বের-নিজ্জ, কিরী, ক্যার্ট, সেলিং, হোগেন প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতেরা ডেকার্টের এই মত সম্প্রসারণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পূর্বে জর্মানিতে এই মত অতি প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল; এক্ষণে ইহা ফ্রান্সে অত্যন্ত আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে। এই মতের প্রণালীকে

আমরা দার্শনিক প্রণালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

যখন ডেকার্ট ফ্রান্সে পূর্বমত প্রচার করেন, তখন বেকন (Bacon) ইংলণ্ডে সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বেকন বলিলেন মনের বিচার কোন কাজের নয়। বস্তু দেখিয়া শুদ্ধ মনে মনে বিচার করিলে বস্তুর তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারা যায় না। তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য বস্তুটি বিশেষরূপে পর্যালোচনা করা আবশ্যিক। বস্তুটি স্বচ্ছ দেখিয়া, উহার সহিত ঐ প্রকারের অন্য পাঁচটি বস্তু মিলাইয়া তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইবে। যখন তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে, তখন আবার উহার সহিত, বস্তুর সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তত্ত্বনির্ণয়কালে মাথা বাহা স্থির হয়, যদি বস্তুতে ঠিক সেই-গুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তবেই তত্ত্বের উপর নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যাইবে। মনে করুন, যেন স্থির করিতে হইবে যে ম্যালেরিয়ার কারণ কি? বেকন উপদেশ দিবেন, যে, যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া হইয়াছে সেখানকার প্রধান খাদ্যসম্বন্ধে, জলনালী-সম্বন্ধে, বৃক্ষসমূহের অবস্থানসম্বন্ধে, গ্রহনিখাণের কোশলসম্বন্ধে প্রভৃতি নানা-বিধ বিষয়সম্বন্ধে সবিশেষ অন্বেষণ করিতে হইবে। এই অন্বেষণের পর পরীক্ষা বিশেষ বিশেষ বিষয় সকল ম্যালেরিয়াপ্রাদুর্ভিত দেশেই বিদ্যমান,

সেই কারণের সহিত জরের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে ঐ সকল বিষয়সম্বন্ধে ম্যালেরিয়া হয় নাই এমন কোন দেশ আছে কি না। এই রূপ নানাবিধ অন্বেষণের পর জানিতে পারা যাইবে ম্যালেরিয়ার প্রকৃত কারণ কি। ডেকার্ট হইলো হয় ত মিথ্যা করিয়া দিতেন যে, যে দেশে পাপীর সংখ্যা অধিক, সেই দেশেই ম্যালেরিয়া হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জগদীশ্বরের জ্ঞানের পরিচায়ক। যে দেশে পাপী অধিক, সেই দেশেই ম্যালেরিয়া দ্বারা জগদীশ্বর পাপীদের দণ্ডবিধান করেন। বেকন যে প্রণালীটি প্রচলিত করিলেন, হবস্, লক্, হিউম্, মিল্, কমট্, স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সেই মতের সম্মতস্বরূপ করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাই এই প্রণালীর অনুসরণ করেন।

যতদিন দার্শনিকপ্রণালী প্রচলিত ছিল, ততদিন লোকে আপনার কথতা বুঝিতে পারিত না। তাহার সকল তত্ত্বই আপনাদের আদর্শ বলিয়া মনে করিত। পৃথিবী আদিতে কি ছিল, শেষেই বা কি হইবে, পরকাল কি প্রকার, পাপ-পুণ্যের বিচার কি প্রকার, পরমেশ্বর কি প্রকার, তাহার শাসনপ্রণালী কিরূপ প্রভৃতি সকল তত্ত্বই মানুষের দ্বারা নির্ণীত হইত। মানুষের কল্পনার গতি অপ্রতি-হত। "উচ্চে, নীচে, গভীরে, অথবা,

ভূমিগর্ভে, আকাশে" সর্বত্রই কল্পনার নিকট অগম্য। এবং যেখানে কল্পনা বাস্তবে পারে, মনুষ্য সেইখানেই বাস্তবতা তথাকার তত্ত্বনির্ণয় করিতে সমর্থ। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, যে দার্শনিক প্রণালীতে মনই একমাত্র বিচারকর্তা। যেখানে মন বিচারক সেখানে সকল বিষয়ের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। কারণ মনের উপর কাহারও আধীন্য নাই। মন যাহা বলিয়া দিলেন, তাহাই নিরোধাধী করিতে হইবে। মন যাহা স্থির করিয়া দিলেন তাহাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন মনের আর ওরূপ অগম্যতা রহিল না। মনের মীমাংসা কার্যের সহিত, ঘটনার ন্যস্ত মিলাইয়া দেখিতে হইল। সুতরাং পূর্বে যে সকল বিষয় মানববুদ্ধির অগম্য ছিল বলিয়া বোধ হইত, এফণে তাহাদের অনেকগুলি মানববুদ্ধির অগম্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পরমেত্ব কি, পরকাল কি, সেখানে গাণপত্যের বিচার কিরূপ প্রভৃতি প্রশ্ন একেবারেই মানবের অসম্বন্ধ বিষয় হইতে দূরীকৃত করা হইল। যাহা কখন কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় নাই বা হইতে পারে না, এমন বিষয়সমস্তের উপর মনুষ্য আপনাকে নিরোদ্ধিত করিতে চাহিল না। এই সকল কারণে বেকনের পর হইতে বিজ্ঞানচর্চা বহুসরূপে প্রচলিত হইতে

লাগিল। অন্য অন্য শাস্ত্রেরও লিখন প্রণালী একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। দর্শন হইতে অবিজ্ঞের বস্তুগত লের মীমাংসা একেবারে উঠিয়া গেল। ইতিহাস ভিন্নপ্রণালীতে লিখিত হইতে আরম্ভ হইতে লাগিল। অর্থশাস্ত্র, সমাজ-শাস্ত্র প্রভৃতি করেকটি নূতন অথচ অভাবশ্যক শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। নীতি-সম্বন্ধীয় প্রশ্নগণ নূতন প্রকারে আলোচিত হইতে লাগিল। মনুষ্য অবিজ্ঞের বস্তু পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জ্ঞেয় বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগ করিতে লাগিল।

বাহ্যজগতের পদার্থসমূহসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করা সহজ। ঘেঁটুপাতা সর্পদংশনের ঔষধ কি না জানিতে হইলে আমরা জন্তকে সর্পদষ্ট করাইয়া তাহাকে ঘেঁটুপাতা সেরন করাইতে পারি। চন্দ্ৰের সহিত জোয়ার ভাঁটার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানিবার আশু পূর্ণিমার দিন নদী বা সমুদ্রের জলবৃত্তির পরিমাণ স্থির করিতে পারি। কিন্তু অন্তর্জগতে কিরূপে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা বুঝিতে পারা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অন্তর্জগতের কোন ঘটনাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেখানে কিরূপে বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রয়োগ করা যাইতে পারে? আমরা এতৎসম্বন্ধে দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

যেমন বাহ্যজগতের সকলবস্তুরই

বিজ্ঞানের দ্বারা সীমাহীন হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতের সকল প্রাণই দর্শনশাস্ত্র দ্বারা সীমাবদ্ধিত হইয়া থাকে। মন কি পদার্থ? ইহা দর্শনশাস্ত্রের প্রথম প্রশ্ন। যত দিন দার্শনিক প্রণালী প্রচলিত ছিল, ততদিন লোকে বলিত, মন একপ্রকার অদৃশ্য বস্তু। জীবাশ্মা, পরমাশ্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি পদার্থ যেসকল উপাদানে নিম্নিত, লোকে মনকেও সেই সেই উপাদানে নিম্নিত বলিয়া বোধ করিত। তখন মনের সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রশ্ন উত্থাপিত হইত। কেহ বলিতেন মন মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত, কেহ বলিতেন মন জংকোমে অবস্থিত, কেহ বলিতেন মন শরীরের সর্ব্ব অংশেই আছে, কেহ বলিতেন, মন শরীরের প্রত্যেক অংশে অবস্থিত ইত্যাদি। পুঙ্খলভঃ মন যে শরীর হইতে এক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহাতে সকলেই বিশ্বাস করিতেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলিত হইল তখন আর পূর্ব্বোক্ত প্রাণসমূহের স্থান ছিল না। সরুবা মনকে এক স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে স্বীকৃত হইল না। মনের নত কোন পদার্থই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং স্থিরীকৃত হইল যে মন মস্তিষ্কের জিরা মাত্র। এই জিরাগুলি শারীরিক অত্যন্ত জিরা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু যেমন খাসপ্রক্ষেপ, রক্তমণ্ডলন প্রভৃতি শারীরিক জিরা ইঞ্জিরবিশেষের জিরা তদ্বৎ অন্য কিছুই নহে, মনও সেইরূপ শারীরিক জিরাবিশেষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।

কি কি উপায়ে আমাদের জ্ঞানলাভ হয় ইহাও দর্শনশাস্ত্রের এক অতি নিগূঢ় প্রশ্ন। সকলেই স্বীকার করেন, যে আমরা ইঞ্জিরহইতে আমাদের জ্ঞানের উপাদান প্রাপ্ত হই। যতদিন দার্শনিক প্রথা প্রবল ছিল, ততদিন ইঞ্জিরজ্ঞান ভিন্ন আর একপ্রকার জ্ঞানে সমুদায় বিশ্বাস করিত। তাহার বলিত যে মনের এক স্বাভাবিক জ্ঞানপ্রদায়িনী শক্তি আছে। আমাদের ইঞ্জিরজ্ঞান, সকল বিষয়ের সমস্যা স্থির করিতে পারে না। সমস্যা কি, স্থান কি, দৈর্ঘ্য কি, আশ্রয় কি, প্রভৃতি কতকগুলি প্রশ্ন আছে বাহ্যতে ইঞ্জিরজ্ঞান কোনরূপ প্রয়োগ করা যায় না। ঐ সকল প্রশ্নের নিষ্কারণ কালে আমরা মনের স্বাভাবিকী শক্তির নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর মনের পূর্ব্বরূপ শক্তির প্রতি সমুদায়ের আস্থা রহিল না। তখন স্থিরীকৃত হইল, যে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানই ইঞ্জিরজ্ঞান।

নীতিসম্বন্ধেও একরূপ মতের পরিবর্তন দৃষ্ট হইবে। যখন দার্শনিক প্রণালী প্রবল ছিল, তখন লোকে বিশ্বাস করিত যে ভগদীশ্বর আমাদের মনে আমাদের জগৎকাল হইতেই হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। কোন

ক'দ দেখিবামাত্রই, উহা হিত কি অহিত, আমরা ঐ ক্ষমতাবলে বলিয়া দিতে পারি।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রচলিত হইল, তখন আর পূর্বের মত দৈবদত্ত ক্ষমতায় লোকের* বিশ্বাস রহিল না। তখন হিতাহিত বিবেচনার সম্বন্ধে অন্য অন্য কারণ নির্দিষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে এক্ষণে ইউরোপের অধিকাংশ

স্থলে সকল শাস্ত্রেই বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রযুক্ত হইতেছে। ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী বহুলপরিমাণে সন্নিবেশিত হইতেছে। আমরা সকল বিষয়েই ইউরোপের অনুকরণ করিয়া থাকি। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকপ্রণালী কখন অনুকরণ করিতে শিখিব কি ?



খাজনা কেন দিই ?

বহুকালাবধি লোকে খাজনা দিয়া আসিতেছে। শতপুরুষ ধরিয়া লোকের সংস্কার এই যে জমী লইলেই খাজনা দিতে হয়। বাণ্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি যে খাজনা ছাড়া জমী পাওয়া যায় না। ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর আদি যে সকল জমীর খাজনা দিতে হয় না তাহা আগে মালের জমী ছিল, কোন ভূম্যধিকারী দয়া করিয়া তাহার খাজনা দেওয়া রহিত করিয়া দিয়াছেন, অথবা খাজনা লন না এই পর্য্যন্ত। খাজনা লওয়াটাই নিয়ম, না লওয়াটা নিয়ম-বহির্ভূত। এইরূপ অনেক পুরুষ ধরিয়া দেখিয়া আসাতে সংস্কার একরূপ দাঁড়াই-

যাছে, যে খাজনা লওয়া যেন প্রাকৃতিক নিয়ম। যেমন এক বস্তু আর এক বস্তুকে আকর্ষণ করে এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, জমী লইলেই খাজনা দেওয়াও সেইরূপ। যখন খাজনা দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, তখন খাজনা কেন দিই, এরূপ প্রশ্ন লোকের মনে উদয় না হওয়াই সম্ভব। জমী লইব, যাহার জমী তাহাকে খাজনা দিব, ইহাতে আবার কেন কি? যেমন টাকা লইলেই সুদ দিতে হয়, বাড়ী লইলে ভাড়া দিতে হয়, জমী লইলেও সেইরূপ খাজনা দিতে হয়। এব আবার কারণ জিজ্ঞাসা কেন?

* বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথার সময় আমরা “লোকের” এই কথাটি “অধিকাংশ লোকের” স্থলের ব্যবহার করিয়াছি। দার্শনিক প্রণালীতে বিশ্বাস কতেন, এখনও একরূপ লোক অনেক আছেন।

কারণ জিজ্ঞাসা করার হেতু আছে।
তুমি টাকা পোষণাব করিয়াছ, টাকা
তোমার। তোমার টাকা আমি লইতে
গেলে তোমার কিছু লাভ না থাকিলে
তুমি দিবে কেন? তোমার বাড়ী তোমার
নিজস্বত্বে প্রস্তুত, নিজে তাহার জন্য
কত টাকা খরচ করিয়াছ, আমি তাহা
ব্যবহার করিব, তোমার নিজের লাভ না
থাকিলে তুমি দিবে কেন? তুমি বলিবে
আমার জমী আমি তোমাকে দিব আমার
লাভ না থাকিলে দিব কেন? কিন্তু কথা
এই তোমার জমী হইল কিরূপে। তুমি
বলিবে আমি কিনিয়াছি। কিন্তু জমী
কার যে তুমি কিনিবে। তোমার জিনিস
তুমি ইচ্ছামত নষ্ট করিতে পার, তোমার
বাড়ী তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পার, তো-
মার টাকা তুমি সমুদ্রে অগাধ হলে
ফেলিয়া দিতে পার, তোমার অন্ন তুমি
লাখুলের দিকে বলিদান দিতে পার,
কিন্তু তোমার জমী তুমি নষ্ট করিতে পার
না। বাস্তবিকও তুমি জমী কেন নাই,
তুমি কিনিয়াছ জমীব্যবহারের স্বত্ব।
কিন্তু এই কথাটি বুঝিতে গেলে তাহার
পূর্বে অনেক কথা বলা চাই। অনেক
জন প্রশ্নের মীমাংসা চাহি। আমরা
খাঙ্গি এই প্রশ্নের চারিটি প্রশ্নের উত্তর
দিতে চেষ্টা করিব।

(১) জমী কার?

(২) কিরূপে জমীর উপর লোকের
স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে?

(৩) খাজনা কেন দিতে হয়?

(৪) খাজনা কত হওয়া উচিত?
তাহার পর প্রসঙ্গক্রমে

(৫) স্বত্ব হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা
অধিক বা অল্প হয় কেন? এ প্রশ্নেরও
মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

২। জমী কার?

আমরা যে গ্রহের পৃষ্ঠদেশে বাস করি
তাহার পরিধি ১১০০০ ক্রোশ ও ব্যাস
প্রায় ৩৫০০ ক্রোশ। এই ভূপৃষ্ঠের দুই
ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। স্থলভাগের
কোণাও মরুভূমি, কোণাও পর্বত, কো-
থাও বন, কোথাও জল। অবশিষ্ট উর্বর
ভূমি এই উর্বরভূমিখণ্ড হইতে আমা-
দের প্রাণধারণোপযোগী পদার্থের উৎ-
পত্তি হয়। যে কেহ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ
করিয়াছে তাহারই জীবনধারণ প্রয়ো-
জন সূতরাং জীবনধারণোপযোগী পদার্থ
যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহাতে সকলেরই
সমান অধিকার। জীবন বলিতে যে
শুদ্ধ মনুষ্যেরই জীবন বঝাইবে এমন
কোন লেখা পড়া নাই। যাহার প্রাণ
আছে তাহারই প্রাণধারণ করিতে হয়
তাহারই পৃথিবীর জমীতে অধিকার।
পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, কীটাদি
প্রভৃতি সকলের পৃথিবীর জমীতে যে
অধিকার, আমার তোমার ও মহারাজা
গোপাল নগরেরও সেই অধিকার। প্রাণ-
ধারণোপযোগী পদার্থ তই পৃথিবী হইতে
উৎপন্ন হইবে। প্রাণও সকলকে ধারণ
করিতে হইবে, অতএব একজনকে ভূমি

শব্দ হইতে বঞ্চিত করাও যাহা তাহাকে
মরিতে বলাও ঠিক তাই।

ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগের জন্য
যেমন আকাশ হইতে নানা বর্ষণ করি-
রাছিলেন, এখন আর তাহা করেন
না, এখন আমরাগকে নিম্নপরিশ্রমে
স্বহস্তে এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে
আমাদের আহারসংগ্রহ করিতে হয়।
জমী ভিন্ন আমাদের চলে না, অতএব
জমী কাহারও নহে, উহাতে প্রাণী হই-
লেই স্বয়ং জন্মে।

এই সাধারণনিয়মের অনেক ব্যত্যয়
দৃষ্ট হয়। অনেক হিংস্রজন্তু অপর জন্তুর
মাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করে।
অনেক মদুযাও অর্ধেক উদ্ভিজ্জ ও
অর্ধেক প্রাণিজ আহারে দেহপুষ্টি ক-
রেন। অনেক জাতি আছে তাহাদের
মৎস্যই প্রধান আহার। মৎস্যের সঙ্গে
জমীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। এ
সকল বিষয়ের তর্ক তুলিতে গেলে পুঁথি
বাড়িয়া যায়। তবে এই পর্য্যন্ত বলা
যায় যে, পশুআহার বাহারা করেন,
তাঁহারা অন্যায় করেন; তাঁহারা যে
আর একজনের বসনাশ করেন, শুদ্ধ
তাহাই নহে; তাহাদের জীবন পর্য্যন্ত
নাশ করেন। তাঁহাদের মত যাহাই হউক,
তাঁহারা যে জন্তুর মাংস ভক্ষণ করেন,
সেও ত এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে
আপনার দেহপোষক দ্রব্য সংগ্রহ করে।
তবে ফলে একই দাঁড়াইল। মাংসা-
স্বহস্তে না হইয়া পরম্পরাস্বহস্তে মাং-

সাশীরাও এই পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে
আহার্য্য সংগ্রহ করেন সুতরাং অধীতে
তাঁহারাও প্রয়োজন। এখন আঁছের
কথা। যাহারা মাছ খাইয়া বাচে তাঁহারা
ত জমীর ধার ধারে না, কিন্তু জমীতে
যেমন জলেও তেমনি সকলেরই সমান
স্বয়ং। জমীরও যে জন্য খাজনা দিতে
হয়, মৎস্যক্ষেত্রসমূহেও সেই প্রকার
খাজনা দিতে হয়। সেই কারণে ও সেই
পরিমাণে। প্রাচীনদেশসমূহেও এই নিয়ম
ছিল যে জমী স্ববার, একজনের নহে।
ইহুদীদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, ৪০
বৎসর অন্তর তাহাদের সমস্ত জমী অধি-
বাসীদিগকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত।
সকলে সমান ভাগ পাইত কি না বলিতে
পারা বার না; কিন্তু ভাগ হইত নিশ্চয়।
উহাদের সংস্কার ছিল যে, কানানদেশ
ঈশ্বর ইজ্রেলের বংশকে স্বত্বভাগ্য করিয়া
দান করিয়াছেন সুতরাং যে কেহ ইজ্র-
লের বংশ, কানানের জমীতে তাহার
অংশ আছে। প্রাচীন রোমে রোমের
অধিবাসী প্রেট্রিসিয়ানরা জমীর ভাগ
পাইতেন, কারণ প্রথম অবস্থায় তাঁহা-
রাই রোমের অধিবাসী ছিলেন। ক্রতাহার
পর প্রিবিয়ানেরা বখন রোমের অধিবাসী
বলিয়া গণ্য হইল, তখন তাহারাও
জমীর ভাগ পাইতে লাগিল। প্রাচীন
জার্মানির সমস্ত জমী folkland অথবা
জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হ-
ইত। রাজা জাতির কর্তা সুতরাং তিনি
জাতীয় জমিরও কর্তা। জাতীয় জমির

সকলোদেশের ভার রাজ্য ও মহাসভার উপর স্থাপিত। আমাদের নিজদেশে রাজ্য সমস্ত দেশের কর্তা জমী তাহার, অর্থাৎ প্রজারা তাহার নিকট হইতে জমী লইবে, কেবল উৎপন্নের চরকাগের এক ভাগ তাহাকে দিতে হইবে। এ নিয়ম অতি প্রচুর, ইহাতে রাজস্ব জমী হইতেই আদায় হইত, প্রত্যক্ষ কর-বসানর প্রয়োজন হইত না। জমী কাছে প্রজাসাধারণেরই ছিল; প্রজাসাধারণকে সাধারণকার্যের জন্য স্বোপার্জিত শস্তের যথাংশ দিতে হইত। এখনও উক্তর পশ্চিম অঞ্চল ও অন্যান্য স্থানে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। যেখানে গবর্নমেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত সেখানেই এই নিয়ম।

। জমীতে যে কোন এক ব্যক্তির স্বত্ব হইবে না তাহার কারণ, কি? অর্জনই পত্রের একমাত্র কারণ, যে অর্জন না করিল তাহার স্বত্ব কিসে? কিন্তু ভূমি অর্জন করা যায় না, কাণে ভূমির ভূমি মালিক থাক আর নাই থাক, জমী যে জমী সেই থাকিবে। জমী কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না, কেহ উহা নাশও করিতে পারে না। জমী ঈশ্বরদত্ত স্বত্বাং উহা অর্জিত নহে উহাতে কাহারও স্বত্ব নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে জমী ব্যক্তিবিশেষের হইতে পারে না।

কিরূপে জমীর উপর লোকের স্বত্ব দাঁড়াইয়াছে?

জমী কাপ, এ প্রশ্নের উত্তর হইল

জমী কাহারও নহে, উহাতে জীবনাত্মক স্বত্ব আছে। তবে জমীত্বের জমী আমার জমী, তোমার জমী কেমন করিয়া হইল? জমীতে যদিও অর্জনস্বত্ব না হইতে পারে, কিন্তু উহাতে ব্যবহারিক স্বত্ব উৎপন্ন হইতে কাহারও আপত্তি নাই। মনে কর আমি এক জঙ্গলের মধ্যে একখণ্ড ভূমি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে চাষ করিতে লাগিলাম। আমার উহাতে কোন স্বত্ব নাই, ভূমি আমা অপেক্ষা বলবান, কালি ভূমি আমার গলে চড় সারিয়া আমার জমীখানি কাড়িয়া লইলে। যে শুনিবে সেই বলিবে এটি অত্যাচার হইল। কেন? জমী আমার নয় সত্য কিন্তু আমি যে সেটি ব্যবহারের উপযোগী করিয়াছি সেটুকু আমার স্বত্ব আছে, আমি পরিশ্রম করিয়া সে জমীর জঙ্গল আবাদ করিয়াছি, তাহাতে মার দিয়াছি ছই তিনবার চাষ দিয়া তাহার উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছি। জমী আমার না হইলেও আমি যে উহার উন্নতিসাধন করিয়াছি সেটি আমার, তাহাতে ত কোন মন্দ নাই। সেটুকু আমি ছাড়িব কেন? ছাড়িতে গেলে তাহার ক্ষতিগ্রস্ত চাই। এইরূপে অনেক জমীতে লোকের স্বত্ব জন্মিয়াছে। বহু উপনিবেশ সর্বত্র এই কারণে স্বত্ব। আমাদের দেশে যে গ্রামিকরস্বত্ব আছে তাহারও এইরূপে জমীতে স্বত্ব হইয়াছে। ব্যবহারিক স্বত্ব পুরুষাত্মকমে চলা উচিত কি না সে বিষয়ে আমরা

কিছু বলিতে চাহি না। অনেক সময়ে রাজা বা রাজসভা কোন বিশিষ্ট উপকার করার জন্য কোন সেনাপতি, পণ্ডিত, চিকিৎসককে ভূমিদান করেন, ইচ্ছা-বশত বন্ধুত্ব, আমাদের জাগরীত ব্রহ্মোত্তর জমীতে এইরূপে স্বত্ব কল্যাণ-রাজে। প্রায় অধিকাংশ স্থলে জম্মল-জাতি কোন পরাক্রান্ত জাতিকর্তৃক পরা-জিত হইলে শেষোক্ত জাতি পূর্বোক্ত জাতির সমস্ত জমী দখল করিয়া লন। রোমধর্মসের পর ইউরোপে সর্বত্র এই-রূপে বর্ধরজাতিসহ আপনাদিগের প্রা-ধান্য স্থাপন করিয়া আসে। এক্ষেপে ভূমিতে স্বত্বস্থাপন যে যোরতর অত্যাচার তাহা কে অস্বীকার করিবে। বাঙ্গালার যে জমীদারের জমী হইয়াছে ইহা কেবল সেকালের ইংরেজদিগের বুদ্ধিবার ভুলে। সেক্ষেপেই হউক যদিও জমীতে বকম প্রাণীর সমান অধিকার, আজি কালি পৃথিবীর প্রায় তাঁবং জমীই মনুষ্য-নামক জাতির কতিপয়গণ লোকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তাহারা কিছু করুন আর নাই করুন জমী তাহাদের। উহা লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। যে সকল লোক বা জীবজন্তু তাহাদের জমী হইতে উদ্বৃত্তি করে, তাহারা তাহাঁর অধীন, তাহাদের উপর তাহাঁর ক্ষমতা অসীম। এক্ষণে অন্যায় অনন্ত ক্ষমতাপ্রকাশকে অত্যাচারই বল আর প্রাকৃতিক নিয়মই বল আর মনা-ধের নিয়মই বল।

অতএব জমীর উত্তর লোকের যে স্বত্ব দাড়াইয়াছে তাহা ব্যবহারে উপনিবেশ স্থাপনে ও প্রায় অধিকাংশ স্থলেই অত্যাচারে।

৩। খাজনা দিতে হয় কেন ?

আবার সেই কথা, জমী যখন আর একজনের তখন তাহার জমী লইয়া-ব্যবহার করিনেই খাজনা দিতে হইবে। এটি মোট কথা। যদি সকল জমী সমান উর্বরা হইত তাহা হইলে খাজনা হইত কি ? তাহা হইলে জোর করিয়া জমী দখল করিবার কোন কারণ থাকিত না, তাহা হইলে যে-যে জমী পাইত, সে সেই জমী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। ভূমি না হয় গঙ্গার ধারে জমী লইয়াছে, আমি না হয় দশহাত তাকাতে লইব, এইমাত্র প্রভেদ। লাভ তোমারও যে বকম আমারও ঠিক সেই বকম, তবে তোমার উপর আমার অত্যাচার করার প্রয়োজন কি ? কিন্তু বাস্তবিক ত তাহা নহে, জমীর গুণে অনেক প্রভেদ। আমার থানি খুব উর্বরা, তোমার থানি পতিত বা কদমময়; তোমার স্তত্রাং ইচ্ছা হইবে যে ভূমি আমার জমীখানি পাও। তোমার জমীর দর কম হইবে আমার অধিক হইবে।

অন্যান্য ব্যবস্থায় যেমন জিনিসের গ-রচা ধরিয়া দান হয় জমীর উৎপাদনে যেমন হয় না। মনে কর কাপড় বুনিতে হইবে, তুলা জর আনা, বেহরগ হয় আনা, কোর দেওয়া ছু পয়সা ও অন্যান্য সবট ১০।

কাপড় খানার খরচা হইল তের আনা। তাহার বাবসময়ের মনাফা আট পয়সা দিলাম, কাপড়ের দর হইল পনের আনা। এই দরে অবিকাশ কাপড় বিক্রয় হইবে। শস্যাদির ত ঠিক একপে মূল্যনির্ণয় হয় না। তোমার জমী আমার জমী পাণ্য-পাশি, তুমিও যে খরচ করিলে আমিও সেই খরচ করিলাম; তুমিও যেমন খাটিলে আমিও তেমন খাটিলাম; তোমার উৎপন্ন হইয়া দশ সলি ধান আমার হইল ছ সলি। এই জন্য আদম স্থিতি বলেন যে অন্যান্য শিল্পে উৎপন্ন কিছুই হয় না, পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি হয় না, কেবল কৃষিক্ষেত্রেই ধনবৃদ্ধি হয়। কৃষিক্ষেত্রে যে গরু তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হয়। সেবার আবাদশ্রমে ইক্ষু নামক প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক দেখাইয়া নিয়াছেন যে, ইক্ষুর চাষে প্রায় বিংশ লাভ হয়। এই লাভের অধিকারী কে হইবে? যে ভূম্যধিকারী সেই লাভেরও অধিকারী হইবে। সে সমাজে জমীদার ভূম্যধিকারী সে সমাজে জমীদারের লাভ, যে সমাজে রাজা ভূম্যধিকারী সেখানে রাজার লাভ, সে সমাজে প্রজা ভূম্যধিকারী সে সমাজে প্রজার লাভ। এই যে উৎপাদনের কৰ্মী বেশী এইই খাজনার কারণ। যদি সব জমী সমান হইত তাহা হইলে খাজনা হইত না। যদি সব জমী এমন হইত যে প্রকার শ্রম ও খরচা বাড়ি উঠিত তাহা হইলে কেহই খাজনা দিতে পারিত না। যদি সব জমীতেই বিংশ

লাভ হইত তবে তাহার মিকট খাজনা আদায় হইত। তাহার মিকট আদায় করিতে যাইত, সেই ভাবিত অত্যাচার হইতেছে। সমাজের ন্যেযন্ত অন্যঙ্গ হইত। অতএব খাজনার কারণ জমীর ভগ্নতারতম।

খাজনা কত হওয়া উচিত?

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জমী সমান হইলে খাজনা হইত না। কেহই খাজনা দিত না। এখন প্রশ্ন এই যে তাহার খাজনা দিবে তাহার কত দিবে? যখন কতকগুলি লোক একটি গ্রামপতন করিল যে কয়খানি উর্ধ্বরভূমি ছিল সব কয়খানি তাহার দখল করিয়া নাই। কিন্তু সব উর্ধ্বরভূমি ত সমান নয়। মনে কর দশখানি উর্ধ্বর জমী আছে এক খানিতে দশ সলি ছইখানিতে সাড়ে নয় সলি তিন খানিতে নয় সলি ও চারি খানিতে আট সলি আর একখানিতে সাড়ে সাত সলি উৎপন্ন হয়। ইহার নীচের জমী আবাদ হয় না। তাহার জমীতে সাড়ে সাত সলি জন্মে তাহার যদি তাহাতে শ্রম ও খরচা না পোষাইত তবে সে কখন আবাদ করিত না। সুতরাং বুঝা গেল যে সাড়ে সাত সলি উঠিলেই চাষার খরচা উঠে। অতএব সাড়ে সাত সলির উপর যে জমীতে যত উৎপন্ন হয় সমুদয়ই সে জমীর খাজনা হইবে। তাহার উৎপন্ন দশ সলি যে আড়াই সলি মিলে তাহার লোকমান হইবে না। তাহার সাড়ে নয় সলি তা-

হার ছই সলি দিলে মোকসান হইত না। অতএব যে সকল জমী চায় হার তাহাদের মধ্যে যে জমী সর্কাপেক্ষা খারাপ তাহার উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জমীর উৎপন্ন হইতে বাদ দিলে বাকি বা কিছু থাকে তাহার নাম খাজনা। বলিবে যে দেশে প্রমাণ ভূম্যধিকারী সে দেশে ত খাজনা দিতে হয় না। আমরা বলি সেখানে প্রজা খাজনা ও মুনাফা ছই পায়, অন্য আরগায় মুনাফা পায় প্রজা, খাজনা পায় রাজা বা জমীদার।

এত হল শস্যান্তরায়ী খাজনা। যেখানে খাজনা টাকার দ্বিতে হয় সেখানে ইহা অর্গেক্ষা একটু জটিলতা অধিক। মনে কর পূর্বাঞ্চ গ্রামে আর দশ ঘর মোক বাঙালি, পাঁচ ঘর চামা আর পাঁচ ঘর চাউল কিনিয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে সে ভাল জমী আর নাই। নূতন চামা বাহারী আসিল তাহারায় যে জমী পাইল তাহাতে তিন খানিতে ছয়সলি ও ছই খানিতে পাঁচ সলি মাজ। একে যার সকল জমীর খাজনা বাড়িয়া গেল। বাহারীতে দশসলি উৎপন্ন হইত তাহার খাজনা আগে ছিল আড়াই সলি, এখন হইল পাঁচ সলি, বাহারী মাড়ে নয় সলি তাহার খাজনা আগে ছিল ছই সলি এখন হইল মাড়ে চার সলি, কেবল বাহারী উৎপন্ন পাঁচ সলি সেই কেননামতে খরচা পেয়ায় বলিয়া তাহাকে খাজনা দিতে হয় না। এইরূপে পাঁচজন মোক দুই হওয়ার খাজনা প্রায় ত্রিগুণ হইয়া

গেল। সর্কাপেক্ষা নিকর জমীই খাজনা দিতে না। তাহা অর্গেক্ষা যে ভূমির উৎপন্ন যত অধিক ততই তাহার খাজনা। আগে ছিল মাড়েনাস্তনলিওয়ানা জমী নিকর। এখন পাঁচসলিওয়ানা জমী সর্কাপেক্ষা নিকর হইয়াছে সুতরাং ভাল জমীর খাজনা বাড়িয়া গিয়াছে।

আবার দেখ উর্কর জমীতে খরচা কম। মনে কর দশ সলিওয়ানা জমীতে যে খরচা হয় মাড়ে সাত সলি ওয়ানাতেও সেই খরচা হয়। মনে কর ছই আরগায়ই ৭৫ টাকা খরচ হয়। কিন্তু একের উৎপন্ন কম অপরের উৎপন্ন বেশী। সলিকরা ভাল জমির খরচা কম, মন্দ জমীর খরচা বেশী। ভাল জমীওয়ানা সত্তা দরে বিক্রয় করিতে পারে মন্দ জমীওয়ানা তত সত্তা দিতে পারে না। কিন্তু এক বাজারে এক সময়ে এক জিনিসের ছই দর হইতে পারে না [খুঁকরা জিনিসের যদিও হয় কিন্তু বড় কারিবারে হয় না] সুতরাং মাড়ে সাত সলিওয়ানা যে দরে বিক্রয় করিবে দশ সলিওয়ানাকে সেই দরে বিক্রয় করিতে হইবে। দশসলিওয়ানা একে তা উৎপন্ন বেশী পায় তাহার উপর তাহার জিনিসের দাম ও তাহার খরচা অর্গেক্ষা অনেক অধিক। মনে কর সাতসলিওয়ানার সলিকরা দশ টাকা খরচা হইয়াছে, দশসলিওয়ানার সলিকরা মাড়ে সাতটাকামাত্র খরচা পড়িয়াছে। কিন্তু ছইজনকেই বিক্রয় করিতে হইল মন্দ টাকা দলি। একের

হইল $১৫ \times ১৫ = ১১২৫$ । অর্থাৎ হইল $১৫ \times ১৫ = ১১২৫$ খরচ। দুইয়েরই এক। যাহার ভূমি অধিকতর উর্বর। তাহার উৎপন্ন বেশী খরচা কম, মুনাফা অত্যধিক পুনঃ বেশী।

এখন মনে কর পাঁচজন চাষা ও পাঁচ জন অপর লোক আমিয়া ভূটিল। চাষার আঁরও নিরুপ্ত জমী চাষ করিতে লাগিল। মনে কর সেই ৭৫ টাকার খরচ হইতে লাগিল, উৎপন্ন হইল পাঁচ সলিমাত্র সলিকর। খরচা পনের টাকা হইল। নূতন লোক আমায় ডাউলের দর বাড়িয়া গিয়াছে, প্রতি সলি এখন মনে কর বিশ টাকা দর হইল। পাঁচ-সলিওয়ার ৭৫ টাকা খরচ $৫ \times ২৫ = ১২৫$ টাকা আয় পঞ্চাশ টাকা মুনাফা। সাড়েসাতসলিওয়ার ৭৫ টাকা খরচ $১৫ \times ২৫ = ১১২৫$ আয়, মুনাফা ১১২৫ টাকা। দশসলিওয়ার খরচা ৭৫ টাকা আয় $১০ \times ২৫ = ২৫০$ মুনাফা ১৭৫ টাকা। আঁণে ছিল ৭৫ টাকা এখন হইল ১৭৫ টাকা অর্থাৎ তিনি নিজে ইহার কিছু করেন নাই। ইহার মধ্যে পাঁচ-সলিওয়ার ৭৫ তদ্বাদে সমুদয়ই খাজানা যাহা উচিত। অর্থাৎ চাষা আপনাক প্রকৃত মেহমত স্বায় মুনাফা উঠাইয়া আঁণে পর যা কিছু থাকি থাকিলে তাহাই খাজানা। অতঃপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, নিরুপ্ত জমী চাষ হইতে আরম্ভ হইবে, তদ্বাদে জমীর খাজানা বাড়িয়া যাইবে। যতই

চাষা দেশে বাড়িলে লোক অল্প মুনাফা টাকার খাজানার চাষার মুনাফা কমিয়া আসিবে জমীর খাজানা বাড়িয়া যাইবে। এই যে খাজানা ইহার নাম Economic Rent। আমরা ইহাকে অর্থ খাজানা কহিব। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যে খাজানা দিয়া থাকি, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক অসংগত কম ও অনেক অসংগত বেশী। ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প খাজানা কেন হইবে?

আমরা খাজানাসম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত কথা বলিয়া আসিলাম, তাহা অধিকাংশই রিকার্ডের নামক প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিদের মত। তাহার মত যে প্রমাণ সে দিনে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু তাহার মত ইংলণ্ড ভিন্ন অপর দেশে গৃহীত হয় না। ইংলণ্ড অর্থপ্রধান দেশ ভূমি-প্রধান নহে, ইংলণ্ডের লোক বেশ বুদ্ধিতে পারেন যে, চাষা যে খরচ ও যে পরিশ্রম করিল তাহার উদ্ধার ও তাহার মুনাফার তাহার স্বত্ব, এ সম্বন্ধে অধিক বা কিছু তাহাতে তাহার ক্ষয় নাই। আমাদের দেশে ভূমিপ্রধান। চাষার জানে তাহার চাষ করিয়া নিজের উদ্ধার করিয়া যদি উদ্ধৃত হয়, তবে জমীদার পাইবে। অতঃপর রিকার্ডের মত যেমত তাহা আমাদের দেশীয় লোক দৃষ্টিকে বিশ্বাস করান সম্ভব কঠিন। আমাদের দেশের ত কথাই নাই, কৃষকের লোকও রিকার্ডের কথা বিশ্বাস করেন না। রিকার্ডের কথা তুলিলে

আমাদের দেশীয় লোক মনে করিবেন লেখক জমীদারের অথবা গবর্ণমেন্টের অগণ্যতা করিয়া প্রজাপুন্দের অনিষ্টের মূল করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহার কিছুই করিতেছি না মাথা মত্যা বলিয়া বিশ্বাস তাহাই লিখিতেছি।

লোকে ভিজ্জামা করিবেন যদি রিকার্ডের মতই সত্য হয়, তবে খাজানা কোন দেশেই রিকার্ডের মতাকুযারী হয় না কেন? তাহার উত্তর এই ইংলণ্ডের খাজানা প্রায়ই রিকার্ডের মতে পূহিত হয়। ইংলণ্ডের জমীদার কারমারকে জমী দিলেন। কারমার দেখিল তাহার টাকা উঠিলে মুনাফাও উঠিলে সে জমী লইল। ইংলণ্ডের কারমার ধনী, সে যদি চাম না করিত, তবে ব্যবসায় করিত, ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের জমী নাই তাহারা কারমারের মজুরদার। ইংলণ্ডে জমীর সম্পূর্ণ স্বত্ব জমীদারের, গবর্ণমেন্টের বা প্রজাদের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই। অন্য কোন দেশেই প্রায় মেল্লগ নাই। আমাদের দেশের জমীতে (খাজানা ভিন্ন) গবর্ণমেন্ট জমীদার ও প্রজা সকলেরই স্বত্ব আছে ইহা অনেকে স্বীকার করেন। সুতরাং ভারতবর্ষে ঠিক রিকার্ডের কথা মত খাজানা হইতে পারে না। জমীদার উৎপন্নর অংশ পাইবেন গবর্ণমেন্ট অংশ পাইবেন প্রজা অংশ পাইবে। প্রজা নিজেদের খরচ তুলিয়া লইয়া বাকি যেটা থাকিলে তাহার অংশ পাইবে। বহু

দেশে গবর্ণমেন্ট নিজ অংশ জমীদারকে স্বত্বভাগ করিয়া দিয়াছেন—বহন দিয়া ছিলেন ভখন প্রজার স্বত্বের দিকেও বড় বিশেষ মনোযোগও করেন নাই। সুতরাং এই সময়ে জমীদারেরা প্রজার উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছেন এখন আবার প্রজার স্বত্বসাধনের জন্য নতুন চেষ্টা হইতেছে, সুতরাং জমীদার প্রজার নিকট সমস্ত বাড়তি উৎপন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ জমীতে এবং জমীর খাজানার প্রজারও স্বত্ব আছে। একপা জব্দতার ভারতবর্ষে জমীর খাজানা অর্থাৎ জমীদারের আঁপা রিকার্ডের খাজানা অপেক্ষা অনেক কম হইবে, কারণ তাহার এক অংশ প্রজার নিজেদের।

ইতালীতে জমী জমীদার ও প্রজার ভাগে বিভি। আমাদের অল্প ব্রহ্মোত্তর-ব্রহ্মগীরা যেমন ভাগে বিভি করেন, সেও ঠিক সেইরূপ, তবে আমাদের ব্রহ্মোত্তরভোগীরা মিথ্যাদি বন্দোবস্ত করেন, সুতরাং জমীতে প্রজার স্বত্ব জমীতে না দিয়া অনেক সময়ে রিকার্ডের মতাকুযারী খাজানা আদায় করিয়া লন। ইতালীতে তাহা হয় না; ইতালীতে এই নিয়ম যেহায়স মলা জুলিয়স কারমার প্রভৃতির সময় হইতে বন্ধমূল হইয়া আসিতেছে। এক এক জায়গায় সেই জমীদার ও সেই প্রজা তাৎপত্য বৎসর করিয়া চলিয়া আসিতেছে প্রজাদেরও জমীতে দর অঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন

জায়গার জমীদারের অধীনে কোন জায়গার জমীদারে দুই তৃতীয়াংশ। কিন্তু উত্তরীর জমী এত ভাল যে তাখাপি প্রায় আপনার পরচা ও মুনাফা পেয়া ইহা খাজনার কিছু অংশ আদায় করে। পূর্বেই উক্ত ইইরাছে কুলা ও কল্লি প্রভৃতি হানে জমীই প্রজার হুতরা সেখানকার খাজনা প্রজাই পায়।

যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল সর্বত্র খাজনা রিবার্ডের মহামুখ্যী খাজনা অপেক্ষা কম। কিন্তু আরালসেইর এমনি চুড়িয়া যে, সেখানে ইহা অপেক্ষা

অনেক বেশী খাজনা। প্রজায় দিতে পারে না, কিন্তু জমীদারের খাজনা তার নামে পাওনা লেখা থাকে। তাহার কারণ এই যে যেখানে প্রজার লুই লোপ হইয়াছে; জমীদার নষ্টের সর্ব। লোক অনেক। জমী একখানি বন্দোবস্ত হইবার সময় হাজার হাজার লোক দখল কর, যে সকলের অপেক্ষা অধিক দিতে পারিবে সেই জমী পাইবে। গরীবলোক ক্ষমতার অতিরিক্ত দিন বলিয়া স্বীকার করিয়া জমী লয়, দিতে পারে না, পুরুষায়ক্রমে ক্রমশঃ বর্জনপথে ধ্বংস হইতে থাকে।



শ্রীমন্তনাথ

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

অভিজ্ঞান শকুন্তল। ইহার নাটক।

হুকাগার খাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। এই ঘটনা আছে বলিয়া শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। নচেৎ উপন্যাস মাত্র হইত। বলা অনাবশ্যক যে উপন্যাস ইইশেই নাটক হয় না। আরবাউগ-দ্যাসনামক গ্রন্থে সহস্রাধিক উপন্যাস আছে; কিন্তু আরব্য উপন্যাস নাটক নহে। যে উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য মহাচরিত্রের আভ্যন্তরিক মূল প্রদর্শন করণ তাহাকেই নাটকের উপন্যাস বলে। মহাচরিত্র দুই অঙ্গ। বাহ্য

অঙ্গতেরদ্বারা অনুশাসিত হওয়া এক প্রকার চরিত্রের লক্ষণ; এবং বাহ্য অঙ্গকে শাসন করা আর এক প্রকার চরিত্রের লক্ষণ। ইইটি মরিত্ত ব্যক্তি ইষ্টাৎ প্রভূত ধনরাশি প্রাপ্ত হইল, পাইরা এক জন গর্জিত হইয়া উঠিল; আর এক জন পূর্বের ন্যায় বিনয়নয় রহিল। দেখা যাইতেছে যে, বহির্জগতের ঘটনা একজনকে বিচলিত করিতে পারিল, আর একজনকে পারিল না। একজনের মন শক্তি এবং দৃঢ়তা সম্পন্ন, আর এক জনের মন তাহা নহে। একজন মনের

দ্বারা শাসিত হইল, যন আর একজনের দ্বারা শাসিত হইল। বাহুজগৎ একজনের মনকে রঞ্জিত করিল, আর একজনের মন বাহুজগৎকে রঞ্জিত করিল। এক জনের মন বাহুজগৎকে শক্তির বশীভূত; বাহুশক্তির শাসনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিতেছে। আর একজনের মন নিজশক্তির দ্বারা বাহুজগৎকে শক্তিকে হতবল এবং বশীভূত করিতেছে। দ্বিরাঙ্কউদ্ভোলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। প্রথম নেপোলিয়ান সমবেত ইউরোপকর্তৃক এতদ্বিধে তাড়িত হইয়া পুনরায় সমবেত ইউরোপকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত এতদ্বিধে পরিত্যাগ করিয়া মনরানল প্রজ্জ্বলিত করিল। সিরাক এবং নেপোলিয়ান উভয়েই আফ্রিকান করি। কিন্তু সিরাকের আফ্রিকান শেষে ক্ষতিকর হইল। আবার মনে কর সেই কুরুক্ষেত্রের মহাসমর চলিতেছে। আজ শত্রুগণ জোণাচার্য্য কোত্তবসেনার অধিনায়ক। পাণ্ডবদিগের আর প্রেরণ নাই। বুধি আজিকার যুদ্ধেই পাণ্ডবগণক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জনরব উঠিল যে, অশ্বখান হত হইয়াছে। জোণাচার্য্যের দ্বন্দ্ব বাধিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কণাটা ঠিক কি না? তিনি সত্যপ্রিয় বৃদ্ধগুরু বুধিষ্টিককে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধগুরুর বৃদ্ধিষ্ঠি। ইতি—গল্পে শব্দিত হইল। শত্রুচার্য্য শত্রু পরি-

ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর যুদ্ধ হইল ভারতবাসী এবং ভারতীয় রণী মাতেই জানেন। কি ভয়ানক আত্মহত্যা! যে মহাত্মা কখনও প্রবঞ্চনার কথা কহেন নাই, যিনি সত্যাত্মের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত, যিনি সত্য এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে সত্যকেই অপরূপ বিলম্ব আদর করিয়া আনিয়াছেন, তিনিই কি না আজ চিরসংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঐশ্বর্যের লোভে সত্য-সংহার করিলেন। একেই বলে প্রকৃত আত্মহত্যা,—আত্মহত্যা প্রোৎসাহে যুদ্ধে হিরের—একেই বলে বাহুশক্তির দ্বারা অশ্রুশাসিত হওয়া। বাহুশক্তির দ্বারা নিধন প্রাপ্তি। নাটককার এই প্রকার আত্মহত্যা নিবারণ করেন। এমনকি আত্মহত্যা না দেখাইয়া নাটককার আত্মগৌরব দেখাইয়া থাকেন; আত্মার পরাজয় না দেখাইয়া বিজয় দেখান। আবার সেই ভীষণ সমরক্ষেত্র মনে কর। তার ভয়ানক সাক্ষ্য লইয়া যেরূপ হইবে, তিনি সেই যুদ্ধে অগ্নী হইবেন, তিনি ভারতে রাজত্ব কর্তৃক হইবেন; যিনি সেই যুদ্ধে বিজিত হইবেন তিনি যদি বাঁচিয়া থাকেন ত পাপের ভিত্তি হইয়া থাকিবেন। ব্যাঘ্রের বড় সহ্য নয়; উদ্ভেদও বড় ক্ষুদ্র নয়—হয় রাক্ষসভোগ, না হয় মুষ্টিভিক্ষা। ভয়ানক সমর। এই সমরায় পড়িয়া কার মন অচলিত থাকে? একটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে রাক্ষসভোগ হয়। বাহুবল মনবল

বিশুদ্ধ হইয়া যায়; বৎসরব্যাপী সজ্ঞাত-
বাসের যত্নবাহ্যগণ সার্থক হয়; সন্তী-
সারী কুলদম্পতির অপমানের প্রতি-
শোধ হয়। কিন্তু সেই ক্ষণটি উচ্চারণ
করিলে সন্তোর বিপর্যয় ঘটে। আর
একটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে রাজ্যলাভ
না হইয়া গণের ভিত্তারী হইতে হয়;
বাল্যবৎসর বনবাগ চিরবনবাসে পরিণত
হয়; বৎসরব্যাপিনী যন্ত্রণা জীবনবা-
গিনী যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়ায়; অহর্যাপ্যশ্যার
অসহ্য অপমান কূলের কলঙ্ক হইয়া
থাকে। কিন্তু এই এক্ষরটি উচ্চারণ
করিলে সন্তোর জয় হয়, এবং সত্য-
নিষ্ঠার পরাকর্ষ্য দেখান হয়। সত্যপ্রিয়
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি করিলেন? না না
বলিয়া হাঁ বলিলেন! আর অমনি সমস্ত
জগতের লোক ক্ষুদ্রহৃদয়ে বলিয়া উঠিল
—না, এটা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নাম বল
হইয়া না, এবার যুধিষ্ঠিরের যুধিষ্ঠিরত্ব
বিনষ্ট হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির যদি রাজ্য-
লোভ ত্যাগ করিয়া, বনবাগ বিস্থত
হইয়া, অজ্ঞাতবাসের যন্ত্রণায় দূকপাত
না করিয়া, ভক্তিসমী মহাধর্মীর অপ-
মান ক্ষুদ্রাভ্যন্তরে লুপাইয়া রাখিয়া,
কেবল সত্য এবং ধর্মের মুখ চাহিয়া
‘না’ বলিতেন, তাহা হইলেই না কি
হইত? তাহা হইলে কি সমস্ত জগৎ
মহত্মমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত না,
এবং দেবতারও কি তাঁহার কার্যের বী-
রত্ব দেখিয়া জগতের অদ্বিতীয় ধর্মবীর
বলিয়া তাঁহার পূজা করিতেন না? তাহা

হইলে আশঙ্কা কি সমস্ত মহাভারতের
ক্ষুদ্রমহারিণী আখ্যায়িকা ভুল্লেখ্যে দূরে
নিষ্ক্ষেপ করিয়া শুধু এই বীরত্বপূর্ণ ‘না’
শব্দটী লইয়া গাতিয়া থাকিতাম না?
তাহা হইলে কি এই একাকরনির্মিত
‘না’ শব্দে আশঙ্কা সহস্র আখ্যায়িকার
মনোহারিত্ব অনুভব করিতাম না? কিন্তু
কেমই বা করিতাম? করিতাম, তাহার
কারণ এই। যুধিষ্ঠিরকে সত্যনিষ্ঠ ধর্মপুত্র
বলিয়া জানি, এবং দেখিয়া আসিয়াছি;
এবং তাই বলিয়াই তাঁহাকে পূজা করিয়া
আসিয়াছি। এখন দেখি সেই সত্যনিষ্ঠা
ঘোর বিপদান্ত। এখন দেখি সেই
সত্যনিষ্ঠার ভয়ানক পরীক্ষা উপস্থিত।
এখন দেখি একদিকে সত্যনিষ্ঠা এবং
সর্বনাশ, আর একদিকে একটীমাত্র
মিথ্যাকথা, কিন্তু সমগ্ৰ পৃথিবীর আধি-
পত্য, এবং স্বয়ংভেদী অপমানের প্রতি-
শোধ। কি ভয়ানক পরীক্ষা! কি
ভয়ানক স্বয়ংভুজ! মনে করিলে অস্থিত
হইতে হয়, ভাবিয়া দিশাহারা হইতে
হয়। এ পরীক্ষার কয়জন উত্তীর্ণ হইতে
পারেন, এ যুদ্ধে কয়জনের জয়লাভ হয়?
কিন্তু যদি দেখি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সমগ্ৰ
পৃথিবীর আধিপত্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া,
একেবারে ধর্ম এবং সর্বনাশকে আলিঙ্গন
দিতেছেন, তখন কি মনে হয় না যে
মর্ত্যেই স্বর্গরাজ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে?
তখন কি উন্নতমন আরো উন্নত হয় না?
তখন কি মহাশক্তি-প্রভুকে দেবপ্রভু-
বোধে স্বয়ং আক্লাবে উদ্ভূত হইয়া উঠে

না? এবং সে আত্মদায়ী বা কি রকম
 আত্মদায়ী? গভীর, নিখিল, উৎসাহপূর্ণ,
 বিশ্বাসদায়ী, শক্তিগ্ধারী, আত্মার গোপন
 এবং মহিমাবুদ্ধিকারী। সহস্র আরম্ভো-
 পন্যাস পড়িলে যে আত্মদায়ী হয়, সে
 আত্মদায়ী এ আত্মদায়ীদের দিকেও যায় না,
 এ আত্মদায়ীদের শতাংশের একাংশ-পরি-
 মাণও হয় না। এত আত্মদায়ী কেন
 হয়? না ধর্ম বিপর্যস্ত হইয়া আপন
 সহিমা রক্ষা করিল বলিয়া। মহাত্মা
 মেগস্যাথের একটি চরিত্র বুদ্ধিমা দেখ।
 প্রিয়বন্ধু বানানিয়র উপকারার্থে উদার-
 চেতা এণ্টোনিয় সাইলকের নিকট টাকা
 কর্ত্ত করিয়া একখানি খত লিখিয়া
 দিলেন। তাহাতে এইরূপ অঙ্গীকার
 করিলেন যে, যদি কিনয়ামের মধ্যে
 স্ত্রীসহিত টাকা পরিশোধ করিতে না
 পারেন তবে সাইলক তাহার শরীর
 হইতে অর্জনের মাংস কাটায়া লইবেন।
 এণ্টোনিয় জানিতেন যে, সেই সময়ের
 মধ্যে তাহার বাবিত্ত্যপোস্তগুলি ধনপূর্ণ
 হইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং তিনি
 অক্লেশে টাকা পরিশোধ করিয়া প্রাণ-
 রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঘটিল
 কি? নিরুপস্থিত সময়ের মধ্যে বাবিত্ত্য-
 পোস্ত ফিরিল না। ~~সেই~~ নিষ্ঠুর সাইলক
 অঙ্গীকৃত মাংসখণ্ড পাট্টবার প্রার্থনায়
 হাকডায়ে অভিযোজ করিল। বিচার
 আরম্ভ হইল। তখন উন্নতমনা উদার-
 চেতা, পরতৎপকাতর, পুরোপকারী
 এণ্টোনিয় কি করিলেন? তিনি তখন

যে অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহাতে মহোন্নত
 মনও অরনত হইয়া পড়ে; উদার চিত্ত
 সঙ্কুচিত হইয়া যায়; পরতৎপকাতরতা
 নিম্নতৎপকাতরতায় বিলুপ্ত হয়; ক্ষম
 কাটিয়া যায়; মন কেত্রেবল্লিত হ্রদের
 স্থায় অপরিচিত পথে ছুটিয়া বেড়ায়।
 তাহার সেই বিপর্যস্তকুল অবস্থা দেখিয়া
 স্বয়ং বিচারপতিই শোকসংকুল হইয়া
 উঠিলেন। তাহার বহুগণ, বাহাদুরের
 উপকারার্থে তিনি আজ যত্নসূত্রে আসিয়া
 দাঁড়াইয়াছেন, তাহার তাহার নিষ্ঠুর
 প্রবর্তার চরণ ধরিয়া করুণা ভিক্ষা
 করিতেছেন। কিন্তু তিনি কি করিলেন?
 তিনি স্থিরচিত্তে দৃঢ়তাপূর্ণ অস্তঃকরণে
 বিচারপতিকে বলিলেন—

"I have heard,
 Your grace hath ta'en great pains
 to qualify
 His rigorous course: but since he
 stands obdurate,
 And that no lawful means can
 carry me
 Out of his envy's reach, I do
 oppose
 My patience to his fury; and
 am arm'd
 To suffer with a quietness of spirit,
 The very tyranny and rage of his."

এই কি সেই প্রবর্তাশালী, স্বপ্নব্যা-
 শারী, প্রিয়বন্ধুবিরিত, সত্যবোধ, প্রেম-
 পূর্ণ এণ্টোনিয়? তাহার কথা শুনিয়া

ত তাহাই দেখি হয়। কিন্তু বাস্তবিক
আজ তিনি কি? বাস্তবিক আজ তিনি
পথের ভিঘারী, আজ তাহার সেই
অদুল ঐশ্বর্য স্বপ্নে দৃষ্ট ঐশ্বর্যের ন্যায়
শূন্যে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে; আজ তিনি
তাহার প্রচুরতাময়, কণ্ঠগোষ্ঠোত্তীর্ণ
বিত, প্রীতিপূর্ণ, হাস্যময় গৃহ হইতে তা-
ড়িত হইয়া বিচারালয়ে পাড়াইয়া বুড়ার
আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন। তবুও তাহার
এই বকম কথাই পাঠক। কুমি মাঝেই
মনে করে, আমি এই প্লেবুলা, উন্নতমনা
বদিকনাগঠিত মনুষ্য নহি। বহিঃত পারি
না। আমি তাহাকে প্লেবতা মনে করি।
সামান্য মনুষ্য হইলে আশ্চর্য্য বিপদে
কি তাহাকে পরোপকারপ্রস্তুত হৃৎপ্রতী
হইয়া জীবনবিসর্জন করিবার নিমিত্ত
মঙ্গলপরিণয় দেখিতাম, না আপনাকে
আপনি ভুলিয়া, অথাবচ্ছিন্ন সংস্কার হারা-
ইয়া, উন্নতমনা কুঞ্জিত করিয়া, জীবনলাভ-
নায় ধূলাবলুড়িত হইতে দেখিতাম?
নাটক! ইহাকেই প্রকৃত নাটকরহস্য
বলে। প্রকৃত নাটককার ধর্ম্মের অব-
তারণা করেন; তাহার শক্তি, সৌন্দর্য্য,
মহত্ব সকলই পাঠকে মনোহারিত
ভুলিকা দিয়া আকিয়া আকিয়া দেখান;
সেই বিমূঢ়ের চিত্তেরদ্বারা পাঠকের
মন মাতাইয়া ভুগেন; ভুলিয়া আবার
সেই চিত্তটিকে ভীষণাঙ্গকারে নিষ্ফেপ
করেন; সে অঙ্গকারের এমনি স্থল যে
তাহার মধ্যে ধর্ম্মের মুগ্ধ সত্যতাই নলিন
হইয়া হাইবার সম্ভাবনা, শক্তি বিনষ্ট

হইবার সম্ভাবনা, মহত্ব হীনত্বের পরিণত
হইবার সম্ভাবনা। এই ঘোর অস্বা-
বিশ্বাস্য দেবিতা পাঠকের মন আকুলিত
হইয়া উঠে; প্রিয়বস্তুর শোচনীয় অবস্থা
দেখিয়া পাঠকের মন যন্ত্রণাময় হইয়া
উঠে; ধর্ম্ম নিজ মহত্ব রক্ষা করিতে
বুঝি বা অপারগ হয় এই অশঙ্ক্য
পাঠকের মনয় বিলোড়িত হইতে থাকে।
ক্রমে অঙ্গকার সন্নিবেশিত থাকে; দেখা যায়
যে ধর্ম্মোচ্চাতিঃ মলিন হয় নাই, যেমন
উজ্জল ছিল তেমনি উজ্জল আছে;
বাহুজগৎ অন্তর্জগতে চিহ্নমাত্র অঙ্কিত
করিতে পারে নাই; বার্থজ্ঞান মাথা
ভুলিতে পারে নাই, নিঃস্বার্থ তেজোময়
ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ তেজোময়ই রহিয়াছে।
তখন পাঠকের মন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব
বুঝিরা বহিঃতবল হয় এবং নিঃস্বার্থ, পবিত্র,
স্বর্গীয় আনন্দোচ্চাতিতে ভাসিতে থাকে
এবং হানিতে থাকে। একেই আমি
বলি নাটকের নাটকত্ব। সকল নাট-
কের কথা বলিতেছি না। নাটকের
শ্রেণীবিধেদের কথা বলিতেছি। সেক্স-
পীয়রের Merchant of Venice এবং
কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল এই শ্রেণীর
অন্তর্গত। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের
নাটকত্ব কোথায় দেখা বাউক।

নাটকখানির নাম সংগে আসার মতে
অভিজ্ঞানশকুন্তল একখানি নাটক প্রধান
নাটক। শকুন্তলা বড় কম মন; কিন্তু
দুঃস্বপ্নই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রধান
চরিত্র। দেখা নাটক এই দুঃস্বপ্নকে।

কোন একটি মহাঘোর মন এবং হৃদয়
বিস্মিতে হইলে অগ্রে তাহার শরীরখানি
কুণ্ঠিয়া দেখিতে হয়। মন এবং শরীর,
এ দুইয়ের প্রতি নিকটমত্বক। মনের
চিত্র শরীরে আঁকা থাকে। অধিকন্তু
মহার যে সৰ্ব্বম মানসিক ভাব এবং
কি তাহার শারীরিক কার্যসকলও
ভদ্রদুর্দায়ী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
নির্জনচিন্তাপ্রিয়, তাহার দেহের স্থির,
কঠিন, এবং সঙ্গতিত ভাব হইয়া থাকে।
যে ব্যক্তি উদ্যমপূর্ণ এবং কার্য্যপ্রিয়
তাহার দেহের সজীব, চঞ্চল, দ্রবদ্রব,
এবং বসিষ্ঠ ভাব হইয়া থাকে। যে
ব্যক্তি বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়সেবায়
রক্ত তাহার দেহের কোমল, অনস্থিত
এবং আশুনাশিত ভাব হইয়া থাকে।
কালিদাস ছন্দকে ইন্দ্রিয়শাসনাধীন ক-
রিয়া দেখাইরাছেন। কিন্তু সেই চিত্রের
মধ্যে মধ্যে তাহার শরীরের এবং শারী-
রিক কার্য্যচরারেরও একখানি চিত্র
আমাদিগকে দিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে
ছন্দকে দেখিয়া তাহার সেনাপতি মনে
মনে ভাবিতেছেন—

জননরত ধনুর্জ্যাকালনকুরকর্মা
রবিকরনমসিফুঃ সেনপশৈবভিঃ।

আপটিভমপি পাত্তং ব্যায়তৎসালক্ষণং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসংগঃ বিভক্তি ॥

ছন্দ রাজা—ভারতের অভূতমহিমা-
ম্পন্ন চন্দ্রবংশীয় রাজ্যগণের মধ্যে এক
জন প্রপাতনামা রাজা। তিনি বহুপাড়া
ভান্ডারুর্মির অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর।

ঐশ্বর্যস্বলত বিলাসবাশি মনে করিলেই
তাঁহার হইতে পারে; কিন্তু তিনি বিলাস-
বিদেষী। তিনি বীরোচিতকামিনিরতা।
তিনি শারীরিক স্বপক্ষে তুচ্ছ জ্ঞান ক-
রিয়া প্রামাণ্যের ধনুকহস্তে পচণ্ড রবি-
কিরণে বীরের ন্যায় বিচরণ করিয়া
থাকেন। বিলাসবগ্নের ন্যায় তাঁহার দেহ
জীবনপ্রজ্ঞাহীন শিথিলগ্রন্থ নয়। গিরি-
চর হস্তীর ন্যায় সে দেহ কেবলমাত্র
বদ্যাজক। এই ছবিখানি দেখিয়া কে
সমিতে পারে যে, চিত্রিত ব্যক্তি আমার
বিলাসপ্রিয় প্রা ইন্দ্রিয়পরতক। এ কি
একজন কিত্তিকার পুরুষকারপূর্ণ পুরুষের
ছবি নয়? আবার শুধু তা নয়। যখন
সেনাপতি ছন্দকে দেখিয়া মনে মনে
তাঁহার শারীরিক বীরভাবের এইমত
প্রশংসা করিতেছেন, তখন ছন্দস্বের
মানসিক অবস্থা কি? শঙ্কুসংলগ্ন দেখিয়া
তখন তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠি-
য়াছে। তিনি সন্দেহাই ভাবিতেছেন,
সেই পবিত্র রক্ত তাঁহার হইবে কি না।
বিনয়ক আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে,
তিনি পুরুষরাজে নিমেষনাজ নিজলাভ
করেন নাই। এবং আমরাও তাঁহাকে
মুহুর্ত্তাপ্রে শয়নপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসি-
বার সময় দেখিয়াছি, তিনি মনে মনে
তোলাপাড়া করিতেছেন—এবং আসিয়া
প্রিয় বিনয়কের নানিশিট শুনিয়াও
স্মরণে রাখেন না। আবার সেই মুহুর্ত্তেই
ত সেনাপতি আসিগেল; কিন্তু তিনি ত
এই বিবদ সঙ্গমার্থার চিন্তাগ্রস্ত ছন্দ

প্রেরণা করে না। সুখবয়সে দেখিতে
পাইলেন না। তবে ত ছয়ত শুধু কর্ম-
বীর নন। তবে ত তিনি কর্মবীর এবং
চিত্তবীর দুইই। তিনি যে শুধু প্রচণ্ড
রবিকিরণ সহ করিতে পারেন তা নয়;
চিত্তসংযমও তাঁহার ভেতরনি অভ্যস্ত
এবং পেছানীন। ফলতঃ কালিদাস
এই অমূল্য চিত্তসংযমের চিত্র অতিশয়
জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিয়াছেন। পাঠক।
আইস, একবার মহর্ষি কণ্ঠের আশ্রয়ে
প্রবেশ করিয়া দেখি। শকুন্তলা, প্রিয়-
দ্বন্দ্বা এবং অননুয়া আশ্রয়ের তরুলতায়
জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন এবং
কত কি কথা কহিতেছেন। ছয়ত
বৃক্ষান্তরণে থাকিয়া দেখিতেছেন এবং
শুধু হইতেছেন। সর্বলোকপ্রিয় ভ্রমরটী
শকুন্তলাকে বাতিবাস্ত করিয়া তুলিয়াছে
দেখিরা, ছয়ত মনে মনে আশ্রিতেছেন—

সত্যোদয়ঃ যত্রৈতথৈব হি ব্রহ্মসংগে

অতঃকৃতঃ প্রেরিতবানলোচন।

বিবহিতভ্রমরমণা শিকতে

ভরাদেকাবাহপি হি নৃষ্টিমিত্রমম্ ॥

ভলাপাশাঃ দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেগপু-

মভীঃ

মহতাপ্যারীর স্বনামি সহ কর্যাক্ষিকচরঃ।

করং বাহুব্যাঃ পিপিহি বহিঃসর্গস্তমধরং

নরং তদ্যবেশানবধূকরং হতাসং পলু কৃতী ॥

এ বড় সহজ ভাব নয়। যে ভাবে
ভোর হইলে মাছের চিত্রসংঘমে পাখি
বিকলবদন হয়, ও সেই ভাব। ছয়ত
এখন সেই ভাবে ভোম। কিন্তু এখনি
ঐহায়ে সেই সমীকরণের সম্মুখীন হইতে

হইল, শুধু তাই নয়। তাঁহাদের সুখ
সিক্ত অমুরগালে তাঁহাদের কাছে পমিতে
হইল। এমন অবস্থায় পড়িলে সে কখন
ভাব ভরিয়া উঠে, না কমিয়া যায়?
প্রিয়দ্বন্দ্বা পলু কহাছেন কি হইয়াছে—

“হলা অননুয়া কোণে কৃষ্ণ এগো রূপ

গাহগুণ্ডারাকিরা

মহতঃ আলবক্তা পতন্তদাক্ষিণ্যং বিতথা-

রেদি।

এবার কান্দনাম

ইতিমতঃ ব্যক্তি কি এই, বকম

প্রভামদ গাহগুণ্যবিপূর্ণ সুখ-ভাব হইয়া

থাকে? ধন্য ছয়তের চিত্তসংযম, বন্য

ঐহায় আশ্রয়। এখনও কিছ দৈর্ঘ্য

ব্যব বাকি আছে। পাঠক। অতিজ্ঞান

শকুন্তলের ততীয় অঙ্কটি মনে কর।

শকুন্তলা অশক আগার জলিয়া মাইতে-

ছেন। তিনি বলিতেছেন যে সেই

বহুপুরুষকে না পাইলে আমি জীবনায়

করিব। ছয়ত অনলপূর্ণ মনে এই সকল

দেখিতেছেন এবং শুনিতেছেন, এত

শান্ততার পর মিলন হইল। কিন্তু মিল-

নের সুখস্থান করিবার উদ্যমহায়ে

শকুন্তলনসমাগমার্থায় শকুন্তলাকে স্থান-

জরিত হইতে হইল। তখন ছয়তের

কি অবস্থা? তখন তিনি প্রজলিতাশঃ

করবে প্রতিনিঃখানে স্নানল শাসিরা

ফেলিতেছেন। সহসা “রাক্ষসপোড়িত

তাগসগণের ভ্রমাস্তবর শ্রবণ করিলেন।

শ্রবণ করিয়াই—“ভো ভো তপস্বিনো

মাইটে মাইটে অঘনহর্ষাৎ এন—

এই আশাসনাবা ছিরগুণীরধরে উজ্জ্বল

কবিত্তে করিতে নাক্ষসবধে নিম্নাঙ্ক হই-
 লেন। যেন শকুন্তলার মামণ্ড জ্বলন
 নাই। যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই।
 আশ্রয় পুত্র।

এই অদ্ভুত ঘটনাটি কি কিং বিবেচনা
 করিয়া দেখিলে দুঃস্বপ্নচরিত্রের প্রোক্ষ-
 ভিত্তি, অসম্ভব বিস্তার এবং অনুসৃত শতী-
 রতা বুঝিতে পারা যায়। তখন বুঝিতে
 পারা যায় যে ধর্ম্মাহরণ এবং কর্তব্য-
 জ্ঞানই সেই আলৌকিক চরিত্রের মূল-
 ভিত্তি এবং প্রবল উপাদান। তখন
 বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মপালন এবং
 কর্তব্যসাধনের কাছে দুঃস্বপ্নের বিবেচনায়
 আর কিছুই কিছু নয়—তিনি নিজেও কিছু
 নয়, তাঁহার শকুন্তলাও কিছু নয়, তাঁহার
 নিজেও কিছুই কিছু নয়। তাঁহার ধর্ম্ম-
 জ্ঞান তাঁহার প্রতিনিঃস্বাসে সুমিষ্ট মুগ্ধমল
 গলনযাবুর ন্যায় নির্গত হয়। স্ববিশেষের
 সন্তোষার্থ মুগ্ধাভরণে নিবৃত্ত হইয়া দুঃস্বপ্ন
 মহর্ষি কণের পবিত্র আশ্রমে অবশ্য করি-
 তেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দক্ষিণবাহু
 স্পন্দিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

‘‘আরে শান্তমিতমাশ্রমপদং ক্ষুরতি চ

বাহু কুতঃ কলমিহাস্যকং।

অথবা ভবিতবান্যঃ ভবন্তি দ্বারানি

সকীত্র।’’

আরে শান্তমিতমাশ্রমপদং—তিনটি কি
 চাপটি বই কথা ন্যা; কি দ্ব দ্বনির্নে
 প্রাপ্তি হুড়াইয়া যায়। মনে হন যেন
 আমরায় সেই শান্তিবাজে প্রবেশ করি
 তেছি। মনে হয় যেন সেই পবিত্র শান্তিমগ

তপসাশ্রম এবং দুঃস্বপ্নের প্রলভমান একই
 পার্থক্য। তাই প্রবেশ করিয়াই সগী-
 ত্রকে দেখিলেন—তাঁহার তপসোপ-
 দেগৌ-বন্ধন-পরিধানা—মলিমুচ্চা-বিহীন।
 —মহামলাধর এবং অঙ্গরাগবজ্রিত।
 জগদ্ব রাহা; ভারতের যনিমণিকার মক-
 লই তাঁহার; তাঁহার অঙ্গপূর মণিমানি-
 কোর জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। তিনি
 একবার মনে করিলেন, এ ঠিক হয়
 নাই। মনে করিয়াই আবার ভাবি-
 লেন—

সরমিজসমুদিকঃ শৈবলেনাপি বসঃ
 মলিনমপি হিমাংশোল্লভ লক্ষ্যাতনোতি।
 ইয়মধিক্যনোজ্য বন্ধলেনাপি তথা
 কিমিব হি মধুরাণং মণ্ডনং নাকুতীনাং।
 কতিনমপি মুগ্ধাংগা বন্ধলঃ কাস্তুরপং
 ন মনসি কুচিভঙ্গঃ সরসপাদ্যদধতি।
 বিকচসরসিছায়াঃ স্তোকনিম্বককণ্ড
 নিছমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং বৃন্তজালং॥

কি মনোহর জ্ঞান! কিলা স্মৃতিসমুদ
 কল্পনা! কি ন্যায়পরিচয় জগদ। মৌলিকা
 নিজেই সূক্ষর—তাঁহার আবার পরিচ্ছদ
 পারিণাটা কি? এ কথা কল্পনের মুখে
 শুনা যায়? এ কথা কে না বলে, যে
 মৌলিকের অবমাননা করে। এ কথা
 যে বলে সে মৌলিকের বাহ্য প্রাপ্ত
 তাঁহা মৌলিককে দেখে, তাঁহারই কৃতি
 মনোবর্ষমূলক; সেই মৌলিকের সূক্ষর
 কণাবাহার করিতে সক্ষম হয়। দুঃস্বপ্ন
 একজন হিন্দুরাজা; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার
 অগাধ ভক্তি। আশ্রমপ্রবেশকালে তাঁ-
 হার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল এবং

তিনি হিন্দু বনিয়া তাহাতে ভবিতব্যতার কথা মনে করিলেন। পরক্ষণেই বাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মতন শাক্তভক্তের মনে সহজেই এমন ভাব জন্মিতে পারে যে বুদ্ধি সেই ভবিতব্যতার স্বত্বপাত হইতেছে। আবার শুধু দেখা নয়। বাহা শুনিলেন তাহাও সেই ভবিতব্যতার প্রতিপোষক। বাহা শুনিলেন তাহাতে বুঝিলেন যে শকুন্তলা তপস্বিনীর ন্যায় কাল কাটাইবেন না। তখন মনোদর্শী তাহার ধর্মসংস্কারকে দুর্ভীড়ত করিয়া তুলিল এবং ধর্মসংস্কার মনোদর্শীকে প্রশংস দিতে লাগিল। তখন তাহার স্পৃহা জন্মিয়া ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু সে স্পৃহা এখনও মিলনস্পৃহারূপে পরিষ্কৃত হয় নাই। কেবল সৌন্দর্য বোধেই মিহিত রহিয়াছে। দুঃস্থ ভাবিতেছেন—

“অবিতথ মাহ প্রিয়বদা। তথাহুয়াঃ—
অধবঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপাশু
কারিণো বাহু।
কুণ্ডলমিব লোভনীরং যৌবনমঙ্গল
সরঙ্গম্॥

তার পরেই শুনিলেন শকুন্তলা চুত-
বর্ণাশ্রিতা কুম্মমিতা সহকারলতাটিকে
দেখিয়া বলিতেছেন—

হথা রমণীশু কথু কাণো ইমঙ্গ পাদ-
মমিত্তমঙ্গ। বদিকরেন্দ্রকো ঘ্রোণ বব
কুম্মমজোষণা গোরাগিঅ অঅংপি বহ

ফলদাঃ উঅভোষবপুয়ো সহআরো।
ফলদে হৃদয়ে মিলিয়া গেল। কঠিতে
ফলিতে মিলিয়া গেল। ভাবে ভাবে
মিলিয়া গেল। কিন্তু একটি বিষয়ে মিল
হইল না। শকুন্তলা সহকারলতাটির
আশ্রয়লাভের কথা বলিয়াছিলেন; তদন্ত
শকুন্তলার সম্বন্ধে সেটা এখনও বলেন
নাই এবং বলিতেও পারেন নাই। দুই
প্রিয়বদা সেই অজাবটি শ্রুতাইয়া দিল।
দুঃস্থ বুঝিলেন যে শকুন্তলা অভিশা-
বতী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি আত্মদে
আটখানা না হইয়া চিন্তিত হইয়া পড়ি-
লেন। ভাবিতে লাগিলেন বুদ্ধি শকুন্তলা
কণ্ঠস্থিত—ত্রাকলী, তাহান মহিত শকু-
ন্তলার মিলন হইতে পারিবেক না।
বেমম অভিশাষ বলবতী হইয়া উঠিল
অমনি ধার্মিকের ধর্মচিন্তা উদয় হইল।
এইখানে সূচতুর মহাকবি জগদ্বিখ্যাত
ভ্রমর-তাড়না ঘটনাটী সংগোষণা করি-
লেন। সে ঘটনাটির অর্থ—শারীরিক
মিলন, শারীরিক সংযোগ। অভিশাষী
যমকে মাতাইয়া তুলিতে হইলে ইহান
আপেক্ষা সূকচিসমস্ত অথচ বলবৎ কৌ-
শল অবলম্বন করা যায় কি না সন্দেহ।
দুঃস্থের বিচলিত মন আরো বিচলিত
হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে
শকুন্তলার জাতি এবং উৎপত্তিস্বয়ং
সন্দেহ আরো বলবৎ হইয়া উঠিতেছে।
বোধ হয় দুঃস্থের ধর্মসংস্কার এবং

* অতঃপরোপাদিত বস্তু দেখিয়া মনে অনুরাগের সঞ্চার হওয়া সর্ব্ব মনোদর্শী
শব্দ ব্যবহার করিলেন।

জান্নাসংঘম শক্তি কম হইলে সেই দণ্ডেই
পাখি ভগ্নাশ্রম প্রলুপ্ত হইয়া যাইত।
তার পর সকলের একত্রে বসিয়া কথো-
পকথন। তখন দুয়ন্ত শকুন্তলার দুস্তা
জনিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া-
ছেন। প্রিয়ধন। তাঁহাকে কণের অভি-
প্রায় জানাইয়াছেন। জানিয়া তাঁহার
হৃদয়ের ভীষণ মোচন হইয়া গিয়াছে।
তিনি তখন সাহস পাইয়াছেন, তাঁহার
স্বায় বুলিয়াছে যে—

আশঙ্কনে যদ্যপি তদিসং পশ্যামং রজন।

এমন সময় প্রিয়ধনর কথায় শকুন্তলা
রাগ করিয়া, 'সব বলিয়া দিব' বলিয়া
গৌতমীর কাছে যাইতে উদ্যত হইলেন।
দুয়ন্তের হৃদয় আকুলিত হইয়া শকুন্ত-
লাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে বলিয়া যেন
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তখনি আবার
সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে
ভাবিলেন—

অহো চেষ্টাভ্রষ্টপীণী কানিজনচিতবৃত্তিঃ।

অহং হি।

অনুমানানুতনয়ঃ সহসা বিনয়েন

বারিত্ত প্রসন্নঃ।

অহানাদচলয়গি গণেশঃ পুনঃ প্রতি-

নিবৃত্তঃ।

দুয়ন্ত শকুন্তলার মন বদ্বিগ্না থাকুন
আর নাই থাকুন, শকুন্তলার উপর এ
পর্যন্ত তাঁহার কোন অধিকার অগ্নে
নাই। তিনি গমনোদাতা শকুন্তলাকে
প্রতিনিবৃত্ত করিবার কে? যে রকম
কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে, তাহারই শকু-

ন্তলাকে চক্ষের আড়াল করিতে ইচ্ছা
হয় না বটে, কেন না দেখিয়া জনিয়া
হৃদয় ভাবনাক আবেগবান হইয়া উঠি-
য়াছে। কিন্তু সে হৃদয় তাঁহার; শকুন্ত-
লার তা নয়। দুয়ন্ত সর্বগুণসম্পন্ন—
দুয়ন্ত প্রকৃত উন্নতমনা—দুয়ন্ত ধর্মবীর।
তাঁহার হৃদয়ের বলা তাঁহারই হাতে।
সেই হৃদয়ের অশিষ্ট উদ্যম সেই হৃদয়েই
নিঃশেষিত হইয়া গেল। পানথেকে চূণ-
টুকুও থসিল না। ধন্য দুয়ন্ত! ধন্য
জান্নাসংঘম!

তার পর বিদূষকের সহিত কথা।
মেকালের বিদূষক মেকালের রাজাদের
'উয়ার'। রাজাদিগকে সর্বদাই রাজ-
ঠাটে থাকিতে হইত; মনের কথা সক-
লের কাছে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু
বিদূষকের কাছে ঠাট্‌ভাট থাকিত না;
প্রাণের কথা প্রাণ ভরিয়া বলিতেন।
সাধবা হুয়াস্তকে যেন কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার
উদ্দেশ্যে বলিলেন—

ভো জজমা তবস্ত্রিধরা অগন্ততথগীরা

তা কিং তাএ দিচ্চমাএ।

অমনি দুয়ন্ত যেন বিবধরদংশিতের
নায় সম্মপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠি-
লেন—

বিশুর্ষ।

নিবাসিত নিমেষাতি নৈতৎপংক্তিভিক্খুয়া।

নবামিন্‌কলাং গোকং কেন ভাবেন

পশাতি ॥

ম চ পরিহার্যো বস্তমি দুয়ন্তস্য মনঃ

প্রবর্ত্ততে ॥

তার পর রাজা পূর্বদিনের সকল কথা মাথাকে বলিলেন। বলিয়া গিয়া জামা করিলেন—বল দেখি, মাথবা, কি জটিল। কবিয়া সেই আশ্রমে যাই। মাথবা বলিলেন কেন, আমার প্রাণ-মুঠাংশ-চাই, এই বলিয়া যাত। তদন্ত ক্ষতপঙ্খীরহরে বনিয়া উঠিলেন—

মুখ! অন্যসেপ ভাগধেরমেতে তপাবিনো
সে নিরুপস্থি যো বহুমানীনপি বিহারা-

হতিনন্দাতে। পথা—

যজ্জিহ্বতি লবেভ্যো নৃপাণাং ক্ষসি তক্ষনম।
তপঃ স্বত্ভাগমক্ষমাং নদতারণাক।

হি নঃ ॥

কি মস্তীক, কি মুক্তির ধর্ম্মভাব! কি মনোহর ধর্ম্মভাব!—যে শকুন্তলার নিমিত্ত স্বপ্ন দগ্ন হইয়া বাইতেছে, সে শকুন্তলাও এই ধর্ম্মভাবের কাছে কিছুই নয়! শকুন্তলা যতই কেন প্রিয় হইন না, তা বনিয়া কি তাঁহার জন্য পবিত্র ধর্ম্মের অবমাননা করিতে হইবেক? তা বলিত। কি ধর্ম্মকে প্রেমের কুটিলকৌশলে পরিণত করিয়া দুঃশাস্ত করিতে হইবেক? নিদ্রাকের কাছেও এ কথা বলিতে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব হয়।

তার পর কয়েকজন তপস্বী আসিয়া হৃদয়কে রাফমককৃত আশ্রমণীভার লক্ষ্য দিলেন। হৃদয় তাঁহাদিগকে অভয় দান করিয়া বর্ণনাজ্ঞা করিবার আজ্ঞা দিলেন; বর্ণনাজ্ঞিত হইল। এসম সময়ে রাজধানী হইতে খাতুনজা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারই কল্যাণার্থ

রাজমাতা ব্রত করিবেন, কতএব তাঁহাকে যাইতে হইবেক। হৃদয় গম্ভীর পড়িলেন। অস্বপ্নে যেমন দামনীর রাজমাতাও তেমনি দামনীর। "কি জগদ্বিনাশ কার্য্যামিতো শুকজনাজ্ঞা উত্তর মনস্তিক্রমণীয়াং।" তিনি জানিতেন যে রাজমাতা মাথবাকে বরাবর পুত্রবৎ ভালবাসেন। অতএব সেই এবং ভক্তি-পূর্ণ মনে মাথবাকে রাজমাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। করি একটি কোশলে তাঁহার আধ্যাত্মিক একটি প্রবান উদ্দেশ্য মাথব করিলেন এবং তাঁহার হৃদয় যে কাহারও প্রতি কষ্টবাবিযুগ নন, তাহাও সুন্দররূপে দেখাইয়া দিলেন।

হৃদয় রাজা। কিন্তু কালিদাস কি তাঁহার রাজকাণ্ডের কথা কিছুই বলেন নাই? সে কথাটি না জানিলে ত কিছুই জানা হইল না। তিনি মুনিমুখিকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন; পিতৃভাতার তার শুকজনকে ভালবাসেন এবং সম্মান করেন; তিনি চিত্তমংগলে ভ্রমিতদল; ধর্ম্ম সেবা একাগ্রচিত্ত; অগ্নয়ে বিজ্ঞাননা; শত্রুনাশে অসীমবিজ্ঞান; শত্রুপালনে কষ্টমহিমু। কিন্তু তিনি রাজকাণ্ডে কিঞ্চিৎ? কালিদাসে তাহাও আশ্রমণীকে বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যে প্রণালীতে বলিয়াছেন সেটি কি চমৎকার। কল্পকী পার্শ্বহারন, অক্ষয়নাগা শিবাবমরী ভাসা-শাব নদীর, রাজনরকারে থাকিয়া ব্রত হইয়াছেন। যে বাট হৌবনে কেবল তাঁহার শুভ পদমৌ চিকুরূপ ছিল

সেই যষ্টি এখন তাঁহার অঙ্গের নড়ী
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যষ্টির সাহায্য
ব্যতিরেকে এখন তিনি পদশালনে
অক্ষম। তিনি যে শুধু দুঃস্থকে দেখি-
তেছেন এমন নয়। দুঃস্থের পিতা,
পিতামহ, হয় ত প্রপিতামহকেও দেখি-
য়াছেন। দুঃস্থ তাঁহার কাছে কালিকার
ছেলে বই নয়। শাদ্রব প্রভৃতি রাজ-
প্রাসাদে আসিয়া রাজদর্শনের প্রার্থনা
জানাইয়াছেন শুনিয়া বুদ্ধ বহুদর্শী ক-
প্তকী ভাবিতেছেন—যে প্রজাবংশল নর-
পতি রাজকর্ধ্যাকরত পরিশ্রান্ত হইয়া
এইমাত্র অবকাশলাভ করিলেন, আমি
কেমন করিয়া তাঁহাকে এখনি ঋষি-
কুমারদিগের আগমনসম্বাদ দিব। কি
নৈহ। পিতাও সন্তানের ক্রেশে এতদূর
কাতরতা প্রকাশ করেন কি না স-
নৈহ। দুঃস্থের প্রজাপালনকার্য্যাত্ম-
রাগের ইহার অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ
পাওয়া বাইতে পারে না। কিন্তু কবি
ইহার অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ দিয়া-
ছেন। বুদ্ধ কপ্তকী একবারমাত্র স্বেচ্ছা-
ক্রমে হইয়া পরক্ষণেই জপুটচিহ্নে বলিতে-
ছেন—

“অথবা কুতো বিশ্রামো লোকপালা-

নাং।”

তিনি কি রকম রাজ্যবাহার কৰ্ম্মচারীর
এত কৰ্ত্তব্যনিষ্ঠা—এত রাজনীতিজ্ঞতা
—এত সাহস ও দূততাপূৰ্ণমন? কপ্তকী,
তুমি যথার্থই অল্পপন রাজার অল্পপন
কৰ্ম্মচারী। বুদ্ধবর! তুমি দুঃস্থকে ‘কচি

ছেলে’ বলিয়া ‘মাণ’ করিবার লোক নহ।
তুমি যখন দুঃস্থকে এত ভালবাস, তখন
দুঃস্থ যথার্থই সমস্ত অগতের ভালবাসার
পাত্র এবং পৃথিবীর রাজাদিগের আদর্শ-
হল।

দুঃস্থ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া-
ছেন। শকুন্তলা দুর্কাসাকর্ষক শাপগ্রস্ত
হইলেন। অবশিষ্ট আধ্যাত্মিককে দুই
ভাগে বিভক্ত করিতে হইবেক। শাপো-
চ্যারণ হইতে অসুদীর্ঘক পুনঃপ্রাপ্তি
পর্য্যন্ত একভাগ; অসুদীর্ঘক পুনঃপ্রাপ্তি
হইতে দুঃস্থ-শকুন্তলার পুনর্মিলন পর্য্যন্ত
আর একভাগ। কি জন্য এইরূপ ভাগ
করিতে হইল, বুঝাইতেছি।

দুর্কাসা বলিয়াছিলেন যে, দুঃস্থঅবস্থ
নিদর্শনটি দেখিলে তাঁহার পদতলকে
মনে পড়িবে, নতুবা মনে পড়িবে না।
শকুন্তলা সেই নিদর্শনাসুদীর্ঘক হারা-
ইয়া ফেলিলেন, কিন্তু জানেন না যে
হারাইয়াছেন। এ ঘটনার যে কি
চমৎকার অর্থ তাহা পরে বলিব, এখন
নয়। অসুদীর্ঘক হারাইয়া শকুন্তলা
তাঁহার পবিত্র বিশ্বনামোত্তরকারী রূপরশি
লইয়া দুঃস্থের সমুখে দাঁড়াইলেন।
পাঠক! তোমাকে এইখানে একবার
সেই বজ্রলপরিধানী, কুহুমিতবৌবনা,
পবিত্রনয়না, লতামৃগামৃগাগিনী, আগ্নে-
বাসিনী তাপমবাসনার রূপরশি মনে
করিতে হইবেক। যে রূপরশি দেখিয়া
দর্শনার্থীরা নৃপসু সোদন দুর্নিবারশরবিজু
হইয়াছিলেন, সেই রূপরশি একবার

* দুঃস্থ শব্দটি দেখ।

মনে করিতে হইবেক। সেই রূপরাশি
এখনও সেই ছয়স্তরের নয়ন মন বিমুক্ত
করিতেছে।

“অয়ে অজ।

কেনমবগুণবস্ত্রী নাতিপরিপূর্ণশরীর-

ব্যবস্থা।

মধ্যে তপোবনানাং কিলমমিব পাণ্ডু-

পত্রাণাম্ ॥”

তবে কেন তিনি এখন সেই রূপরাশি-
সম্পন্ন শকুন্তলাকে অস্পর্শনীয়্য বলিয়া
প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? শাপপ্রভাবে
তিনি শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন
বটে; কিন্তু যে চক্ষু সেদিন শকুন্তলাকে
দেখিয়া তাঁহার মনকে উদ্ভত করিয়া-
ছিল, আজও ত তাঁহার সেই চক্ষু, সেই
মন রহিয়াছে। তবে কেন আজ শকু-
ন্তলা তাঁহার কাছে কৌশলকুটিল্য
অস্পর্শনীয়্য বলকিনী হইয়া দাঁড়াই-
য়াছেন? কৈ, দেখানে আর বাহারা
আছে তাহারা ত অবিচলিতচিহ্ন নয়।
প্রতীহারী শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্ত রূপ-
রাশি দেখিয়া ভাবিতেছে—

অগ্নৌ ধম্মাবেকখিণো কুট্টিপো ঈদিলং
নাম সুহোবরণং ইত্থিচ্ছারঅণং

পেক্ষিয় কো অহো বিহারেদি।

দৃশ্যস্তও সেই রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ—
ইদমুগুনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং ন্যাসবেতাধাবসান।
ক্রমর ইব নিশাশে কন্দমস্তস্তমারং
ন পদ্যমাদিন্দ্রকোণে নাপি শকোহি

মোকুম।

তিনি মনে মনে অনেক ভাবিয়া দেখি-
লেন; কিন্তু তাঁহার মনে হইল না যে
শকুন্তলা তাঁহার। তিনি শকুন্তলাকে
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন
কোমলতাময়ী শকুন্তলা চরণদলিত কনি-
নীর ন্যায় বিবমর ব্যাক্য তাঁহাকে দংশন
করিতে লাগিলেন; তখন অগ্নিস্থানিকবৎ
অধিকমাত্রা তাঁহার উপর শাপাদি বর্ষন
করিতে লাগিলেন। অধিকোপাননে যে
কি ভয়ানক পদার্থ দৃশ্যত তাহা বিবক্ষণ
জানেন। তিনি নিজেই সেদিন মাথা
ব্যকে বলিয়াছেন—

শনপ্রধানেন্মু তপোবনেষু

গুঢ়ং হি দাহ্যক মাত্ত তেজঃ।

স্পর্শাচ্ছকুলা অপি স্থল্যাকান্তা-

স্তে অনা তেজোহভিবাদহস্তি।

আজ সেই গুচনিহিতানল প্রজ্জ্বলিত হু-
ইয়া তাঁহাকেই দগ্ধ করিতে আসিতেছে।
কিন্তু আজ তিনি যে কোপানলকে ভয়
করিতেছেন না। কেন, তিনি কি ভয়
যে দৃশ্যস্ত নয়? তাঁহার চিরজাত গুরুজন-
গৃহভীতিসত্ত্বম সকলই কি বিলুপ্ত হইয়া
গিয়াছে? তা নয়। সে সকলই তাঁহার
আছে; কিন্তু গুরুজন আজ তাঁহাকে
ধর্ম্মের বিপর্যায় করিতে বলিতেছেন।
গুরুজন আজ তাঁহাকে পরস্রী গ্রহণ ক-
রিতে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি
ধর্ম্মবীর; তিনি ভাবিতেছেন, যেখানে
ধর্ম্মের বিপর্যায় সেখানে দুর্ব্বনমোহিনী
রমণীও তুচ্ছ, অগ্নিও তুচ্ছ নহা ধর্ম্মও তুচ্ছ।
কি ধর্ম্মাহরণ! কি চিত্তসংযম! অতুল

ক্লপরাশি-তীহার অমুগ্রাহকাজ্ঞী। লইবে,
কেহই তীহার কিছু করিতে পারে না,
কেহই তীহাকে কিছু বলিতে পারে না।
দূষিতচিত্ত হইলে তিনিও লইবেন।
প্রতীহারী যথার্থই বলিয়াছিল—

আম্মো ধম্মাবেকুণ্ণিণো ভট্টিণো বৈদিসং
নাম সুহোপননং
ইত্থিচ্ছারলংগং পেকুণ্ণিখ কো অগ্গো

বিম্মারেনি।

দ্রুম্যন্তের প্রথম পরীক্ষা শেষ হইল।
সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইলেন।
সেই জয়ে কালিদাসেরও জয়। কালি-
দাস ভারতের ব্রাহ্মণ। ভারতের ব্রাহ্মণ
হইয়া তিনি দেখাইলেন যে ধর্ম্মের কাছে
ভারতের ঋষিতপস্বীও কিছু নয়। কালি-
দাস, তুমি ভারতের ব্রাহ্মণ নও—তুমি
জগতের ব্রাহ্মণ!

দ্রুম্যন্ত পুনরায় নিদর্শনাম্বুরীয়কটি দে-
খিলেন। দেখিয়া তীহার সকল কথা
মনে পড়িল। তখন আর একপ্রকার
পরীক্ষা আরম্ভ হইল; কিন্তু এ পরীক্ষাও
বড় সহজ পরীক্ষা নয়। শকুন্তলার কথা
মনে হইয়া তীহার মন অল্পতাপে দগ্ধ
হইতে লাগিল। যে বকন নিষ্ঠুরভাবে
তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া-
ছেন, তাহা মনে করিয়া, তীহার হৃদয়
কাড়িয়া ধাইতে লাগিল। তীহার জীবন
যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দিবারাত্রির
মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তীহার শান্তি
নাই। তিনি সপ্নদাই প্রজ্জ্বলিত চুন্নীর
ছায় অল্পতাপিনলে দগ্ধ। তীহার

স্বাভাবিক আনন্দ আহ্লাদ আর তী-
হাকে ভাল লাগে না। তিনি বসন্তোৎসব
বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। রাজভক্ত রাজমঙ্গ-
লাকাজ্ঞী কল্মকীর ছায় রাজকর্ম্মচারী-
দিগের প্রতিও যেন অশ্রদ্ধাবান হইয়া
উঠিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া
বুদ্ধ কল্মকী যার তার কাছে বলিয়া
বেড়াইতেছেন—

রম্যং দ্বেষ্টি যথাপূর্বা প্রকৃতিজিন্ প্রতাহং

সম্যাক্তে

শয্যোপাস্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্মান্নিঃ এবং

ক্ষণাঃ।

দার্কিণ্যেন সমাতি বাচম্ভুচিভামন্তঃপুরে-

স্তোয়া বদা

গোত্রেশু খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়া-

বনম্ভাশ্চিরম্ ॥

ভাবিয়া ভাবিয়া দ্রুম্যন্তের শরীর ক্লশ
হইয়া পড়িয়াছে; তীহার গম্ভীর প্রভা-
ময় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; তীহার
তীক্ষ্ণজ্ঞান চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।
দেখিলে মনে হয় দ্রুম্যন্ত আর সে দ্রুম্যন্ত
নাই! সেই পবিত্র আশ্রমে দ্রুম্যন্ত যেমন
তীহার শকুন্তলার যন্ত্রণাদগ্ধ দেহখানি
দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আজ বুদ্ধ কল্মকী
দ্রুম্যন্তের অল্পতাপদগ্ধ দেহস্তম্ভ দেখিতে
দেখিতে পুত্রবৎসল পিতার ছায় কাতর
মনে ঠিক তেমনি বলিতেছেন—

প্রত্যাদিষ্ট বিশেষমগুনবিমি বামপ্রকোষ্ঠে

সমং

বিভ্রংকাক্ষনমেকমেব বলয়ং শ্রাসো-

পরস্তাপং।

চিত্তাধারণ প্রত্যাহনদ্বন্দ্বেন্দ্রোক্ষগৈরা-

অন্য

সংস্কারোজিগিতো মহানুশিরিব ক্ষৌণেহপি
নালক্ষ্যাক্তে।

এই শোচনীয় অবস্থার আর জন্মস্থ
প্রাণোদ্যানে প্রভীর চিত্তানিগম। বুদ্ধ
কক্ষকী সকলই জানেন, সকলই বুঝেন।
কিন্তু তখন পুরুষাংশের চক্ষুনি দেখিয়া,
অসংখ্য ভারতবাসীর চক্ষুনি দেখিয়া,
অসাকুলিত-বাৎসল্যাপূর্ণ মনে তিনি ভাবি-
তেছেন—বুঝি একটু ‘খেলাছুলা’ করিলে
জন্মস্ত কিছু ‘আনমন’ হইবেন। এই
মনে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁ-
হাকে বিলাসভূমিতে যাইবার নিমিত্ত
আহ্বান করিলেন। অশীতিবর্ষীয় পলিত-
কেশ্য কুলকর্মচারীর মুখে এরকম কথা
শুনিলে, বিরহকাতর বুঝা পুরুষের কি-
ঞ্চিৎ লজ্জিত হইবার কথা। বোধ হয়
সেই জন্ম বুদ্ধ কক্ষকীকে কিছু না বলিয়া,
জন্মস্ত বেজবতীকে সম্বোধন করিয়া কহি-
লেন—

বেজবতী! মদ্বচনানিহাতাপিশুনং
জহি অন্য চিবপ্রবোধার সম্ভাবিত মপ্তা-
ভিধক্ষ্যাসন মধ্যাসিতং হং প্রতাবেক্ষিত
মার্কশন পৌরকার্য্যং তৎ পত্নমারোপ্য
প্রতাপ্যহানিহি।

এত মাননীয়, এত সম্মানেও জন্মস্ত
রাজকার্য্য ভুলেন নাই। এত ক্রিষ্ট
মানেও তাঁহার বিচারকার্য্য পর্যালোচনা
করিবার ইচ্ছা কত বলবতী! এত অনল-
দগ্ধ হইয়াও জন্মস্ত অস্বাভাবশেষ হন নাই।

তার পর সেই মনপ্রাণহারী চিত্ত দর্শন।

চিত্ত দেখিতে দেখিতে জন্মস্ত উন্মত্ত
হইয়া উঠিলেন। চিত্তিত্ত শকুন্তলাকে
তাঁহার জীবনমগ্নী শকুন্তলা বলিয়া বোধ
হইতে লাগিল। চিত্তিত্ত মনরটীকে
সেই আশ্রয়দৃষ্ট ভ্রমর বলিয়া বোধ হইতে
লাগিল। তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া
গেলেন। তিনি স্থানজ্ঞানশূন্য হইয়া
পড়িলেন; তিনি কালজ্ঞানশূন্য হইয়া
পড়িলেন। এমন যাম্যে বেজবতী
আসিয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যের সম্বাদ
দিলেন। অমনি, যেন তাঁহার কিছুই
হয় নাই, এইরূপ হিরণ্যস্তীর ভাবে তিনি
কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রদান্য-
ভোর ভ্রমসংশোধন করিয়া ধর্ম্মনগ্নত
বিচার করিয়া দিলেন। শুধু তা নয়।
সেই অপূত্রক মৃত বনিকের সম্পত্তি
উত্তরাধিকারিণী নিকপণোপলক্ষে তিনি
সমস্ত প্রাণাণের মঙ্গলার্থে ‘সেইহান্
পিতার ভাষ্য এই স্বেহপূর্ণ আজ্ঞা প্রচার্য্য
করিলেন—

যেন যেন দিযুজ্যন্তে প্রাণাঃ স্নিহেন বন্ধুনা।
স্ সপালাদৃতে ভাষ্যং জন্মস্ত ইতি ধুবাভাম।
আজ্ঞা লইয়া বেজবতী চলিয়া গেলেন।
তখন জন্মস্তের অপূত্রকাবস্থা অরণ্য হইল।
স্মরণ করিয়া তাঁহার মন পূর্ণাণেপক্ষ্য
বরণারব হইয়া উঠিল। জন্মস্ত কর্তব্য-
নিষ্ঠ এবং ধর্ম্মভীক। তাঁহার পিতৃপুত্র-
মিগের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের
পবিত্রাত্মার শোচনীয় পরিণাম মনে
হইল। তিনি যত্নাবিস্ময় হইয়া নৃক্ষি-

এত কাঁদি তবু কেন না জড়ায় প্রাণ রে ?

১

এত কাঁদি তবু কেন না জড়ায় প্রাণ রে ?

কেই মন সেই আশা,

কোনো মন সেই আশা,

এ যাকনা ভবে, কতক কুসংসারী জীবনে ?

জীবনই পালকি,

হাশিমের ভাব মরি,

জুগের জীবন মোর জুগে কি রৌননে ?

মধ্য বায়ু-অভিব্যক্তি,

নিবিড় কানন-জাত,

বিস্তৃত গ্রন্থ-মন জ্বার রে বিজনে,

সাম্প্রদায়িক আশা,

বক্তব্য ভালবাসা,

এ শুক জীবনে মোর কবিবে কি তেননে ?

২

কেনে বেন উঠে পাল আশ্রিতা থাকিয়া,

জীবনের জুই হীর পেছে বেন ভাঙ্গিয়া ;

ধুব করে চারিগার,

শুভ যেম এ নংদার,

হাসি পেলি সে যাকনা তবু উঠে জাগিয়া,

আশা নাই, তবু সে যে প্রাণে আছে নিশিয়া

৩

এ কি পুঙ্খমুখ মন—যুবক জ্বর ?

এ কি জীবনের ব্রত—জীবের আশ্রয় ?

হেরি কুহকের ছায়া,

অরি স্বপনের মারা,

শিশুর হাসনা-সম আশা উল্লস,

এতই প্রাণ কিরে মানব-জগৎ

৪

সকলি স্বাক্ষর—তবু পারি না মেতুনিতে,

জড়ান বাতনা চিত্তে নাহি পারি ধূলিতে,

জগৎ যে ছবি আঁকা,

নরনে সে রূপ দাণ্ডা,

শরনে, যখন সে—আবনা, সে স্বহিতে ;

এ পরাণে তার আশা পারি না যেতাজিতে

৫

ছুখ পাই—পাব ছুখ, তবু তাতে ভাবিক,

আঁরি গোড়ে—গুড়ে যাক, তবু তাতে হেরিব,

এই বিশ্বাসের রাশি,

আমি বড় ভালবাসি,

এ জীবনে চিরদিন তারি জুখে কাঁদিব।

অস্তিতে তাহারি জুখে জ নরন মূর্তি।

৬

এ ভাবে সংসারে থাকি হবে না সেনাধনা,

মায়া-মোহ-মেহডোরে ভুলে যাব বাতনা ;

উদাসীন-বেশ পরি,

তারি ছবি বুকে করি,

পথে বাটে হাটে মাটে গাহিব এ দেলনা,

গৃহ-কারাগারে থাকি মব না রে প্রজনা।

৭

পাথের সংসার-হেথা সকলি সে জ্বলনা,

আশ্রয় ভালবাসা সবি স্বার্থ গবনা ;

আমি ভানি অশ্রুধরে,

লোকেতে পাগল বলে,

বুঝাইলে নাহি বুকে যরনের বাতনা ;

মনমত সমজাখী, ছাখী হেথা পারি না।

সে ঘন পাবার নয়—সে আমার হবে না,
এ ছুৎ সবার নয়—এ সীমার হবে না,
যে কদিন বেঁচে রই,
তারি জুখে কেঁদে লই,
নয়িলে—এ আশা কৃষ্ণা কিছুই ত হবে না,
এ ভয় ভাবনে আর অস্ত সাপো হবে না।

৯

কি সূক্ষ্মে মুগ্ধনেও দেখেছিল তাহারে,
কি কৃষ্ণে ভালবাসা দিল না সে আমারে।
হায় লো বজ্রময়ী,
রমণী কি বহুময়ী!
একটা আশ্বাসবাণী একটা আশ্বরে,
এত যাতনামা নাহি কুটিল অধরে।

১০

বেত নাহি দিল আশা—আমি কি তা ছাড়িব
সে পামনা চিরদিন সুকভরে রাখিব।

করিব তাহারি পান,

গাহিব তাহারি গান,

দিগাছি পরাণ তাহে—তারি তরে রাখিব।
অম্বাস্তরে দেখা হলে তারি ছাতে সঁপিব।

১১

বিধাতা রে! এত রূপ কেন দিলি তাহারে?
এত সূখা কেন বিধে! গহনের মাঝারে?

সে না রমণীর মনি?

সেনা পৌষের খনি?

(তবে) কেন সে অমির-সর পাষণের আকায়ে
রজমণ বক্ষ কেন চক্ৰবার আকারে?

১২

আর মিছে তার আশে রহি পাণ ভুবনে,
এ ভবের খেলা-মুলা ফুরাল এ জীবনে।

প্রণয়ের পুরস্কার,

থাকে যদি অভাগার,

এ বোদ্ধন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে,
অম্বাস্তরে পাইব রে সে রমণী-রতনে।

দ্বিতীয়বার বিবাহ।

আমাদের এই প্রস্তাবটা দুইভাগে
বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম,
বিধবার বিবাহ, দ্বিতীয় যুতপত্নীকব্যক্তির
দারাস্তরপরিগ্রহ। পত্নী জীবিতাসময়েও
পুরুষের অন্যত্র গ্রহণ করা যে যুক্তি-
সম্মত নহে তাহা আজ কাল প্রায় সক-
লেই স্বীকার করেন। সুতরাং এখানে
সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়ো-

জন নাই। মর্কপ্রথমে আমরা বিধবা-
বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

আজ কাল পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণের
অধিকাংশেরই মত যে কোন কাণ্ড
ভাল, কোন কাণ্ড নন্দ নির্দোষ করিতে
হইলে “ব্যবহারগোপনগীতার” অনুসরণ
করা কর্তব্য অর্থাৎ তাহাতে সমাজের
উপকার কিম্বা অপকার হয় তাহাই

দেখা উচিত। যে নিয়ম সমাজের
অধিকাংশ লোকের অধিক উপকারে
আইবে, তাহাতে সাধারণের স্বখসুখ
বর্ধিত হয়, তাহাই সমাজমনো প্রচলিত
করা উচিত; তাহার বিপরীত হইলে
তাঁহা প্রচলিত করা উচিত নহে এবং
প্রচলিত থাকিলেও তাহা গ্রহিত করা
কর্তব্য। অতএব বিধানবিবাহ উচিত
কি না স্থির করিতে হইলে দেখা উচিত
ইহাতে সমাজের উপকার কিবা অপকার
হয়, ইহা 'ব্যবহারোপযোগিতার' অনু-
সারী কি না?

আজি কালি বঙ্গবর্ষের রূপরি মাল-
ধনের নাম বোধ করি কোন পাঠকের
অবিদিত নাই এবং সোঁটের উপর তাহার
মতটা কি তাহাও অনেকের জানা
আছে। তিনি বলেন লোকসংখ্যার
আধিকারী সমাজের দারিদ্রের মূল; যদি
দারিদ্র্য দূর করিতে চাও, যদি সমাজ
উন্নত করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি দেশের
প্রাকৃতিকনিবারণের মানস থাকে তবে তা-
হাতে দেশের অধিবাসিগণের সংখ্যা কমে
অথবা তাহার চেষ্টা কর। প্রাণিগণের
অকৃতি এই, যে পারমাণ আহারে তাহা-
দের পর্যাপ্ত হয় তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ
অনুপেক্ষা বর্ধিত হইতে থাকে। ডাক্তার
কুকলিন বলেন যদি জীব বা উদ্ভিদ-
গণ যথেষ্ট জমিতে পাইত তাহা হইলে
বৎসকরহস্ত বর্ষমধ্যে একঘাতীয়া প্রাণী
বা উদ্ভিদ দ্বারা শত শত জগৎ আচ্ছন্ন
হইয়া যাইত। কেবল প্রাকৃতিক বৃদ্ধি

নিয়মে একগুণ হইতে নেন না। যে দেশের
লোকের ব্যবহার বিস্তৃত, যে স্থানে
খাদ্যক্রম প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া
যায়, যে দেশে বালাবিবাহের কোন
প্রতিবন্ধক নাই, যে স্থানে ক্রমবৃত্তাদির
দ্বারা নহন্যাক্রান্তির অকালে বিনামূল্যে
হয়, অথবা বৈধানে অনিরত পরিশ্রম
বা অস্বাস্থ্যকর কার্যের দ্বারা অকালমৃত্যু
না ঘটে দেখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি
এত শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে হয় এবং
শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গত ১০০
শত বৎসর ধরিয়া আমেরিকার উত্তর
প্রদেশে প্রত্যেক ২৫ বৎসরে লোক-
সংখ্যা দ্বিগুণ হইতেছে। কোন কোন
স্থানে ১৫ বৎসর মধ্যে দ্বিগুণ হইতে
দেখা যাইতেছে। সার উইলিয়াম গাট
বলেন যে দশবৎসরমধ্যেও অধিবাসি-
সংখ্যা দ্বিগুণ হইতে পারে।

যেমন মনুষ্যসংখ্যাও ক্রমশঃ বর্ধিত
সেইরূপ দেশের উপরও ক্রমে ক্রমে
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর উৎ-
পাদিকা শক্তি যেরূপ, তাহাতে কৃষি-
কার্যের উপকরণ যেমনই উৎকৃষ্ট হউক
না কেন, সার যেমনই উত্তম হউক না
কেন, খাদ্যসামগ্রীর বৃদ্ধি কখনই কো-
সংখ্যাবৃদ্ধির সমান হইতে পারিবে না।
ম্যালথুস স্থির করিয়াছেন যে, মনুষ্য-
সংখ্যা যদি ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি
অঙ্কের পরিমাণে বৃদ্ধি হয় যার দ্বারা
হইলে আহারক্রম ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই
অঙ্কের পরিমাণে বর্ধিত হইবে। যখন

লোকবৃদ্ধি ৮ জন খাদ্যবৃদ্ধি ৪ জন, যখন লোকবৃদ্ধি ১৬ জন খাদ্য বৃদ্ধি ৫ জন। ইহাতে সহজেই উপলব্ধি হইতেছে যে কালদিনের মধ্যেই লোকসংখ্যা আহার-জীবের অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে, কাজেই দেশে দারিদ্র্য উপস্থিত হয়।

একণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার যে কয়েকটি প্রতিক্রমক আছে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। ১ম, উপযুক্ত অন্নভাবে চর্জিত উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে অথবা উপযুক্ত আহারাভাবে পীড়া দ্বারা বহুলোকে প্রাণত্যাগ করে। ২য়, বৃদ্ধ প্রকৃতি দ্বারা অনেক নরহত্যা হইয়া থাকে। ৩য় বিদেশে উপনিবেশ দ্বারা দেশের লোকসংখ্যা কমিতে পারে। অনেক মনে করিতে পারেন যেমন মনুষ্য জন্মিতেছে আবার তেমনি মরিতেছে তবে সংখ্যা কিরূপে বাড়িবে? বাস্তবিক জ্ঞান অপেক্ষা মৃত্যু কম; ইনগে যে বৎসর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক, সে বৎসরেই জন্মমৃত্যু সমুপাত ১২:১০ এবং ক্রিস্ট ১৯:১০। জন্ম অপেক্ষা ৭৪৫ কম হওয়ার কাজে কাজেই দাকি পড়ে।

মহাসংখ্যা যত বর্দ্ধিত হইবে ততই দেশের দারিদ্র্য বাড়িবে এবং কাজেই আনুষঙ্গিক চর্জিতানি আসিয়া কতক লোকের আশ্রয়স্থান করিয়া আবার খাদ্যের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা সমান করিয়া দিয়া যাইবে। পুনশ্চ যেমন লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া লোকের অধিকতর

হইবে অমনি সকলেরই পুষ্কায়পাদনে স্পৃহা কমিয়া যাইবে। ইহাকেই ইংরেজিতে (Reaction) কহে। এরিকে ম্যালথাসের বিপক্ষেরা বলেন যে লোকসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি তাহার পোষকের দ্বারা নূতন নূতন জমি আবাদ করিয়া আহারজন্য বাড়াইবে; কাজেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না। কোন একটি বিশেষ স্থান লইয়া বিবেচনা করিলে এই কথা যথার্থ হইতে পারে কিন্তু মোট ধরিলে ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে খাদ্যবৃদ্ধি কখনই লোকবৃদ্ধির সমান হইতে পারে না। মৃত্যু নহায়া জন ষ্ট্রাট মিল ও ম্যালথাসের মতের পোষকতা করেন! তৎপ্রদর্শিত বৃদ্ধির পুনরুক্তি এ স্থলে প্রয়োজন কার্য না।

ইতিপূর্বে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির যে কয়েকটি প্রতিক্রমক উল্লেখ করা গিয়াছে তন্মধ্যে ২য় ও ৩য়টি আমাদের দেশে নাই এবং শীঘ্র যে হইবে তাহারও আশা নাই। তবে ১মটি অর্থাৎ চর্জিত ও উপযুক্ত আহারাভাবে অকালমৃত্যু আছে এবং আজ কাণে শ্রীয়াই ঘটতেছে। যে কয়েকটি কারণ লোকবৃদ্ধির অস্বল্প, আমাদের দেশে তাহার অনেকগুলি আছে। একণে জিজ্ঞাসা এই, কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়। মানা ব্যক্তি ইহার নানা উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে অস্বাস্থ্যের

বিবাহ বন্ধ করা সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত । অসম্ভাব্যে প্রাণহান পূত্রের মৃত্যু পৃষ্ঠপোষক দর্শন করা অপেক্ষা পুত্র না জন্মান যে অনেক সুখের, লোকবুদ্ধিজনিত ভুক্তিফে শত শত ব্যক্তির বিনাশ অপেক্ষা লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি না হইতে পারা এমনত উপায় অবলম্বন করা যে উত্তম তাহা বোধ করি কোন বুদ্ধিমান লোককে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । তবে অনেকে বলেন যে আজ্ঞাকৌমারব্রত অবলম্বন করিলে শরীর সুস্থ থাকে না, কিন্তু একটন বলেন যে কুমারীগণকে আত্মীরন সুস্থশরীরের থাকিতে দেখা গিয়াছে । চিরকাল অবিবাহিত থাকিলে যে কোন পীড়া জন্মে তাহা কোন কাজের কথা নহে । বাহ্যিক আত্মাভেদ দেশের বিধবাগণকে দেখি-নাছেন, তাহারা স্বীকার করিবেন এক-টনের মত সত্য । সুতরাং দেশের হারিদ্ধ্য দূর করিতে হইলে দেশে বহুল পরিমাণে বিবাহ বাহাতে হইতে না পারে তাহার উপায় করা উচিত । আমাদের দেশীয় অনেক কৃতবিদ্যা লোকের (কাথো না হউক যুগে) আজ কাল এই মত দাঁড়াইয়াছে । তাহারা প্রায়ই পুরুষের অকাতরে বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন । তথাপি তাহারা যে কিরূপে বিধবাবিবাহের পোষকতা করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না । পুরুষের বিবাহ হইয়া কাজ নাই কিন্তু জীলোকের বিবাহ বন্ধ করা হইবে না এ কোন যুক্তিশাস্ত্রের অনুসারিনী ?

যখন দেখা যাইতেছে যে, বিবাহ যত কমে ততই মঙ্গল, তখন বাম দেশাচারের কৃপায় কতকগুলি বিবাহ কমে তাহাতে ক্ষতি কি? কেন আমরা এই দেশাচারের উপকার গ্রহণ করিব না ?

অনেকে বলেন বঙ্গবিধবাগণ চিরজ-থিনী । তাহাদের কোন কার্যোই সুখ নাই, কোনপ্রকার আনন্দে তাহারা দ্বিষ্টিতে পারে না, মনের দ্রুপে তাহারা সর্বদাই দুঃখিত । তাহাদিগকে আত্ম-এইরূপ কষ্টে রাখা অতিনিঃশংসের কার্য, বাহার দয়া নাই, মায়া নাই, যে সেহ সমতা কাহাকে বলে জানেন না, শরের দুঃখে বাহার মন গলিয়া না যায়, সেই এইরূপ নিঃসুরতাচরণ করিতে সমর্থ । কিন্তু বিধবাদিগের দুঃখ যে অসহ্য এমনত আমাদের বোধ হয় না । যদি বাস্তবিক অসহ্য হয় অর্থাৎ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার আবশ্যক কি? পাঁচজন বিধবার জন্য বাহার প্রাণ কাঁদে, সমাজের সহস্র সহস্র লোকের জন্য তাহার হৃদয় কাটিয়া যাওয়া উচিত, যিনি একজনের সঙ্গে হৃৎ ফোটা দেখিতে পারেন না, তিনি শত শত লোকের বলিদান কিরূপে দেখিবেন? যদি পাঁচজন বিধবার দুঃখ মোচন না করিলে নিঃসুরতা হয়, তবে বিধবাবিবাহ চালাইয়া সমাজের সহস্র ব্যক্তির অঙ্গকার করা চণ্ডালতা; যোক-মেরে জুতা দান বশ্য নহে । বিধবা যদি হুচরিয়া হইবার আশঙ্কা থাকে বিবাহ

দিলেও সে আশঙ্কা একেবারে নিম্ন হইয়া না। অনেক সম্ভাব্যে দুশ্চরিত্রা হয়। আমরা নরম প্রকৃতির লোক, এইজন্য কেবল ক্ষমা করিতে শিখিয়াছি, ন্যায়পরতার উগ্রমূর্ত্তি আমরা সহ্য করিতে পারি না। সুতরাং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভবশক্তির প্রেতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাকেই স্পেন্সার সাহেব Emotional Bias অর্থাৎ আত্মভাবিক পক্ষপাত বলিয়াছেন।

সহ্য প্রকৃতির পথ বোধ হয় মিতাক্ষরার মত আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। তৎপরে জীমূতবাহন জয়গ্রহণ করিয়া মিতাক্ষরাকে আমাদের দেশ হইতে বিদায় দেন। মিতাক্ষরামতে পিতা পুত্রোৎপত্তির পর নিম্ন ভূম্পান্ত্রি অন্যকে বিক্রয় করিতে পারেন না। তাহাতে বাহার কোলিক কিঞ্চিৎ ছিল তাহার কতকটা খাবার সংস্থান থাকিত। পরে দায়ভাগকার অরিয়া দারিদ্র্য কিছু বাড়াইলেন। তিনি বলিলেন পিতা ইচ্ছা করিলে ম্পান্ত্রি বিক্রয়াদি করিতে পারেন। তৎপরে ইংরেজবাহাজুর আবার গণ্ডোপরি বিস্ফোটক জখাইয়া দিলেন। তাহারাই হিন্দুইহেলের স্মৃতি করিয়া দারিদ্র্যের পথ আরও মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার উপর যদি পুণবাস আমরা অকাতরে স্বিকার প্রকৃতি করিতে থাকি, তবে বঙ্গদেশ একেবারে ছারখার হইয়া যাইবে। হতভাগ্য যে কোন উপায়ে আমাদের

দেশে বিবাহ কমে তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

একশ্রেণীর লোক আমাদের শাজে কিছুই ভাল দেখিতে পান না; যত কেন উৎকৃষ্ট নিয়মাবলী তাহাদিগের সম্মুখে ধর না, তাহারা একটা না একটা দোষ অনুভব করিবেনই করিবেন। জন ট্যুটি মিলের পিতা এই ধাতুর লোক ছিলেন। আর একশ্রেণীর লোক ইহাদিগের ঠিক বিপরীত। তাহার। অতিমান্য। বিষয়েও ঋষিদিগের বুদ্ধিপ্রভাব দেখিতে পান, সামান্য কথা হইতে নিগূঢ় তত্ত্ব টানিয়া বাহির করেন। পুষ্পকরথের নাম শুনিয়া তাহার। বলেন আমাদের বেলায় ছিল; ঋগ্বেদোক্ত। “আপাশ্ব বিসভেবজীঃ” কথা পাঠ করিয়া তাহার। বলেন আমাদের দেশে হাইড্রোপেথি ছিল। বলা বাহুল্য যে এই উক্ত্য শ্রেণীর লোকই জাতি। এক্ষণে এই শেষোক্ত শ্রেণীস্থ লোকের। বলিতে পারেন যে, বিধবাবিবাহ পূর্বে আমাদের দেশে যখন চলিত ছিল তখন ইহা অবশ্য সমাজের উপকারী। আমরাও ইহাদের কথার অনুমোদন করি। হইতে পারে যে বিধবাবিবাহ প্রাচীন কালে প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে চলিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে সে প্রয়োজনটুকু আর না থাকিতে কাজেই ইহা রহিত করা উচিত হইয়া উঠিয়াছে। সময় ও অবস্থাবেদে কোন একটা নিয়ম হইতে উপকার অথবা অপকার হইতে পারে।

যখন আর্থাগণ মধ্যএসিয়া হইতে আসিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন, তখন তাঁহা-
 নিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম
 ছিল। অধিকৃত জাতির উপর আদি-
 পত্য বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাদের
 সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন হইল। অধুনা-
 তন ইউরোপে গমনাগমনের যেরূপ
 সুবিধা হইয়াছে, তখন মধ্যএসিয়ার
 সেরূপ ছিল না। বলিয়া আর্থাগণের নিজ
 দেশ হইতে আমদানী করিবার কোন
 সুবিধা হয় নাই। এইজন্য তাঁহার
 সন্তানোৎপাদনদ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা
 করিতে লাগিলেন; এই কারণেই অমূ-
 লোম প্রভিলোম উভয়বিধ বিবাহই
 প্রচলিত হইল এবং তাহার উপর বাহার
 যে স্ত্রীকে উপভোগ করিবার ইচ্ছা
 হইত তিনি তাহাকে (অন্যের স্ত্রী হই-
 লেও) লইতে পারিবেন এইরূপ নিয়-
 মও হইল। মহাভারতের আদিপর্বে
 খেতকেতুর গম্বাধাবা পাঠ করিয়াছেন
 তাঁহার আমাদের মতের সাপার্থ্য বুদ্ধিতে
 পারিবেন। অনেকে বলিতে পারেন
 যে সে কেবল গম্বাধা বাস্তবিক ঘটনা
 নহে। আমরাও ঐটিকে যে প্রকৃত
 ঘটনা বলিতেছি তাহা নহে, তবে ঐ
 প্রকার ঘটনার উল্লেখ থাকিতে স্পষ্টই
 পোষ হয় যে তৎকালে ঐরূপ প্রথা
 প্রচলিত ছিল। শুধু আমাদের দেশে
 কেন পৃথিবীর অন্যান্যস্থলেও ঐরূপ
 ঘটনা ঘটয়াছে। স্পার্টাদেশের (helots)
 হেলটদিগের বস্ত্র পাঠ করিলে জানা

যাইবে যে সেখানেও ঐরূপ নিয়ম
 এককালে চলিয়াছিল। যখন আর্থাগণ
 দেখিলেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত
 হইয়াছে, তখন তাঁহারা ঐ বঙ্গীয়
 উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু অমূলোম বি-
 বাহ এবং বিধবাবিবাহ আরও কিছুকাল
 চলিল। ক্রমেই খাদ্য অপেক্ষা ভোজ্য
 সংখ্যা অতিরিক্ত হইতে লাগিল দেখিয়া
 তাঁহার উভয়বিধ প্রথাই উঠাইয়া
 দিলেন। এবং সেই অবধি তাহাই চ-
 লিয়া আসিতেছে। বিধবাবিবাহ কোন্
 সময়ে আমাদের দেশে রহিত হয় তাহা
 এক্ষণে নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা
 নিশ্চয় বলা যায় যে, দায়ভাগ ও মিতা-
 ক্ষরা প্রণীত হইবার পূর্বেই বিধবাবিবাহ
 আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে।
 দায়ভাগকারীর মতে বঙ্গীয় বিধবাকন্যা
 পিতার বিষয়ভোগে অনধিকারিনী, কা-
 রণ তিনি নিজপুত্রেরদ্বারা পিতার শ্রা-
 দ্ধাদিকরণে অসমর্থ। মিতাক্ষরার মতে
 যদিও তিনি পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত না
 হইল, তথাপি পুত্রবতী কন্যাসঙ্গে
 তাঁহার অধিকার নাই। যদি বিধবা-
 বিবাহ প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে
 নিশ্চয়ই ঐরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইত না।
 বোধ হয় পরাণরের আবির্ভাবসময়ে
 বিধবাবিবাহ রহিত করিবার ইচ্ছা লো-
 কের মনে উদ্ভূত হয় এবং সেই জন্যই
 তিনি নিজসংহিতায় লিখিয়াছেন যে
 “কলিকালে (অর্থাৎ আরও কিছুদিন
 পরে) বিধবাবিবাহ করিবে না।” তা-

হার একপ নিষিদ্ধার অভিপ্রায় যে আর কিছুদিন পরে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হইবে না। দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস জন্য যে আইন করিতে হয়, তাহা আধুনিক মূল্যের ঘটনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ম্যালারীস্ অন পপুলেসন্ ও ফার্ণ ফুট অব ফিলসফি নামক দুইখানি পুস্তক পাঠ করিয়া ফ্রান্সদেশীয় লোক সম্ভ্রাম উৎপাদনে এত শিগিলপ্রায় হইল এবং কাজে কাজেই অধিবাসীর সংখ্যা এত কমিয়া গেল যে ইহাতে গবর্ণমেন্টের নগর পড়িল। ক্রমেই লোকসংখ্যা কমেতেছে দেখিয়া প্রায় একবৎসর গত হইল, গবর্ণমেন্ট, যাছাতে লোকের সম্ভ্রাম উৎপাদনে পুনরায় যত্ন হয় তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য কয়েকটি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত। এলফিনষ্টোনকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লিখিত লোকসংখ্যা গতবর্ষের হিসাবসের সহিত মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বোঝ হইবে যে অধিবাসিসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে এবং বৎসর বৎসর যে দুর্ভিক্ষ হইতেছে তাছাতেই দেশের দারিদ্র্যের পরিচয় দিতেছে। সুতরাং লোকসংখ্যা যাছাতে কমে একপ কোন উপায় করিবার মুখ্য সমগ্র উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে যদি আমরা সমাজসংস্কারজালে বিধবাবিবাহ নিষা লোকসংখ্যা দাঁড়িত হইবার সুবিধা করিয়া দিই তাহা হইলে

দুর্ভিক্ষ বৎসরান্তর না হইয়া মাসে মাসে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, যেমন ফ্রান্স গবর্ণমেন্ট লোকসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের দেশেও হওয়া উচিত। আমরা বলি আমাদের সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ কোন মতে উচিত নহে; আমরা নিজে আমাদের সমাজসংস্কার করিব, ইহাতে অন্যের চূপাচুপেয়া করিব কেন? ইচ্ছা করিয়া কেন নিজের ঘেটুকু স্বতন্ত্রতা আছে তাহা খোয়াইব?

এক্ষণে অনেকে বলিতে পারেন যে, হিন্দুগণ প্রাচীন নিয়মের একান্ত ভক্ত, প্রাণান্তেও তাহার প্রাচীন নিয়মের পরিবর্তন করিতে চাহেন না। মত প্রভৃতি কতকাল পূর্বে যে নিয়ম করিয়া গিয়াছেন আজও তাহা সকলে মান্য করিতেছে। “রেখামাত্র মণি কুরুদামনো বস্ত্রমঃ পরং, ন বাসীযঃ প্রজা স্তস্য নিয়ন্ত নেমিবুস্তয়ঃ” এই কথা কি আধুনিক কি প্রাচীন সকল হিন্দুতেই সমানরূপে খাটে। হিন্দুসমাজ দ্বিতিশীল, ইহা চিরকালই একভাবে এক নিয়মে চলিতেছে। তবে বিধবাবিবাহ পূর্বে ছিল এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে, প্রতিলোম ক্ষতলোম বিবাহ ছিল এক্ষণে নাই, এ কিরূপ কথা? আমরা বলি শুদ্ধ হিন্দুসমাজ কোন অগতের কোন সমাজই একেবারে দ্বিতিশীল হইতে পারে না। তবে যে সমাজ আরো অধিক পরিবর্তিত হইতেছে তাহাণেই লোকে দ্বিতিশীল

কহিয়া থাকে নতুবা একেবারে স্থাবর সমাজ হইতে পারে না। আর অধুনাতন আমেরিকা বা জাপানের ন্যায় যাহার অতি শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাকে গতিশীল সমাজ কহে। সমাজ-পরিবর্তন হইলেই নিয়মেরও পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। হিন্দুশাস্ত্রের যে পরিবর্তন নাই তাহা নহে। যদিও অদ্যাপি মনু প্রভৃতিকে সকলে মান্য করে বটে তথাপি তাঁহার সকল কথা আজ কাল চলে না। একজন চীফকার একমগ্নে আবির্ভূত হইয়া নিজ সমাজের সমাজের অবস্থানসারে মনু প্রভৃতির অর্থ করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার মত প্রচলিত হইল। অনন্তর অন্য একজন জমিদার সমাজের পরিবর্তিত অবস্থায় যেরূপ নিয়মের আবশ্যকতা বোধ করিলেন, মনুবাক্য হইতে সেজন্য অর্থ বাহির করিলেন। এইরূপে অগ্গ এক থাকিলেও বিভিন্নপ্রকার চীফদ্বারা সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার মোচন হইতেছে। সুতরাং হিন্দুদিগের নিয়ম যে চিরকালই এক আছে তাহা নহে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ইহারও অবস্থাভেদে পরিবর্তন হইতেছে; তবে পরিবর্তনের স্বরূপ অমান্য দেশ হইতে বিভিন্ন। অন্যান্য দেশে মূলই বদলাইতেছে, এখানে মূল এক আছে কিন্তু তাহার অর্থ পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং ফলে একই পড়াইতেছে। অতএব দেখা গেল যে

আর্য্যগণের সমাজে বলিয়া আমরা গৌরবের নিকট ইড়াই করি, যে আর্য্য আর্য্য করিয়া আমরা প্রত্যেক সভায় চীৎকার করি, সেই আর্য্যগণ সমাজরক্ষার জন্য যখন যেরূপ নিয়ম আবশ্যিক বোধ করিতেন তখন সেই নিয়ম চালাইতেন। তবে আমরা কেন এই অত্যাচারকে বিষয়ে তাঁহাদের অনুকরণ না করি? শুদ্ধ বিদেশীয়দিগের নিকট সম্মান পাইবার জন্য আর্য্যসম্মান বলিয়া পরিচয় দিব কিম্বা কার্য্যে কোনরূপে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিব না, এ অতি লজ্জার কথা। শুদ্ধ পিতার নামে কেহ বড় হইতে পারে না,—

“অমলে জনম বলে ভয় মান্য নয়।

হেয় নয় গুলিকাপ্রভব মুক্তাচয় ॥”

কার্য্যে পিতার উপযুক্ত হওয়া চাই নতুবা সম্মানের বদলে এরূপ উপযুক্ত পিতার এমন অযোগ্য সম্মান এইরূপ নিন্দা রটবে।

আমরা অধুনিক নব্য সমাজসংস্কারকদিগকে একটি কথা বলিতে চাহি। তাঁহারা মনে করেন আমাদের যাঁহা কিছু আছে সব উন্টাইয়া দিতে পারিলেই সমাজসংস্কার হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের মধ্যেও কতকগুলি অন্ততঃ ভাল আছে সে গুলি বজায় রাখিয়া যেগুলি মন্দ আছে তাহা বদলাইতে চেষ্টা করা উচিত।

এতক্ষণ উল্লিখিত প্রস্তাবের ১ম অংশ লইয়া বলা হইল এক্ষণে ২য় অংশ জা

রক্ষা করা যাইতেছে। বিধবাবিবাহ
রহিত হওয়ার প্রধান প্রতিবাদী সামা-
বাদিগণ। তাহারা বলেন, “সমাজমধ্যে
পুরুষের পক্ষে এক নিরম জীৱ পক্ষে
আর এক, কুরুপ বৃদ্ধি। প্রাকৃতিক
নিয়মে জীপুরুষ একই স্বভাবসম্পন্ন।
কি ক্ষমতা, কি বুদ্ধি কোন বিষয়েই
জীলোকেরা পুরুষের ন্যূন নহে। তবে
তাহারা পুরুষের সহিত সমান অধিকার
কেন না পাইবে? যে সমাজ জীপুরুষকে
এক চক্ষে না দেখিবে সে সমাজ পক্ষ-
পাতী, তাহার উন্নতি এখনও সম্পূর্ণ হয়
নাই। “ওগিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ”
যতদিন না হইবে ততদিন কোন সমা-
জের ভদ্রত্ব নাই।” আমরা সামা-
বাদীদিগের মতে মত দিতে প্রস্তুত নহি;
জীলোক যে বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে পুরুষের
সদৃশ একথা আমরা স্বীকার করি না,
কারণ যদি তাহাই হইত তাহা হইলে
অন্ততঃ পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে
জীলোকের পুরুষের সহিত সমান অধি-
কার দেখা যাইত এবং পশুপক্ষিগণের
মধ্যেও যৌনভারতম্য থাকিত না। তবে
জীলোক ও পুরুষের অমুভবশক্তি যে
একরূপ তাহাতে আমাদের মতভেদ
নাই। ক্ষুধায় উভয়েই কাতর হয় আহা
পাইলে উভয়েই আনন্দিত হয়। ছুঁখে
উভয়েই ত্রিস্রাণ হয় এবং সুখে উভ-
য়েই প্রফুল্লচিত্ত হয়। বিবাহাদি করিতে
উভয়ের ইচ্ছা সমান। তবে জীলো-
কের পতিবিরোগ হইলে পুনরায় বিবাহ

হইবে না এবং পুরুষ নিতান্ত নূতন নূতন
বিবাহ করিবে এ অতি অন্যায় ও অবি-
চার। এ অবিচার যাহাতে না হইতে
পারে তাহা সামাবাদিগণের যেমন ইঞ্জিত
আমাদেরও সেইরূপ। বিবাহ বিষয়ে
আমরাও জীপুরুষের সাম্যসংস্থাপন
করিতে ইচ্ছা করি। ‘যেমন পুরুষের
দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রচলিত আছে সেই-
রূপ জীলোকেরও দ্বিতীয়বার বিবাহ
আরম্ভ হউক’ একথা আমরা বলি না।
আমরা বলি ‘যেমন বিধবার বিবাহ
প্রচলিত নাই সেইরূপ পুরুষেরও দ্বিতীয়-
বার বিবাহ বন্ধ হউক।’ ইহাতে জীপুরু-
ষের সাম্য অবিকৃত রহিল, মধ্যে মধ্যে
সমাজের বখেটে উপকার হইল এবং ইহা
দেশাচারের বিরুদ্ধ না হওয়ার দলা-
দলিরও ভয় রহিল না।

পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ করিলে
আনুযায়িক আর একটা এই লাভ হইবে
যে অনেক কৃতদিত্য ব্যক্তি দ্বিতীয়পক্ষের
সংসার করিয়া ঈশ্বরতাদোষে কাজের
বাহির হইয়া বাস তাহা আর হইতে
পারিবে না।

পতি মরিলে জী ছুইবেনা আচারে
বন্ধিত, বলহারাে বন্ধিত, সংগারে বন্ধিত,
অতএব পতিকে হুহু রাখিবার জন্ত হিন্দু-
জীৱ যেমন বিশেষ যত্ন হয় অত্র জাতির
এতটা থাকে না বরং অকর্মণ্য পতি মরিলে
মনের মত পতি গ্রহণ করিতে পরিব সে
দিন কবে হবে একরূপ বাসনা বিধবাবিবাহ-
প্রচলিত সমাজে জীৱজন্দের মধ্যে কখন

কখন সম্ভব কিন্তু আমাদের সামান্য সমাজে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ করিলে আমরা তাহার সম্ভব নাই এই জন্য হিন্দুপত্নী এত আদিও পত্নীভুক্ত হই মহাদেবের আরও পতিভক্ত এত সংসারী। যদি পুরুষের টানিরা বাদি তাহাতে ক্ষতি কি?



প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হিন্দী ব্যাকরণ। শ্রীদয়ীকেশ শাস্ত্রী প্রণীত। কলিকাতা, বিডন বক্স।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “বিহার হইতে পোলিম্যান পণ্ডিতশ্রেণীর উপাত্ত্যকা পর্য্যন্ত এবং বিজ্ঞাচল হইতে তেরাই পর্য্যন্ত এই ভাষা (হিন্দী) প্রচলিত। শুদ্ধির কোহিস্থান হইতে আশাম এবং কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারত-ভূমিতে যত প্রকার মনুষ্য বাস করে তাহার সকলেই অধিক বা অল্প পরিমাণে হিন্দী ভাষা বুঝিতে সক্ষম। ইউরোপে ফ্রেঞ্চ ভাষা যেরূপ, ভারতবর্ষে হিন্দীও সেইরূপ।” উদ্বৃশ ভাষা শিক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য—বিশেষ বাঙ্গালীর। আমাদেরই কল্পিত ভাষায় মেহের কথা, ভক্তির কথা, ভালবাসার কথা, একরূপ পরিকাররূপে চলে; কিন্তু ক্রোধের কথা হিন্দীতে হয়। বাঙ্গালীর ক্রোধ ছিল না, ক্রোধেই ক্রোধের ভাষা হয় নাই; এবং একটু ক্রোধ বাড়িয়াছে, গরম মেহাইর বাবুরা আত্মস্বরে পড়িয়াছেন। হিন্দী বাতীত তাহাদের কৃৎকার, চীৎকার প্রকাশ করিবার আর অন্য উপায় নাই। “নেকামো”-বাদীরা

যদি একটু হিন্দী শিখিয়া তেড়া নেকাইজ দেপান, তাহা হইলে ভাল হয়। আমরা যে গ্রন্থের সমালোচনা করিতেছি, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় তাহার অনেক পরিমাণে শুদ্ধ হিন্দীতে গালি দিতে শিখিবেন। বঙ্গীয় যুবকগণের হিন্দী শিখিবার সুবিধাজন্য এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভে “হিন্দীভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস” নামক একটি ভূমিকা আছে। পুস্তকখানি অধুনা প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে বাঙ্গালায় লিখিত। গ্রন্থকার প্রথম শিক্ষার্থীদের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বৈয়াকরণিক বিষয়গুলি যথাযোগ্যভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমাদেরই দৃঢ় বিশ্বাস, পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পাদনে বিশেষরূপ কৃতকার্য হইবে। যদি কখন বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে হিন্দী পুস্তক পড়ান আরম্ভ হয়, এই গ্রন্থ পাঠাপুস্তকস্বরূপ নির্বাচিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজি, সংস্কৃত প্রভৃতি যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তরূপ হিন্দীও শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

বঙ্গদর্শন ।

নবম বৎসর ।

৭৫ সংখ্যা ।

——————

বঙ্গীয় শঙ্করাচার্যের নালিশ ।

ধনীর আর একটি নাম “বড়মাল্লব ।”
বদ্ভাদি যেকপে হস্তধার। পরিমিত হয়,
গেইরূপে মল্লবাণ টাকার দ্বারা পরিমিত
হইয়া থাকে । এই বদ্ভখানি হাতে অন্ন,
অন্তএব ইয়া ক্ষুদ্র ; এই মল্লবা টাকার
অন্ন, অন্তএব এই ব্যক্তি ছোটলোক ;
আর এই মহোদয় টাকায় অধিক, অন্ত-
এব বড়মাল্লব—আকার অতি ক্ষুদ্র হই-
লেও বড়মাল্লব । আমার আকার বড়,
উদরও বড়, আমি জানিতাম আমি
“বড়মাল্লব ;” কিন্তু হলী, বলা, কেহই
আমায় “বড়মাল্লব” বলে না । আমি
ভাষাভাষের কতই বুঝাইয়া থাকি, কেহই
বুঝে না । আমার বেকারী মাত্রাও, কেহ
করে তাহাকে লোকে কখন কখন “বড়-
মাল্লব” বলে, আমার লোকপ লের, হয়
ত তাহাকে লোকে, “বড়মাল্লব” বলে
না । তাকে লোক হয় কেবল টাকার

“বড়মাল্লব” হয় না, বুঝি ব্যয় করিলে
“বড়মাল্লব” হয় ।

আর যদি বল মাহার ভূমিসম্পত্তি
আছে কেবল সেই বড়মাল্লব ; তবে
আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি, কেন না
আমার টাকা না থাকুক, আমার ভূমি-
সম্পত্তি আছে ; কেবল এই বাঙ্গালায়
নহে, নানাদেশে আছে । ভূমি হানি
তেজ, তোমার বিখ্যাত হয় না । ভাণ ;
তদন্ত করিয়া দেখ ।

আমি এইমাত্র যে পাত্রপূর্ণ দেবদ্রব্য
মদ্রত যেমাত্র সাহার-যজ্ঞে আহুতি দিয়া
আদিয়াছি, আমার যদি ভূমি নাই, তবে
তাহা আমি বকাপায় পাইলাম । যে
মৎস্যমুগ আমার অঙ্গুলিশর্শাভূপাত্ত ভব
আত্মাকার এইমাত্র অনিমিকুলোচনে
আমার ঐতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল, যদি
আমার করিণী নাই, তবে আমি ঐ

মৎস্য কোণায় পাইলাম? এই যে কদলীছড়া প্রৌঢ়ার অধুনির ন্যায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপলকে আমায় উল্লিত করিতেছে, আমার যদি বৃক্ষ নাই, তবে এই মর্কটননোহর আমি কোণায় পাইলাম? এই যে পরিষ্কৃত সাগরের ন্যায় আমার উদর-স্বমেধকে বেঠেন করিয়া রক্তিয়াছে, এবং তরঙ্গ তুলিয়া বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, আমার মধ্যে মনো তাহার ছিন্নভাগের শোভা দ্বীপ উপদ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছে, যদি আমার ভূমি নাই, তবে এই বঙ্গের বাপাস কোণা হইতে আনিব? *

ভূমি বলিবে কার্পাস, বঙ্গ, কদলী, মৎস্য, তত্ত্বল, এ সকল আমি ক্রয় করিয়াছি। সত্য কথা, আমি মূল্য দিয়াছি, কিন্তু কিসের মূল্য? মজুরির মূল্য দিয়াছি, তাহা দামদাসীর বেকমস্বরূপ। কিন্তু তত্ত্বল কি কার্পাসের মূল্য দিই নাই। কৃষকগণ কেবল ভূমিকর্ষন, বীজ-বপন, জলসেচন প্রভৃতি কার্যা করিয়া থাকে এবং তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিছু কিছু পাইয়া থাকে। চলিত বখার সেই মূল্যকে ধানোর মূল্য বণে। সে তোমাকে প্রত্যহ অবশিক্রয় করে, সে ব্যক্তি জলের স্বষ্টি করে নাই, জল তাহার নহে; সে ব্যক্তি কেবল নদী কি কূপ হইতে জল আনিয়া দেয়, ভূমি তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিছিন্ন কিছুই দিয়া থাকে। অতএব সে ব্যক্তি মনে করে, "আমি জলের মূল্য পাইলাম"

তুমিও বল, "আমি জলের মূল্য দিলাম।" সেইরূপ কৃষকেরা মনে করে, "আমি ধানোর মূল্য পাইলাম," তুমিও বল, "আমি ধানোর মূল্য দিলাম;" বস্ত্তই তাহা নহে।

ধান্য কৃষকের নহে। সে ব্যক্তি পরিশ্রমদ্বারা ধানোর উৎপাদন করিয়াছে, অতএব যে পর্য্যন্ত কৃষক সেই পরিশ্রমের মূল্য না পায়, সেই পর্য্যন্ত ধান্য তাহার নিকট আমীনস্বরূপ আবদ্ধ থাকে। ধান্য মহাজনেরও নহে; সে ব্যক্তি কৃষকের মজুরি অগ্রিম দিয়া ধান্য খালাস করিয়া আনিয়াছে এবং ধান্য হয় ত তত্ত্বল করিয়াছে অতএব যে পর্য্যন্ত মহাজন তাহার মূল্য না পায়, সে পর্য্যন্ত ধান্য আমীনস্বরূপ আপনার নিকট আবদ্ধ রহে। শেষ, যে ব্যক্তি এই সকল মজুরির মূল্য দিয়া তত্ত্বল খালাস করিয়া আহাৰ করে, তত্ত্বল তাহার; তাহার নিমিত্ত উৎপাদিত হইয়াছিল। তত্ত্বল তাহার, ভূমিও তাহার।

আহার আহাৰ প্রয়োজন, তাহার ভূমিও রও প্রয়োজন। ঈশ্বর তাহাকে উদর দিয়াছেন, ঈশ্বর তাহাকে ভূমিও দিয়াছেন। যে কৌশলে জানিতেছি এই শরীরে আমার উদর আছে, সেই কৌশলে জানিতেছি এই পৃথিবীতে আমার ভূমি আছে। পৃথিবীর কোন অংশে আছে তাহা আমি জানি না, কোন "বড় ছোকে"ও তাহা জানেন না। রাজারা রাজস্বদানের বদলি আপন আপন ভূমি

কর পাইয়া থাকেন, আমিও হট্টমন্দিরে বা পরমন্দিরে বসিয়া আপনভূমির উপস্থাপনা পাইয়া থাকি। রাজারা কখন আপন ভূমি দেখেন নাই, আমিও কখন আমার ভূমি দেখি নাই। দেখি নাই, তাহার আর এক কারণ আছে; আমার ভূমির অংশ কখন চিহ্নিত হয় নাই। একান্তবর্জী পরিবারের ন্যায় পৃথিবীর যাবতীয় উদ্বরণায়ণ ব্যক্তির সহিত আমি একত্রে এই পৃথিবীর সমুদয় ভূমি পৈতৃক বলিয়া একমালিতে ভোগ করিতেছি। মার্কিন দেশের ভূমিতে যে কাপাস উৎপন্ন হইতেছে প্রয়োজনমত আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। কাবুল দেশের ভূমিতে যে আদুর, শেতা, বেদানা প্রভৃতি জন্মিতেছে, এখানে মসিরা আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। সর্কদেশের ভূমিতে আরার অংশ আছে, এই জন্য সর্কদেশের উৎপন্নের অংশ পাইয়া থাকি। হয় ত কোন কোন অঞ্চলের উৎপন্ন আমি লই না, অথবা লইতে পারি না, অর্থাৎ মজুরির মূল্য দিতে পারি না। মূল্য যদিও না দিতে পারি, এবং সেই জন্য আপন অংশ যদিও না লইতে পারি, তথাপি আমার স্বয়ং যায় নাই। এ স্বত্ত্বের তামাদি হয় না। সমাজকর্তৃক যে সকল স্বত্ত্ব সৃষ্টি বা প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই তামাদি আছে।

এই পৃথিবীতে আমার অংশ কি পরিমাণ ভূমি আছে, তাহা আমি নিশ্চয়

অজ্ঞত্ব করিতে পারি না। অজ্ঞত্ব করিতে হইলে প্রথমতঃ আমার ভাগ্যীর সংখ্যা, অর্থাৎ মজুরের সংখ্যা জানা আবশ্যিক; কিন্তু তাহা আমি জানি না। বলিতে কি?—কালান্দোচ লইতে হইবে, এই ভয়ে জ্ঞাতির-বার্তা নাই না। নিত্য কাদিতে হইবে বলিয়া মনুষ্যমধ্যে থাকি না। পাছে জ্ঞাতিবিরোধ হয়, এই ভয়ে পৈতৃকহিস্যা কখন চাই না। চাইব বা কাহার কাজে, কেবা আমার দাবী শুনিতে কর্ণপাত করিবে! কবের রাজাকে যদি বলি, “ভাই আলেকজান্ডার, আমি তোমার জ্ঞাতি, পৈতৃকসম্পত্তিতে আমি তোমার তুল্যাংশী, ভূমি কেন আমার বঞ্চনা করিয়া আমার সর্বদন লইতেছ?” ভায়াব উত্তর তদ্যানক হইয়া পড়িবে। বঞ্চিত হিঙ্গাদারেরা তাহার উপর নালিশ করে এমন আদালত এ পর্যন্ত হয় নাই। আদালতস্থাপন না হইতে হইতেই একবার ক্রাউনপ্রসেকিউটর আর্জী লিখিয়াছিলেন। তাহাতেই হিঙ্গাদারেরা মাতিয়া উঠিয়াছিল। বাদমার হিঙ্গাদার করির। মুসলমানেরা তাহাই উভয়কে সা বলেন। আমিও সেই জ্ঞাতিবাচক উপাধিতে দাবি রাখি।

তোমরা আশায় তৃচ্ছ কর, আমার ভূমি নাই বল। সমীক্ষারকে ভূমি-কারী বল। কিন্তু বিচার করিলে দেখিলে সমীক্ষার কর্মচারী মাত্র। ভূমি কে কর্বণ করিবে, কতদিনের নিমিত্ত কর্বণ করিবে, এই স্থির করা সমীক্ষারের অধি-

কার : ভূমি কোন সময় করিত হইবে,
তাহাতে কোন শস্য রোপিত হইবে,
এই স্থির করা কৃষকের অধিকার ;
স্বাধীনতার নিয়োজিত সাম্যকৃষক ভূমি-
কর্ষণ করুক, অথবা সাম্যকৃষকই ভূমি-
কর্ষণ করুক কিংবা আমার নিয়োজিত
ধবল বলদ, অথবা আমার নিয়োজিত
শামল বলদ লাঙ্গল বহন করুক, তাহাতে
ভূমির স্বামিত্ব জন্মে না। যে শত্রু ভোগ

করে, ভূমি তাহার। অতএব ভূমি
আমার। তবে কেন যোকে আমার
কুজলোক বলে? আমি বিচারার্থী।

বিচার না কর, আমি আর তোমাদের
বান্দাল্য থাকিব না। তোমরা মুচিক
স্বয়ং বল, দাসকে দেব বল, আমার কেন
না বড়মায়াম বল?

শ্রীশঙ্করাচার্য বঙ্গদেশী।

স্মৃতি কিম্বা হৃদপিণ্ড কর উৎপাটন।

প্রয়োগ।

১
রমণী!—প্রণয়!—অহো কি ঘোর-স্বপন!
ভাবনা!—যন্ত্রণা!—ধিক্ যন্ত্রণা কেমন!
কেন চিন্তা!—কার চিন্তা!—কিসের যন্ত্রণা?
কি সে নারী?—কেন তার এতই ভাবনা?
ভ্রুটি!—স্রুতি!—হৃদয়ের, পদুর প্রহাসন।
যুবক মাজে কি সেই স্মৃতি বিলাস?
মনের মাহাত্ম্য কোথা—কোথা দৃঢ়-পন?
স্মৃতি কিম্বা হৃদপিণ্ড কর উৎপাটন।

২
গামান চাপিয়া ধর বকের উপরে,
প্রেমমুগ্ধি চূর্ণ হেঁকি নিভৃত-অস্তরে।
ভাববাসা!—ভাববাসা!—ছাঁদ ভাববাসা!
মধু ক্লেভ—সুধ ক্লেভ—মিটেনা পিপাসা;
প্রতিদান নাহি তায়—অসহ-বাতনা,
হর কর—হেন প্রেম করো না কাননা।

ক্ষীণপ্রাণ রমণীর তপস্যা, মিকলা।

ভীক!—মুখ!—মরচিত্ত এত কি দুর্জন?

৩

পাপ—পুণ্য—নীতি—সেত সুদূর বিচার,
ভেবে দেখ একবার গৌরব আশ্রয়!
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড, আর আশ্রয় সন্ধান,
তুল্যদণ্ডে সমভারে কর পরিমাণ;
সে গৌরব—জীবনের সে অমূল্য ধন—
রমণী পূজিতে আজ কর বিতরণ?

দিক্ জানে—জান নীর তীক্ষ্ণ-তরবার?

অসার-স্মৃতি-চিন্ত করহ বিদার।

৪

“বুণ্ডা কেশ কেন পাও, ছাশা-তোমার।”

কোথা ছিল সে সমুদ্র তীক্ষ্ণ-তরবার?

কেন না করিল দীর্ঘ স্বপ্ন আমার?

স্মৃতি এ বীতরাণ—হুঃসহ যুবক।

রুদ্ধ কর দিগন্তঃ! এ অজীত অরণ,
সে মূৰ্ত্তা—সে ভীকতা—অসুখ এখন।
কি পাথে, কি তাপে—হায় কোন আলোভনে,
সাম্রাজ্যে গড়েছিল নারীর চরণে?

তথাপি অসুখ এই মনের অনল,
এ এগরে বেদনই জ্বলদ কেবল।

প্রয়োগ।

শিক্ষা, দীক্ষা, ধন, মান, অমূল্য জীবন—
তুচ্ছ ভাবি যেই প্রেম করিছ সাধন,
অসুর-উদানে, প্রেম-বারি-বিনা যার—
সুদ—শাশানয়ী-লতা সুদয়ে যুবার,
মনের বিপুল-বল, গভীর-আশান,
শান্তির বিমল-জ্যোতি—চিত্তের উল্লাস,
উপেক্ষিত অরহেলে যাহার কারণ,
সে রমণী—সে রাক্ষণী—পাষাণী এমন!

বিরাম।

এ নহে মনের দর্শন, এ নহে প্রণয়,
প্রেমিকের চিত্ত এত স্বার্থপর নয়;
না দিয়াছে, নাই দিল প্রেম-প্রতিদান?
তুমি সদা বাস ভাল, তোমারি স্থান।
মিলনেতে নহে স্মৃতি—স্মৃতি ভাবনার,
তথিতে মনের ত্বা নিমেষে জ্বলয়;
অলুক এ তুবানল স্বপ্নকন্দরে,
সাবধানে রাখ যেন শিক্ষা না উগরে।

তুমি ত ভিখারি—তব কোথা অধিকার?
তোমার দীপ্তিত-ধন আগন্তে তাহার।
ভিক্ষুর কেন ক্রোধ—কেন অভিমান?
ভিক্ষুর কুদ্রের কুত্র—তুণের সমান,
নিপা নহে—এ পিপাসা ছরাশা কোমার,
এ মসোরে—এ জীবনে নহে পুরাবার;

মূৰ্খ তুমি! কেন ক্রোধ? কেন অভিমান?
এখনো রয়েছে বন্ধ—চিরি দেখ প্রাণ।
কি দিয়াছি। কি চেয়েছি। কি ভিক্ষা আনার
কোথা স্বার্থ, সে কি স্বার্থ, স্বার্থনাম্‌কার?
চরণ স্বদয়ে ধরে ধূলায় পড়িয়া,
কি ভিক্ষা চাহিয়াছিল কাতরে কাঁদিয়া—
“দর্শন, স্পর্শন তব চাহিব না আর,
ভালবাসি বল স্নেহ মুখে একবার।”

সহস্র-বুশ্চিক-দস্ত অস্তরে তখন,
শিরে শিরে, মেদে মেদে, করিছে দংশন;
রাক্ষণী কি উত্তরিল, অহোহো! নিশ্বাসি,
ধিক মোরে, পুন তায় কহিছ জিজ্ঞাসি—
“চেয়ে দেখ—কি হয়েছি—নিকট মরণ,
ভালবাসি বল স্নেহ—বাঁচিবে জীবন।”
উত্তরিয়া “না” পাষাণী কহিল আবার,
“ইথে যদি মর তবে কি করিব আর।”

বিস্ময়-স্তম্ভিত-চিত্তে পলেক রহিয়া,
মানবী কি দেবী ভাবি দেখিছ চাহিয়া,
উজল-নয়ন হুটী না রক্ত না সিঁহ,
পূর্ণেন্দু-বিমল-আগি না শুক না ক্ষীত,
ক্রোধ-ক্ষোভ-চিত্তা-লেশ, করণার কণা,
নাই তাহে বিলু মাজ—যেন অনামনা;
আবার নয়নদয় কাঁদিয়া ফেলিছ,
মানবী কি দেবী তায় বুকিতে নাহিছ।

১১

মুজিয়া নমন পুনঃ দেখিছু যখন,
সেই দৃষ্টি—সেই আঁখি—বসিয়া অমন,
চিত্রপিপাসার সেই বদন-মণ্ডল,
স্বধা-বিগলিত সেই মনন উজ্জল,
সে প্রথম মিলনের ছবি করুণার,
স্বায়-হৃদে তখনও বিদ্যমান তার,
সে মৃতিতে, এ হৃদয়!—নগীতে পাবনা।
সহিল না প্রাণে—বেগে তাজিল সে স্থান।

১২

দেখি নাই, শুনি নাই, তদবধি আর;
দেখিব না, শুনিব না—জীবনে আমার,
তবুও পরাণ কাঁদে কখন কখন,
লজ্জার ঘুণায় হৃদে ক্ষিপ্ত হই মন,
ফুরায়ে গিয়াছে সব আমার জীবনে,
স্বথের বাসনা আর নাহিক এ মনে,
দেখিতে বাসনা শুধু অন্তর তাহার,
কাঁদে কি না কাঁদে মোর ছবে একবার।

বিরাম।

১৩

সে কাঁদিলে কোন ছুখে? কি দুখ তাহার?
মর কিয়া বাচ তুমি, তার কিবা তার?
তুমিই বাসিলে ভাল, সে কেন বাসিলে?
তুমিই দহিলে দুখে—সে কেন সহিলে?
তুমি বল মন-প্রাণ দিয়াছ তাহার,
কেন দেও? করে দেও? সে ভ নাহি চায়।
কি শুণা? কি লজ্জা? তি, এই কি তোমার,
মনের নাহাওয়া আর গৌরব আগ্রার?

১৪

কাব্য উপাখ্যান নয় এ তব জীবন,
নাট্যশালা নয় ইহা—প্রকৃত ভবন;

নও তুমি জগৎসিংহ—সে আয়েষা নয়,
কলিত-প্রণয়ে তবে কেন তুবা হয়? ১০
মন তার, প্রাণ তার, প্রণবো ভাবার,
তাহার হৃদয়ে তব কোন অধিকার?
তব দুখে কভু তার কাঁদিলে না মন,
দুর্দশা নিবশি তব হাসিলে সে জন।

প্রয়োগ।

১৫

সে কাঁদিলে কোন ছুখে? এই কি সংসার?
দয়া-মায়া-মাতৃভূক্তি সব কি মিছার?
সে নাহি কাঁদিলে যদি কে কাঁদিলে আর?
কর ছুখে, কর তরে, এ দশা আমার?
করে যদি দিবানিশি করে এ নয়ন?
কর ছুখে প্রতিপল আশ্রয় মরণ?
বজ্রহস্ত-তর-প্রায় নিশ্চক-জীবন—
কর তরে আলো আছি করিয়া ধারণ?

১৬

সে কাঁদিলে কোন ছুখে? অর্হো হো সংসার
নরনারী-পূর্ণ ভূমি—তব এ আঁচুর?
জীবন-যৌবন-স্বপ্ন, অঞ্জলি পুরিয়া—
নিত্য যে চরণে তার দিয়াছি ঢালিয়া।
ত্মিত-সাতক হতে হইয়া কাতর,
দেখিতেছি মুখ তার এ নীচ-বৎসর।
কৃতদাস হতে তার হয়ে অঙ্গগত,
তুমিতে তাহার মন—সদাই নিরত।

১৭

এ পূজার কিছুই কি নাহি পুরকার?
মনেও নেহের বিন্দু ২°নয় তাহার?
এ হ'তে অধিক তুমি ছিল না আমার,
কথায়ো কবণা নাহি স্বপ্নিত তাহার?

রাজ্য নয়—ধন নয়—নহেও জীবন,
 চেয়েছিল বক্রগীর একটা বচন।
 মেহপূর্ণ তার মেই একটা বচনে,
 প্রবাহিত মন্ডাকিনী এ গুরু-জীবনে।

১৮

এ তপস্যা—এ যন্ত্রণা—এত অধুরাগ,
 পাখা-বদলে তার করিল না দাগ।

কি সে নারী?—চিন্ত তার সামবিক নয়!
 এত কি পাখা-বদল নারীর রূপক?
 দেবী নয়—পাখাণী সে—অমরেশ্বরী নয়,
 তপস্যা—মাধন্য—হয় উচ্চাটন।
 পাখাণী পূজিত হয় এত দিন মরে!
 এই রূপ চিরদিন রহিবে অস্তরে।



বঙ্গ বৈজ্ঞানিক।

আজ কাল বাংলার পশ্চিমবিভাগে
 ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের জন্য যে সকল
 বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক নিষ্কারিত হইয়াছে
 তাহা স্বাক্ষরগণের শিক্ষার পক্ষে কোন
 অংশ উপযোগী নহে। যে যে অংশ
 বুঝিতে না পারে তাহা লাগে সেই সেই
 কংশ এক পাঠ্যক্রমে লিখিত হইয়াছে।
 বালকগণ এই সকল বিষয় কিছুই বু-
 জিতে না পারিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার
 মানসে গুরুপক্ষীর ন্যায় কেবল কৃতক
 জ্ঞান অন্ধান করিতে বাধ্য হয়। অনেকে
 বলিবেন যে এই অভ্যাসবিষয় পরে বালক-
 গণের উন্নতির আশিতে পারে কিন্তু
 বালকগণ এই সকল পুস্তক হইতে স্বেচ্ছা
 অন্ধান করে তাহার অধিকাংশই ব-
 জুত হয় তাহা হইলে পরে উপকার হওয়া
 বুঝে থাকুক অগ্গতির সম্ভাবনা। এই
 জন্য আমরা বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

এম এ প্রণীত পদার্থবিদ্যার সমালোচনা
 করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

মহেন্দ্র বাবু বিস্তর পড়িয়া শুনিয়া
 তাহার পুস্তকখানি ভাল করিতে অনেক
 চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে নিউ-
 টনের আকর্ষণবিষয়ক নিয়ম বুলিতে
 পারেন নাই ইহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য
 হইলাম। তিনি তাহার পদার্থবিদ্যার
 (অষ্টমাস্ক ২৭ এর পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন
 যে “তাবৎ বস্তুই নিষ্কণ্টক হইলে ভূতলে
 গতিত হয় ইহা দেখিয়া আপাততঃ একপ
 বোধ হয় যে পৃথিবীই তাহাদিগকে
 আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহার পৃথিবীকে কি
 পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে।
 কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ
 হইলে ইহা নিতান্ত ভ্রান্তমূলক; কারণ
 পৃথিবী তাহাদিগকে বোকা আকর্ষণ করে
 তাহারাও পৃথিবীকে এবং পরস্পরকে

সেইরূপ আকর্ষণ করে কিন্তু পৃথিবীর সামগ্রী পরিমাণ অসীম হওয়াতে তাহার আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবল।” আনন্স অ্যামরা হইলেন যে নিউটন কষ্ট সাধে পরিত্যাগ আকর্ষণ সংক্রান্ত যে নিয়ম বাহির করিলেন তাহার কি পৌনে এত সাধাণা। নিউটনের আকর্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়ম বিধরে আনন্স এইরূপ জানি যে একটি জড়পদার্থ অন্য জড়পদার্থের প্রতি যেকোন আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করে সেখানকার পদার্থ প্রথমটিকেও ঠিক সেই সমান বল আকর্ষণ করে। দুইটি দ্রব্য পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করে সেই আকর্ষণশক্তি সমান, নিশ্চয় সমান, তাহাদের পরিমাণ কখনও অসমান নহে। অর্থাৎ পৃথিবী একটি ফলকে যে বলে তাহার দিকে আকর্ষণ করে ফলটিও ঠিক সেই বলে পৃথিবীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করে। ঘোড়া যে বলে গাড়িকে টানে গাড়িও সেই বলে ঘোড়াকে টানে। মহেন্দ্র বাবু এ নিয়ম জানেন কিন্তু নিয়মের কার্য ভাবরূপ বুঝিতে পারেন নাই। তাহাই বলিয়াছেন “একের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবল” মহেন্দ্র বাবু যে বিষয় না বুঝিয়া বালকগণকে ভুল শিক্ষা দিতেছেন তাহারা সেই বিষয় নিম্নলিখিতরূপে বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

আপনি একখানি মোচার খোলা অ-

ণের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যে বল প্রকাশ করিবেন সেই বলে যদি একখানি নৌকা আকর্ষণ করেন তবে আকর্ষণের ক্রিয়া পূর্ব-অপেক্ষা অনেক নূন হইবে এবং সেই বলে যদি এক বৃহদাকার আহাজ টানেন তবে আকর্ষণের ক্রিয়া এত অল্প হইবে যে কিছুই হয় ত দেখা যাইবে না। অর্থাৎ যদি দুইটি বস্তুর উপর সমান আকর্ষণশক্তি প্রকাশ করা যায় তবে যেটির পদার্থ সমষ্টি অপেক্ষাকৃত অধিক তাহার উপর আকর্ষণক্রিয়া অপেক্ষাকৃত নূন হইবে। এতলে আকর্ষণের ক্রিয়ার নূনাতিরেক হয় আকর্ষণের নূনাতিরেক হয় না।

পৃথিবীর পদার্থসমষ্টির সহিত কোন দ্রব্যের পদার্থসমষ্টির তুলনা হয় না, স্ত-রাং পৃথিবী ও বৃক্ষভূত ফল যখন ঠিক ভিন্নদিকে সমান বলে আকৃষ্ট হয় তখন ক্ষুদ্র ফলের উপর পৃথিবীর আকর্ষণক্রিয়া এবং পৃথিবীর উপর ফলের আকর্ষণের ক্রিয়ার সহিত তুলনা হইবে না-অর্থাৎ আনন্স দেখিব যে ফল ভূপতিত হইল কিন্তু পৃথিবী ফলের দিকে উঠিল না।

মহেন্দ্রবাবু যদি কোন ইংরেজি পুস্তক না পড়িয়া কেবলমাত্র বাবু জফরজামান দস্তগীরীত পদার্থবিদ্যাখানি ভাব করিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে দোষ হয় একথা মহাত্মনে দ্রাস্ত হইতেন না। অক্ষরবাবু লিখিয়াছেন, “যেমন পৃথিবী নিকটত-

আনন্স ইংরেজি Mass শব্দের অর্থে সামগ্রী না লিখিয়া পদার্থসমষ্টি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

সমস্ত বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভাষাও যত ক্ষুদ্র হউক না কেন পৃথিবীর উপর আর্গন, আপন আকর্ষণ শক্তি প্রকাশ করে। তবে পৃথিবীর নিকটবর্তী সমুদায় জ্বা পৃথিবী অগোচর ক্ষুদ্র, এ নিমিত্ত ভাষাদের আকর্ষণত্বের ক্রিয়া আমাদের পাতাল হয় না।”

আকর্ষণবিষয়ে মহেন্দ্রবাবু বাহা বাহা মিনিরাজেন, তাহা সমস্তই ভুল। ৩৫ পৃষ্ঠায়, নির্বীতভাবে কি গুরু কি লঘু সকল বস্তুই একস্থান হইতে এক সময়ে ভূপৃষ্ঠিত হয়, ইহার কারণ লিখিয়াছেন যে “সকল প্রকার জ্বাকেই পৃথিবী সমান বলে আকর্ষণ করে।” ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে একখণ্ড লৌহ ও সেই পরিমিত মোলাকে পৃথিবী সমান বলে আকর্ষণ করে অর্থাৎ উভয়েরই ভার সমান। অশুদ্ধ কথা বটে। পুনশ্চ “বস্তুর পরিমাণ সকলকেও পৃথিবী যেবলে আকর্ষণ করে গালক ও কাগজের পরমাণু সকলকেও ঠিক সেই বলে আকর্ষণ করে।” অর্থাৎ সকল শব্দের অর্থ যদি সমষ্টি না হয়, তবে স্বপের (molecular weight) আণবিক ভার কাগজের আণবিক ভারের নহিত সমান। তবে ডাকটেন বাহা বলিয়াছেন তাহা বোধ হয় ভুল।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াগতকে মহেন্দ্র বাবু কি বুঝিয়াছেন দেখা যায়। তিনি বলেন যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চাপ ও প্রতিচাপ সব সময়ে সমান। কিন্তু কোন কোন স্থানে নাও বটে। “৩৮ পৃষ্ঠা

যদি টেবিলের প্রতিচাপ হইতে দ্রবের চাপ অধিক হয় তাহা হইলে টেবিল ভগ ও চূর্ণ হইয়া যাইবে।” কিন্তু চাপ যে কখনও প্রতিচাপ হইতে বেশী হয় ইহা নিউটন বলেন না। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আমাদের বাহা বক্তব্য আছে তাহা আমরা সমগ্রগ্রন্থে বঙ্গবর্ণনে প্রকাশ করিব।

আকর্ষণসংক্রান্ত নিয়ম তিনি বুঝিতে পারেন নাই তিনি স্থিতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের বিষয় বাহা বুঝিয়াছেন, ও বুঝাইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য। আমি প্রতাপরিক্ষেদ বইয়া সমালোচনা করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রস্তাবের কলেবর বাড়িয়া যায় এই ভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

বায়ুবিজ্ঞান ও পারিবিজ্ঞানে প্রথমে চাপ কাহাকে বলে এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। চাপ কাহাকে বলে ইহা যিনি ভাল করিয়া বুঝেন নাই, তিনি পারিবিজ্ঞান ও বায়ুবিজ্ঞানের কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। মহেন্দ্রবাবু বায়ুমানবজ্ঞের বিষয় বাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি বায়ুর ভার ও বায়ুর চাপ একই কথা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (৩৪ পৃষ্ঠা) কিন্তু তাহার জন্য উচিত ছিল চাপ, কেবল চাপ বাতীত ভার নহে এবং ভার শুধু ভার বই চাপ নহে। (pressure is pressure and weight is weight) কোন পাত্রস্থিত বাতাসের ওজন অন্য এক ক্ষুদ্রতর পাত্রস্থ বাতাসের ওজনের সমান হইতে পারে, কিন্তু একের চাপ

অন্যের চাপের সহিত সমান নয়। বায়ু-
মানন্যের যে পারদ উঠে বায়ুর ভার তাহার
কারণ নয়, বায়ুর চাপই তাহার কারণ ;
একটি যুগ্মবদ্ধ কাচপাত্রের অভ্যন্তরে যদি
বায়ুমানন্য রখা যায়, তাহা হইলে
সেই যন্ত্রের পারদের উপর কিছু উপরিস্থ
সমস্ত বস্তাসেব ভার পড়ে না, তথাপি
পারদপাত্রের মুখ খোলা থাকিলে বহুদূর
উন্নীত বদ্ধ করিলেও ততদূর উঠিবে।
যদি পাত্রের মধ্যস্থ বায়ু ঘনীভূত করা
যায় তবে বায়ুমানন্যের মধ্যে পারদ
আরও অধিক উঠিবে। কারণ বায়ুর চাপ
বায়ুর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে, ভারের
উপর নির্ভর করে না। এইরূপ ভার ও
চাপের একই অর্থ মনে করিয়া অনেক
অনেক গোলযোগ করেন। যেমন মহেন্দ্র
বাবু বলিয়াছেন যে “আমরা প্রায় ৩৭৬
মণ ভারে আক্রান্ত রহিয়াছি, আশ্চর্যের
বিষয় এই যে আমাদেরকে কোনরূপ
ভার সহ্য করিতে হইতেছে ইহা আমরা
একবার ভ্রমেও মনে করি না।” মহেন্দ্র
বাবুর পক্ষে ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়
বটে, কারণ তিনি ভার ও চাপের বিভি-
ন্নতা কখনও মনে ভাবেন নাই, কিন্তু
তিনি ভার ও চাপের বিভিন্নতা স্পষ্ট
বুঝিয়াছেন তিনি এই বায়ুমাগরে নয়
হইয়াও কেন যে কিছু ভার সহ্য করেন
না তাহা বিশেষ বুঝিয়াছেন। বাস্তবিক
আমরা যখন মেটে সাধারণ করিয়া না
বুঝাই তখন নিজের শরীরের ভার কিয়
কিছুই বহন করি না। বায়ুমাগরে ডুব

দিয়া বেশী ভাব বহন করা দূরে থাকুক
বরং কম ভার বহন করি, কারণ বায়ুমাগ-
রা পাকিলে শরীরের যে ভার ও শরীরের
আয়তনপরিমিত বায়ুর ভার যোগে করিলে
নির্দোতস্থলে শরীরের ভারের সমান হয়।

তরল পদার্থের কোন বিন্দুর উপর
চাপ, pressure at a point), চাপসমষ্টি
(total pressure) সংঘাত চাপ (result-
ant pressure) প্রভৃতি ইহাদের প্রভেদ
স্পষ্ট করিয়া না বুঝাইয়া দেওয়াতে
এক চাপ কথা লইয়া পুস্তকমধ্যে অনেক
ভ্রম ঘটিয়াছে।

মহেন্দ্র বাবু ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন
“তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই সমান
উচ্চ।” ইহা পড়িয়া আমরা এই বুঝিতে
পারি যে গঙ্গোত্রী ও সাগরসঙ্গমের জল
পৃষ্ঠ সমান উচ্চে অবস্থিত। কলিকাতার
গঙ্গার জলপৃষ্ঠ সাগরসঙ্গমের জলপৃষ্ঠ হইতে
উচ্চ এই কথা কোন বালককে বলাতে
দে উত্তর করে যে, তাও কি হয়, আমরা
পদার্থবিদ্যায় পড়িয়াছি “জল উচ্চ নিচু
হইতে পারে না।” “তরল বস্তুর পৃষ্ঠ
দেশ সর্বত্র সমান” ইহা লিখিবার সময়
মহেন্দ্র বাবুর মনের ভাব এই যে তরল
বস্তুর যখন সামান্যতা থাকে তখন
তাহার পৃষ্ঠদেশ সমোচ্চ।

১২২ পৃষ্ঠা “স্বাক্ষরিত বায়ুমাগর মধ্য
দিয়া আনিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া
বিন্দু তদ্বারা বায়ুমাগর উচ্চতরে আদ্রুশ
বুদ্ধি হয় না।” স্থানবীর পৃষ্ঠ হইতে শুষ্ক
প্রাকৃতিক পরিচালিত ও পরিবাহিত

হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত বায়ুশির অধোদেশমাত্র উষ্ণ কিন্তু উর্দ্ধদেশ হিম।" পূর্কপুষ্ঠায় পরিবাহন কথাকে বলে বুঝান আছে। যদি এক কড়া জল চুলীতে গরম করিতে বসাই, তবে নিম্নের জল প্রথমে গরম হইবে। গরম জল লঘু হওয়াতে উপরে উঠিবে এবং উপরের জল নীচে আসিয়া পুনরায় গরম হইবে এবং উপরে উঠিবে। এইরূপে তাপ প্রবাহিত হওয়ার নাম পরিবাহন। সুতরাং পরিবাহনধারা যেরূপ এক কড়া জল সমস্ত সমান উষ্ণ হয় সেইরূপ সমস্ত বায়ু সমান উষ্ণ হইবারই কথা। অতএব উপরের বাতাস কেন শীতল সেই বিষয়ে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার বুদ্ধি এই—স্বর্ধাকিরণ দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় পরে পরিবাহন দ্বারা বায়ু উষ্ণ হয় কিন্তু পরিবাহন বশতঃ সমস্ত বায়ু সমান উষ্ণ হইবার কথা এইজন্য বায়ুশির অধোদেশ উষ্ণ ও উর্দ্ধদেশ হিম। যথেষ্ট বুলিয়াছি। উপরের বায়ু কি কারণে শীতল তাহা আমরা এইস্থলে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমে কোন বায়ুনির্ধাতনযন্ত্রের আবরণমধ্যস্থ বায়ু চাপ কমাইয়া দিয়া যদি পরে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করান যায়, তবে বায়ু প্রবেশকালে শীতল হইয়া পড়ে। এমন কি কোন কোন সময় বায়ু মধ্যস্থিত জলীয় বাষ্প কুণ্ডল-

টিকার আকার ধারণ করে। ইহার কারণ এই যে বাহিরের বায়ুর পূর্বে যে চাপ ছিল আবরণ-অভ্যন্তরে প্রবেশ কালে সেই চাপের হ্রাস হওয়াতে উহার আরতন বৃদ্ধি হয়। এই আয়তনবৃদ্ধির সময় বায়ু চতুঃপাশ্বস্তিত বায়ুর চাপের বিরুদ্ধে যে কার্য্য করিল কোন শক্তি দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা হইল। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আভ্যন্তরিক ভেদেব ক্রিয়াদংশ ক্ষয়িত হইয়া উক্ত কার্য্য সমাধা হইল সুতরাং বায়ু শীতল হইয়া পড়িল। আমরা জানি যে যত উপরে উঠা যায় বায়ুর চাপ তত কমিতে থাকে, সুতরাং ভূতলসম্মিকটস্থ বায়ু যখন উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে, যত উপরে উঠে তত তাহার চাপ কমিতে থাকে; সুতরাং তাহার আরতন বৃদ্ধি হয় ও শীতল হইয়া পড়ে; কিন্তু এইরূপে শীতল হওয়াতে উহার ঘনত্বের বৃদ্ধি হয় না সুতরাং পুনরায় নামিয়া আসিয়া আবার উষ্ণ হয় না।"

মহেন্দ্র বাবু কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বালকদিগকে বুঝান উচিত ছিল। যথা সানগী (Mass) লম্ব (Vertical) সমতল (Level) ইত্যাদি। তিনি যখন ভূমির অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন (১২৩ পৃষ্ঠা ভূখা নামক যে বস্তুটির দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত হয়) তখন ঐরূপ কথাগুলির অর্থ বুঝাইয়া দিলে অসম্ভব হইত না। কারণ আমরা লম্ব অর্থে perpendicular

এই অংশ অন্য সময়ে বঙ্গদর্শনে প্রতিকার রূপে সিদ্ধিবার বানগ্ন বহিল।

সমতল আর্দ্রে (plane superficies) বলিয়া বুঝি। জড়ের ওপরে মধ্যে জড়ের অবি-
নশ্বরতা গুণটির উল্লেখ করিলে বোধ হয়
বেশি ক্ষতি হইত না।

অধিক আর কি বলিব ইহাতে নাই
এমন কিছুই নাই। ইহাতে অন্তর্প্রাস
আছে, অলম্ব্যর আছে, শব্দবিনিয়োগ আছে,
ব্যবহৃত আছে, বর্থা (৯০ পৃষ্ঠা) “বায়ু না
থাকিলে পুরুতনন্দিনী স্রব্বাত্ত মলিনশা-
লিনী প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীগণ জলকল
রবে প্রবাহিত হইত না। বায়ু না
থাকিলে কাদম্বিনীর ললটদেশ সৌদা-
মিনীরূপ মিথিতে নমজ্জলিত হইত না।
ইহাতে সু আছে, কলিকল আছে, দিড়ি
আছে, কলপাত্রও আছে। মোট “হিঁয়া
নলিষু চ হ্যার, প্রাড্বিবৈক হ্যার, দুষ্টচ্যাবি

হ্যার” এর শেষ প্রোশংসাশ্রিত বিহায়।
সহেজ বাবু বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন
বাঙ্গালার বিজ্ঞানবিষয়ক সহজ বিষয়
জাইয়া কোন ভাল বই নাই বলিয়া তিনি
এই ভাল বই লিখিতে প্রবৃত্ত হন।
কিন্তু অক্ষয় বাবু যেরূপ পাদিকাৰূপে
বিজ্ঞানবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাও
পর মণ্ডেকবাবুর ভাল বই একটু পরিচাল
হইলে সুখী হওয়া যায়। যে যে বিষয়
তিনি ভালরূপ বুঝিয়াছেন তাহাই লি-
খিলে ভাল হইত।

মিনি এই সমালোচনার বিপক্ষে কিছু
বলিতে ইচ্ছা করেন তিনি এই বঙ্গদর্শনে
প্রতিবাদ লিখিয়া নকলকে জানাইলে
সন্তুষ্ট হইব।

শ্রীয. গো,

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

২। চতুস্তম্ভ—নাটকের চরিত্র।

অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটকে ছই বঙ্গম
নাটকর থাকে। একরকম নাটক
দুঃশ্যামান—নাটকের আখ্যায়িকা পড়িয়া
গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে
পাওয়া যায়। আর একরকম নাটক
অদুঃশ্যামান—নাটক পড়িয়া গেলেই
দেখিতে পাওয়া যায় না এবং বুঝিতে
পাওয়া যায় না—বুঝিতে হইলে ভিতরে
প্রবেশ করিতে হয়। একরকম নাটক

নাটকের কাহাতে আঁকা থাকে—দে-
খিতে ইচ্ছা কর আর মাই কর, নাটক
পড়িতে গেলে দেখিতেই হইবেক। আর
একরকম নাটক নাটকের গানে আঁকা
থাকে না—ইচ্ছা না করিলে দেখিতে
পাওয়া যায় না—ইচ্ছা করিয়া শুদ্ধিচার
টানিয়া বাহির করিতে হয়। বেক্সপীদ
রের হ্যামলেট নামক নাটক পড়িলেই
দেখিতে পাওয়া যায় যে যুবরাজ হ্যাম-

পেটের মন তাঁহার দুঃখা পিতৃবোর
সম্বন্ধে যাবপূর্ণ, জনাপূর্ণ, পিতৃহত্যার
প্রতিশোধমাসনাপূর্ণ, কিন্তু প্রতিশোধ
সাধনে অদৃষ্টময়—পিতৃব্যাপ্রাণসংহারে
অনিশ্চিতহস্ত। দেখিতে পাওয়া যায়,
নাটকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই
দ্বিভাবস্থিত। দেখিতে পাওয়া যায় যে
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুবর্ণা হাম-
লেট পিতৃবোর প্রাণসংহার করিবার জন্য
ভয়ানক আবেগবান, কিন্তু প্রাণসংহার
করেন করেন করিয়াও করিতে পারেন
না। এইটি হামলেট নাটকের দৃশ্যমান
নাটক—নাটকখানি পড়িয়া গেলেই
দেখিতে পাওয়া যায়—পড়িয়া গেলেই
চোকে পড়ে। কিন্তু এই দৃশ্যমান
নাটককের মূলে একটি গূঢ় বা অদৃশ্যমান
নাটক আছে—এই দ্বিভাবের মূলে
একটি দ্বিভাবোৎপাদক মানবপ্রকৃতি
আছে। যে বিশেষ মানবপ্রকৃতির বলে,
যে বিশেষ নানোপঠনপ্রণালীর স্তম্ভে কার্য-
ক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং সকলের মধ্যে এইরূপ
বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাই হামলেট
নাটকের গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটক।
এই গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটক দৃশ্যমান
নাটককের কারণস্বরূপ। দৃশ্যমান নাট-
ককের ন্যায় ইহাকে নাটকের পাশে
পরিচায়করূপে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়

না—গূঢ়নিহিত বলিয়া ইহাকে খুঁজিয়া
পাতিয়া গইতে হয়। অভিধান শব্দকোষ
নাটকেও ঠিক তাই। পূর্বপ্রস্তাবে যে
নাটককের কথা বলিয়াছি তাহা দৃশ্যমান
নাটক। এই দৃশ্যমান নাটককের মূলে
যে গূঢ় অদৃশ্যমান নাটক আছে এখন
তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্বপ্রস্তাবে আমরা ভ্রমস্থলদ্বন্দ্বের দ্বারা
বলিয়াছি তাহার সারমর্ম একবার
বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। ভ্রমস্থল কণ্ঠের
ভ্রমোবনে প্রণয় করিতে বলিয়াছেন—
একটি অনামান্য রূপলারনামসম্প্রদায় বাসি-
কার সহিত প্রণয় করিতে বলিয়াছেন।
এই প্রণয় করিতে বলিয়া ভ্রমস্থলের মহা-
পরীক্ষা হইয়া গেল। এ কিসের প-
রীক্ষা? এ কি ভ্রমস্থলের প্রবর্তের পরীক্ষা?
বোধ হয় অনেকে বলিবেন—হ্যাঁ তাই।
বোধ হয় অনেকে বলিবেন যে ভ্রমস্থল
কনামন্য ভ্রমোবনে একটি অল্পবয়সী,
সরসাননা, রাজসাহাধ্যায়মুখ্য তাপসবালাকে
দেখিয়া প্রণয় করিয়াছেন বলিয়া পাশে
কেহ কিছু যেন করে সেইজন্য মহাকবি
পরীক্ষাধারা দেখাইলেন যে সে প্রণয়
শব্দের প্রণয়। এ কথাটির একটি উত্তর
এই যে কালিদাসের ন্যায় প্রথমশ্রেণীর
কবিগণ হনিত প্রণয় হইয়া কখনও
কাব্য বা নাটক লেখেন না।* দ্বিতীয়

* যথাসিদ্ধ জরায়ু সমালোচক Dr. Hrici দেবদ্বারীরের হোনিও এবং জুলিয়েট
নাসক নাটকসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন—

"That the leading interest of this drama is centered in the loves
of Romeo and Juliet, is clear even to a child. Still I cannot persuade

উত্তর এই যে জনসেচনকার্যনিরত শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া তাঁহার পবিত্রহৃৎসবন্ধে ছয়স্থ যেরূপ মনোহর ফল জন, তাহাতেই সম্ভব যে ছয়স্থ দৃষ্টিভাঙকেরণে শকুন্তলার মহিত প্রণয় করিতে বসেন নাই। তৃতীয় উত্তর এই যে ছয়স্থ শকুন্তলাকে গাঙ্কল-বিধানে বিবাহ করিয়া বিবাহের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলাকে দিয়া বান। চতুর্থ উত্তর এই যে উপন্যাসের প্রারম্ভেই কবি ছয়স্থকে যেরূপ শাস্ত্র এবং পবিত্র মূর্তিতে দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা সমর্থন করা নিশ্চয়োজন। তবে আমরা এইটুকু স্বীকার করি যে এই পরীক্ষার পাত পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি অতি পরিকাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মনুষ্য-জন্মের প্রকৃতিপ্রকটন করা নাটকমাজে বই উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে শুদ্ধ পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য মহাকবি ছয়স্থকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে প্রকৃতি বুঝাইতে হইলে নাটক বিধিতেই হইবেক, এমন

কোন কথা নাই। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি লংফেলোর *Diangelina* নামক উপন্যাসিক কাব্য এই কথাটির একটি প্রমাণ। আমরা জানি যে ছয়স্থের মহা-পরীক্ষা ভয়ানক যথার্থ—আমরা জানি যে সেই পরীক্ষার পড়িয়া ছয়স্থ অশেষ যত্নব্যাভোগ করিয়াছেন। কিন্তু পবিত্র-ভাবে প্রণয় করিয়া কোন নৈতিক নিয়মে যত্নব্যাভোগ করিতে হয়? অতএব পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি দেখাইবার জন্য যত্নব্যাভোগ পরীক্ষা হইল, এ কথা মনে ভরা সমস্ত নীতিশাস্ত্রের, সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ।

তবে এ পরীক্ষা কিম্বের পরীক্ষা? প্রশ্নটা বড় গুরুতর। অতএব কিঞ্চিদ বাহুল্যবাহ্য্য প্রয়োজন। প্রথম প্রস্তাবে ছয়স্থের প্রণয়োগাথ্যান যেরূম বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ছয়স্থের প্রণয়ের স্বরূপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদয় যত্নব্যাভোগ। আমরা দেখিতে পাই ছয়স্থ প্রেমে উত্তেজিত হইবামাত্রই প্রেমাত্মবের স্বপ-

myself that the meaning of the whole piece is exhausted in the deification and entombment of love, and that this idea constitutes the groundwork of the play. On the contrary, Shakspeare can scarcely have designed to deify love merely as an inexpressible feeling—an intoxicating passion. That were, indeed, an idolatry of which art could never be guilty, even though, like the African with his Fetish, it should destroy its idol with its own hand."

Dr. Ulrich প্রণীত Shakspeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশে অক্ষম। আমরা দেখিতে পাই, যে দ্বন্দ্ব জন্মের হৃদয় প্রেমনিহন, সেই দ্বন্দ্বই জন্মের মন ধর্মভয়ে ভীত। প্রেম কি? না শারীরিক বিকারমুক্ত হৃদয়ের ভাববিশেষ। প্রেম একটি passion। ধর্মভয় জ্ঞানমূলক। সকলেই জানেন যে জ্ঞান এবং ভাব প্রায়ই পরস্পর বিরোধী। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বলেন যে sensation and perception bear an inverse ratio to each other। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমে মৃত্যু হইয়া সেই প্রেমের পাথে যে সকল কষ্টক আছে তাহা দেখিতে পান না। জন্মশকুন্তলার প্রেমে মৃত্যু হইয়া সেই প্রেমের পাথে যে সকল কষ্টক থাকিতে পারে তাহা বুঝিয়া দেখেন। ইহাতেই এক রকম বুঝা যায় যে মেস্সপীয়রের নায়ক ভাবের শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট; কালিদাসের নায়ক ভাবের শাসনে জ্ঞানের শাসনাধীন। ইহাতেই বুঝা যায় যে মেস্সপীয়রের নায়কের মনে তাঁহার ভাবের বিরোধী কিছুই নাই; কালিদাসের নায়কের মনে তাঁহার ভাবের বিরোধী জ্ঞান এবং জ্ঞানমূলক ধর্মভর আছে। তাই বলিতেছিলাম যে, জন্মের প্রণয়ের স্বরূপ হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আদ্যস্ত। এইখানে জ্ঞান একটি কথা বলা আবশ্যক। মেস্সপীয়রের নায়কের প্রেমের বিষয়, বাহুবলসম্বৃত—মটেগিউ এবং কেপুলেট বংশধরের চিরশত্রুতাসমিত। কালিদাসের নায়কের প্রেমে বাহুবলগ-

সম্বৃত বিষয় কিছুই নাই। জন্ম দেখিতে ছেন, শকুন্তলার সদয়ালিঙ্গা সুখহংস-ভাগিনী প্রিয়ধ্বা এবং অননুধা, শকুন্তলার বিবাহের ঘটকালীতে নিযুক্ত। তিনি বুদ্ধমান—বুঝিতেছেন যে আশ্রমের অনিন্দ্যিক। গৌতমী মন জানিয়াও ভান করিতেছেন যেন কিছুই জানেন না। তিনি অস্থগমন করিয়া অবগত হইয়াছেন যে স্বয়ং ভগবান্ কণ্ঠ কেবল উপযুক্ত পাঞ্জের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। বস্তুতই জন্মের প্রেমের একমাত্র বিষয় জন্মের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানমূলক ধর্মভাব।

তার পর আমরা দেখিতে পাই যখনই জন্ম শকুন্তলাভাবে ভোর তখনই মহাকবি তাঁহাকে সেই ভাবের প্রতিধ্বনী অবস্থার নিবেদন করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই, যখন জন্ম মোহান্তিত, তখনই মহাকবি তাঁহাকে পৃথিবীর কর্ণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। সকলেই জানেন যেখানে মোহান্তিত সেইখানেই কার্যশক্তির নাশ—সেইখানেই মনুষ্য প্রায় উদ্যমহীন। একবারমাত্র শকুন্তলাকে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য জন্ম লাগারত হইয়াছেন। হইয়া পৃথিবীর আহ্বানে পুনর্দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় রাজমাতার নিকট হইতে গৃহপ্রত্যাগমনের আজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ আত্মত্যাগ এবং আত্মত্যাগের সংঘর্ষ উপস্থিত। ইহার তাৎপর্য্য কি? বলা অন্যতরক যে শুধু

সাধারণে রানীভূষিত করিবার জন্য
করি এইরূপ ঘটনাকৌশল অবলম্বন
করেন নাই। কিন্তু এটি বলা আবশ্যক
যে এই আত্মভাব এবং আত্মতত্ত্বভাবের
সংঘর্ষ, আত্মতত্ত্বভাবেরই জয় হইল।
জয়ন্তের প্রেমশক্তির প্রবলতা প্রতিপন্ন
না হইয়া তাঁহার মতিদোহের এবং
কর্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা প্রতিপন্ন হইল।
তবে কেমন করিয়া বলিব যে জয়ন্তের
পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা?

আবার যখন জয়ন্ত শবুস্তলাকে পাই-
য়াও না পাইয়া প্রজ্জ্বলিতকূটীর ন্যায়
প্রেমসমন্বিত উদগার করিতেছেন, তখনই
স্বহাকবি তাঁহাকে বিপদের ভয়ঙ্করব
লম্বন করাইলেন। আবার সেই আত্ম-
ভাব এবং আত্মতত্ত্বভাবের সংঘর্ষ। এবং
আবার সেই রকম আত্মভাবের জয়
হইয়া আত্মতত্ত্বভাবের দোরতর উদ্বেক।
আবার সেই রকম প্রেমশক্তির প্রবলতা
চিজ্জিত না হইয়া সামাজিক প্রেমের
এবং কর্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা চিজ্জিত
হইল।

আর বলিবার আবশ্যক নাই। পূর্ক
প্রস্তাবটি মরণ কবিলেই অবশিষ্ট অবশিষ্ট
মটনান্তিমির অন্ধরূপ এবং ভাবগাভীরা
অমৃতক হইবেক।

এখন বোধ হয় বলা যাইতে পারে
যে জয়ন্তের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির
পরীক্ষা নয়, তাঁহার জ্ঞান এবং সংপ্রসূতি-
মূলক প্রজ্ঞাভাব এবং অনায়াসপরতার
পরীক্ষা। বিনা পরীক্ষার বিনা সংঘর্ষে

কৈম উপায়ের না। কিন্তু কে না জানে
যে সেই বিবর্ত চিত্তদর্শনের পুরোত্তমত্ব
নিহলজয়ন্ত বিহীনজ্ঞান জয়ন্ত বশন
বিপদের আকর্ষণে শুনিয়া বীরবিক্রমে
যজ্ঞকীর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন
বোধ হইল যেন একটা প্রকৌশল অসি-
শিখা বিপত্ত উদ্ভাবিত করিয়া উঠিল। তবে
জয়ন্তের মনের সংঘর্ষ কিসের সংঘর্ষ
হইতে পারে? আনন্দের বোধ হয় এ
সংঘর্ষ সেই মনের আত্মভাবের এবং
আত্মতত্ত্ব ভাবের সংঘর্ষ। আমাদের
বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই মনের আত্ম-
পরতার এবং সমাজপরতার সংঘর্ষ।
আমাদের বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই মনের
একঅংশের সহিত আর একঅংশের
সংঘর্ষ। সেক্সপীরের সর্বপ্রধান প্রেম-
তত্ত্বপ্রাপক নাটক, রোমিও এবং জুলি-
য়েট, এ রকমের নয়। রোমিওর মনের
সংঘর্ষের কারণ দুইটি বংশের চিরশত্রুতা
—নাহরগংমূলক। রোমিওতে, এক
দিকে একটি রিপূন্যস্ত মন, আর একদিকে
বাহ বা জুজুগং। জয়ন্তে, মনের এক-
দিকে একটি রিপূন্যস্ততা আর একদিকে
বাকি সমস্ত মনটাই। দুইটি পরীক্ষার
প্রণালী হই রকম। কোন প্রণালীটি
উৎকৃষ্ট, গঠে বলিয়া।

আমরা দেখিলাম যে জয়ন্ত একটি
আত্মতত্ত্বভাব বা সামাজিকভাব-প্রধান-
চরিত্র। আমরা দেখিলাম যেখানেই
জয়ন্তের মনের আত্মভাবের এবং আত্ম-
তত্ত্বভাবের সংঘর্ষ সেইখানেই তাঁহার

আয়েতরূপে বিজয়ী। আমরা দেখিলাম, যেখানেই আত্মসন্তোষ এবং সামাজিক ধর্মের বিরোধ সেইখানেই ছদ্মস্তর সামাজিকধর্ম প্রবলতর। এমন কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, সেই সামাজিক ধর্মভাবের প্রকৃতিটি বুঝিয়া দেখিতে হইবেক।

জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সম্ভবের সামাজিক প্রকৃতি দুইপ্রকার—একটি ভাবমূলক, আর একটি জ্ঞান বা যুক্তিমূলক। সামাজিক ধর্মাদর্শ—সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিতে হইলে জগতের কতকগুলি লোক নিজের বুদ্ধিশক্তিপ্রয়োগ না করিয়া পরের মতাবলম্বী হইয়া চলে; আর কতকগুলি লোক পরের মতানুসরণ না করিয়া নিজের যুক্তিশক্তিপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরের মতানুসরণ করিয়া সংসারধর্ম করা মোহের কার্য। সে মোহ শ্রদ্ধাভিমানমূলক। ভারতে এ পর্য্যন্ত এই মোহমূলক সমাজপ্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা সকলেই জানি যে এই প্রাণিসমূহ লোকসাগরতুল্য ভারতভূমিতে অতি পূর্বকাল হইতে ব্রাহ্মণ্যবাহী সামাজিক ধর্মাদর্শের এক মাত্র বহন—একমাত্র নিয়ামক। এখানে ধর্ম্যাচারী যাহাকে ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কোটি কোটি মানব তাহাকেই কার্যক্ষেত্রে ধর্ম বলিয়া অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। এখানে ধর্ম্যাচারী যাহাকে অধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন কোটি

কোটি মানব তাহাকেই কার্যক্ষেত্রে অধর্ম বলিয়া দৃঢ়পূর্বক পরিভ্রাণ করিয়া আসিয়াছে। উন্নতিশীল ইউরোপেও এই দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছে। দুই কি তিনশত বৎসর পূর্বে সমস্ত ইউরোপবাসী ভাগ্যের প্রণালীতে সংসারধর্ম করিত—রোমানক্যাথলিক ধর্মোদ্বিগ্ধগণের বাক্যই সমস্ত ইউরোপে একমাত্র ধর্মমূল, একমাত্র ধর্মনিয়ামক ছিল। এখনও অর্দ্ধাধিক ইউরোপবাসীর মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত। এই মানবপ্রকৃতি রহস্যের মূল কি? আমাদের বোধ হয় ইহার একটি মূল মনুষ্যমনের একরকম স্বাভাবিক অনন্যপ্রিয়তা—অনুসন্ধান করিবার শ্রমকাতরতাজনিত ইচ্ছাশক্তি বা will power এর ধর্মতা। আর একটি মূল, চিরদৃষ্ট উৎকৃষ্টতার সন্নিবেশ মনুষ্যমনের শ্রদ্ধার ভাব। ভাব জিনিস প্রাচীন হইলে অনেকে প্রভাবতই তাহাতে সমস্তের সহিত আসক্ত হয়। সে আসক্তি একটি মোহের স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে মোহে অর্দ্ধাধিক জগৎ মুক্ত। সে মোহে থগুন করা একরকম অসাধ্য বলিলেই হয়। আর কতকগুলি লোক যুক্তিধারা ধর্মাদর্শ নিরূপণ করিয়া থাকেন। তাহারা পূর্বোক্ত মোহে মুক্ত নন। তাহারা প্রাচীন মত, প্রাচীন পদ্ধতি, প্রাচীন বস্তুকে দৃঢ় করিয়া থাকেন। তাহারা নিজ বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এটিও মনুষ্যমনের একটি স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই প্রকৃ-

তির বঙ্গে ইউরোপে প্রটেক্টেট বিপ্লব ; ভারতে বুদ্ধদেবের সমাজসংস্কার। এই দুইটি মানবপ্রকৃতির কোনটিই পরি-
ত্যাগ নয়। কিন্তু দুইটি একত্রীকৃত না হইলে সমাজের বিঘ্ন অমঙ্গল ঘটে। সমাজ হয় ভারতের ন্যায় জনাট বাঁধিয়া উন্নতিসাধনে একক্ষণে অক্ষম হইয়া উঠে, নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ন্যায় অনন্তবিপ্লবাবর্তে ঘুরিতে থাকে। মনুষ্য-
জাতির এই দুইটি প্রকৃতিরই আবশ্যক। এবং মনুষ্যজাতির ইতিহাসেও দেখা যায় যে মনুষ্যজাতি সততই এই দুইটি প্রকৃতির সামঞ্জস্যসাধনের দিকে ধাব-
মান। ইউরোপে এবং এশিয়ায় মধ্যে মধ্যে যে সকল ভয়ানক সমাজবিপ্লব এবং ধর্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, সেই সকল বিপ্লব মনুষ্যজাতির এই স্বাভাবিক সামঞ্জস্যসাধনপ্ৰহার বলবৎ সাফলী। কালিদাসের দ্ব্যস্ত এই সামঞ্জস্যসাধন-
প্ৰহরুপ মানবপ্রকৃতির প্রতিকৃতি। দ্ব্যস্তে এই সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া গিয়াছে। সেইটি বুঝাইতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রে দ্ব্যস্তের অগাধ ভক্তি। তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল, তিনি ভাবিলেন—

“অয়ে শাস্ত্রনিদমাশ্রয়পদং ক্ষুরতি চ

বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাশ্রয়কং।

অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারানি

সর্বত্র।”

এ ভক্তি বড় কম ভক্তি নয়। আমরা এরকম ভক্তিকে কুসংস্কার বলি। আমরা

এইরূপ বুঝি যে পৌরোহিত্যের মোহে মূর্ত হইয়া জ্ঞানভট্ট না হইলে এরকম ভক্তি মনে স্থান পায় না।

দ্ব্যস্ত এমন বিশ্বাস করেন যে অন্তো-
দ্যায়ক করিলে, তিনি তাহার ফল-
ভাগী হইতে পারিবেন। তিনি বলেন—
“অন্যামেব ভাগশ্চে মেচে তপস্বিনো মে
নির্ব্বপস্তু।”

দ্ব্যস্ত প্রচলিত প্রথার পক্ষপাতী। বুদ্ধ-
কপুকের কাছে শাস্ত্রের প্রকৃতির আপ-
মানবার্তা পাইয়া তিনি বলিতেছেন—

ভেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং যদ্বচনাদ্রুণাধ্যায়ঃ
সোমরাতঃ, অনুনাশ্রয়বাসিনঃ শ্রোতেন
বিধিনা সংকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতু
মর্হতীতি। অহমপি এতান্ তপস্বিদর্শ-
নোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি।

দ্ব্যস্ত হিন্দুধর্মাস্তর্গত কর্তব্যগুণ মানিয়া
থাকেন। তাঁহার গৃহে পবিত্র আহবনী-
য়াগি মন্ডরে রক্ষিত—

রাজা। উখাম। বেজবতি। অগ্নি-
শরণমার্যমাদেশয়।

দ্ব্যস্ত মনে করেন যে ভারতের মুনি-
ঋষিগণ দেবতুল্য। তিনি মুনিঋষিকে
দেবতানির্কশেষে ভয় করেন, ভাল-
বাসেন এবং সন্মম করেন। তিনি জানেন—
যে—

শয়শয়ানেষু তপোবনেষু গৃহং হি দাহা-

শ্রক মন্তি তেজা।

স্পর্শাহুলা অপিস্থ্যাকাতা শ্বে হন্য-

তেজোহিতিভবাদহন্তি ॥

পাঠক বোধ হয় সহজেই আকার

করিলেন যে, যে ব্যক্তির মনের বিশ্বাস এইরূপ, সে ব্যক্তি পৌরোহিত্যকৃত্তকে অভিজ্ঞত। পাঠক যৌথ হয় বলিবেন, যে ব্যক্তির মনের দাব এই রকম, সে ব্যক্তি ইউরোপের 'মধ্যযুগের' ন্যায় পৌরোহিত্যপ্রধান যুগের লোক বই উন-বিংশশতাব্দীর ন্যায় জ্ঞানপ্রধান যুগের লোক হইতে পারে না।

দুঃশস্তের কাছে মনিষ্যবির স্বার্জা দেবার ন্যায় মাননীয় এবং গালনীয়। তিনি যুগয়ার খরতর ঔষধকো প্রধাবিত হইয়া ভয়কুচিত পলারনপর-মুগোপরি অব্যর্থ শব্দ নিক্ষেপ করেন করেন, এমন সময় ঋষিদিগের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সেই আজ্ঞামূলবিত উল্লসাগিতোত্তেজিত বলগারবাহু গুটাইয়া গিয়া। তিনি সেই বীরহস্তোণযোগী শান্ত শব্দ কুবীরের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

তো তো রাজনু আশ্রমমুগ্ধেহং ন
কস্তবো ন হস্তবাঃ।

ন খনুন ন খলু বাণঃ সরিপাত্যোহয়

যশিনু

মুহুনি যুগশরীরে ভুলয়াশাবিবাগিঃ।

ক বত হরিণকানাং জীরিতক্কাতি লোলং
ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারঃ শরা স্তে ॥

তত্রাত কৃতসন্ধানং প্রতিমংহত সায়কম।

অর্তিজাগার বঃ শব্দং ন প্রহরুসমাগসি ॥

তজ্জা। নপ্রাণমম। এষ প্রতিনং-

কৃত এব। ইতি যথোক্তং করেতি।

‘সমাগমন। এষ প্রতিনংহত এবা’

বলিতে গেলে, দুঃশস্ত তাঁর প্রাণমক্ষ-
রিতে করিতেই সেই তুর্দমনীয় শব্দ
শব্দধারে ফেলিয়া দিলেন। যুগযোদ্ধা
বীরচূড়ামণি বেন একটা জঠরানলক্ষিত
কেশরীর ন্যায় কোন একটা বৈজ্ঞাতিক
শক্তিধারা আহত হইয়া নিম্নেয়নমো
বিনষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। শকুন্তলা
নাটকের প্রতিশব্দেতে দুঃশস্তচরিত্রের
যেটি প্রধান লক্ষণ, অর্থাৎ বিরোধিতাবের
অবিরোধে অবস্থান, সেটি প্রতিগয়।
এমন নাটক কি আর হয়!

আর বিস্তার না করিয়া এক কণাও
বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে
পৃথিবীর ১২০ কোটি মানবের মধ্যে অধ-
নত ৭০ কোটি মানব যেমন পুরাতন
প্রথার কাছে এবং পুরাতন প্রথার যাক-
দিগের কাছে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মোহাভি-
ভূত, কালিদাসের দুঃশস্তও ঠিক তাই।
কিন্তু তাই বলিয়া দুঃশস্ত কি সেই ৭০
কোটি মানবের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিহীন?
তাই বলিয়া দুঃশস্ত কি সেই ৭০ কোটি
মানবের ন্যায় নিজে ভাল মন্দ বিচার
করিতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক—ধর্ম্মা-
চার্যেরা যা ভাল বলেন তাই ভাল মনে
করেন, ধর্ম্মাচার্যেরা যা মন্দ বলেন
তাই মন্দ মনে করেন? না, দুঃশস্ত সে
প্রকৃতির লোক নন। শাস্ত্রের ব তাঁ-
হাকে বলিলেন যে পূজ্যপাদ মহা ঋষি
কণু তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়-
কাণ্ডের অনুমোদন করিয়া শকুন্তলাকে
তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, অত-

এম কীলারে শুকুন্নাকে গ্রহণ করিতে
হইবে। এ কথা শুনিয়া তিনি কি
বলিলেন ? তিনি বলিলেন—

অরে। কিমিদগুণনাস্তম্।

এ কি! মহর্ষি কণ্ঠ বলিয়াছেন যে
তিনি শকুন্তলার পানিগ্রহণ করিয়াছেন।
তাহাতে তাপসকুলসঙ্গমকারী, তাপস-
কুলগণকপাতী, তাপসকুলভীত, তাপস-
কুলসঙ্গক দম্বস্তের কি এই উত্তর ?
আবার শুধু তাই ? এই অসম্ভব উত্তরটি
শুনিয়া শাপ্ত রব ঈর্ষ্য রোষাম্বিত হইয়া
বলিলেন—

কিং নাম কিমিদগুণনাস্তমিতি। অহু
ভবন্তএব হংসরাং লোকুত্তরাস্তা নিষ্কাস্তা।

মহীমণি জ্যোতির্কৈদৈকসংশ্রয়াং

জেনোহনাথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।

অতঃ নবীপে গ্ররিণেতুরিষাতে

প্রিয়ারপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববদ্ধতিঃ।

এ কথা শুনিয়া হুম্বস্ত কি বলিলেন—
তিনি বলিলেন,

কিমত্র ভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা।

এ ত সেই অগ্নিপ্রস্ত সনাতনযজ্ঞনিরত
ঋষিকুমারসং এক রকম মিথ্যাবাদী বলা।
আজ রথ ভারতের একজন তেজস্বী ঋষি-
কুমার। নন্দ্রাহত হইয়া তিনি সমাগম
পাণ্ডবীর রাক্ষা হুম্বস্তকে স্নেহপূর্ববাক্যে
জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং কৃতকার্যদৈমাকর্মণ্য প্রতি বিমুখতো

চিঁতা রাজ্যঃ ?

হুম্বস্ত উত্তর করিলেন—

কৃত্যাসংসমং কলনাপ্রাণঃ।

ভারতের ঋষিভাবী প্রবঞ্চক ? আজ
হুম্বস্ত তাও মনে করিতে সক্ষম। ইহার
অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই—যেখানে
ভারতের ঋষিভাবী সত্যের বিরোধী,
কুনীতিনিগমক, ধর্মের বিপর্যায় করিতে
উদ্যত, সেখানে ঋষিকুলগণকপাতী, ঋষি-
কুলসঙ্গমকারী হুম্বস্ত ঋষিবাক্যে হত-
প্রভ। ইহার অর্থ এই—যেখানে শবিত্ত
ঋষির বাক্য সনাতনমতের, অপরিবর্ত-
নীয় অনপলাপ্য নীতি এবং ধর্মতত্ত্বের
বিরোধী, সেখানে হুম্বস্তের কাছে ঋষি-
প্রদত্ত ব্যবস্থা অপরিগ্রহণীয়, নিজমুক্তি-
মূলক নীতিতত্ত্বই অল্পময়ণীয়। বিশ্ব
কলস ঋষিবাক্য অসত্য বন্ধিগ্রাও ঋষি-
ধিগের প্রতি কোপাবিষ্ট নন—ঋষি-
ধিগের প্রতি অপ্রজ্ঞাবান্ নন। শাপ্ত রব
সিখ্যা কথা কহিতেছেন ব্রিহদ্রাও হুম্বস্ত
বলিতেছেন—

তো স্তপস্বিন্ চিত্তমগপি ন পশু স্বীকরণ

মজ্জভবতাঃ প্রাণিনি।

কংকর্ণমিনামভিবাক্তমস্বয়ংকণাং প্রত্যাহ

প্রাণং কেবলমশ্রবমানাং প্রতিশাস্যে।

ঋষির মুখে অশ্রব্য কথা শুনিয়াও
হুম্বস্ত ঋষিচরিত্রের পবিত্রতা মনে করিয়া
এখনও ঋষির প্রতি অপ্রজ্ঞাবান্—এখনও
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছেন, কখনটা
সত্য কি না। সম্ভবের ইতিহাসে প্রায়ই
দেখা যায়, যেখানে স্বাধীনচিন্তা সেই
খানে প্রাচীন প্রথাহুদাগী আচার্যকুলের
প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা—সেইখানে পূর্বা-
শপ্ত প্রচলিকপ্রচার প্রতি সম্পূর্ণ দুর্গাপ্র

এবং প্রতিবন্দী ছািব। প্রটেস্ট্যান্ট মর্যাদা দলদীক্ষিতের কাছে পোপের নাম Anti-Christ এবং রোমান ক্যাথলিক মর্যাদা শয়তানের মড়ক। বুদ্ধের কাছে স্রাজ্জব চণ্ডাল এবং বেদ-পূরণমূলক মর্যাদা পোপের হিতাদিত কুম্ভকারকুণ্ড। ছদ্মস্বে জগতের দুইটি সামাজিক মানবপ্রকৃতি একত্রীভূত; কিন্তু তাহাদের সংঘর্ষে কণ্ঠশতা নাই—সমাজদুঃখকারী প্রতিশিখা উঠে না। একপা সংঘর্ষ অসম্ভব নয়। ইংলণ্ডের ১৬৮৮ সালের রাজবিপ্লবে ইহার সম্ভবতা প্রতিলম্ব হইয়াছে। এবং আধুনিক মনুষ্যসমাজও বিনাবিরোধে এই দুইটি প্রতিবন্দিতাব্যাপন্ন মানব-প্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধনের দিকে ধাবমান দেখা যাইতেছে। কোমন্সের সমাজ-বর্ণনের অবিস্তার এই স্মৃতির প্রধান নিদর্শন। দুঃস্বপ্ন এই গুঢ় ঐতিহাসিক নিরমের চিত্র। ছদ্মস্বপ্ন এই অদ্ভুত ঐতিহাসিক মানবপ্রকৃতির প্রতিমূর্তি। ছদ্মস্বপ্ন লম্বা ঐতিহাসিক মনুষ্যসমাজের গুঢ়ার্থ-বোধক চরিত্র। ছদ্মস্বপ্ন ভূতকাল এবং ভবিষ্যৎকাল—উভয়কালের সমষ্টি। ছদ্মস্বপ্ন সমস্ত মনুষ্যজাতির ঐতিহাসিককল্পিত নিরতির কবিকল্পিত প্রতিমা।^{১০} এত বড় চরিত্র জগতের আর কোন নাটকে

আছে কি না জানে। কালিদাস বোধ হয় এত ভাবিয়া ভেপেন নাই। কিন্তু কবির প্রতিভার ভবিষ্যৎইতিহাসও নিহিত থাকে। কবি ভাবের চক্ষে মানব-প্রকৃতির অনন্ততর দেখিয়া থাকেন এবং প্রতিভার গুণে মনুষ্যচরিত্রের মর্যাদা দীপ্য শৌন্দর্য অমৃতত্ব করেন। তবে কালিদাসের মঞ্চও একটা কথা বলা যাইতে পারে। তিনি দৌলবিপ্লবের পর ক্ষয়গ্রস্ত করেন।

ছদ্মস্বপ্ন প্রচলিতমত এবং প্রচলিতপ্রথার অজুরাগী অথচ স্বাধীনচিন্তাশীল। ইহার অর্থ কি? আমরা দেখাটীয়াছি যে প্রচলিতপ্রথার প্রতি অজুরাগ মনুষ্যজাতির একটি মোহের স্বরূপ। মোহ অন্ধ—যাহাকে অতিক্রম করে তাহাকে কিছুই দেখিতে দেয় না। ছদ্মস্বপ্ন সেই মোহের বশবর্তী হইয়াও স্বাধীন। ইহার অর্থ—ছদ্মস্বপ্ন অন্ধ হইয়াও অন্ধ নয়। অর্থাৎ আবশ্যক হইলেই ছদ্মস্বপ্ন জ্ঞানেরদ্বারা মোহের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন—দৃষ্টি-নাশকারিতা দেখিতে পান। কিন্তু শুধু তা হইলেই কি হয়? এমন লোক আছেন, যাহারা ছদ্মস্বপ্নের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন কিন্তু বুঝিয়াও ছদ্মস্বপ্ন পরিভাগ করিতে পারেন না। না পারিবার

^{১০} বোধ হয় প্রাচীনভারতে ঐতিহাসিক প্রণালীতে মানবপ্রকৃতি নিকটপরিবার রীতি ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যে ব্যক্তি ব্যক্তি-বিশেষ সম্বন্ধে সামাজিক চরিত্রের গুঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনি যে ইতিহাস পাইলে সেই তত্ত্ব ঐতিহাসিক প্রণালীতেও বুঝিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন স্থলে যে ব্যক্তির মত ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝাইলে কোন বোঝা পড়ে না।

কারণ কি? একটি কারণ তাঁহাদের সংপ্রবৃত্তির শক্তিহীনতা; আর একটি কারণ অতিভাবাবস্থা হইতে উৎপন্নশক্তির অভাব। মনের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে হইলে চেষ্টা বা উদ্যমের (effort) আবশ্যক। যে অবস্থা পরিত্যাগ করা যায় সে অবস্থা যতই অভিভাবকারী হয়, তাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা ততই বলবৎ করা চাই। এই চেষ্টার মূল—ইচ্ছাশক্তি বা will power।

দৃশ্যস্তব মূনিজীবির প্রতি প্রেম এবং শ্রদ্ধা যে রকম প্রবল দেখিয়াছি তাহাতে তাহাকে মোহ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মূনিজীবী অপেক্ষা ভাল জিনিষের প্রয়োজন হইলে, দৃশ্যত সহজেই সেই মোহ কাটিয়া ফেলিয়া সেই উৎকৃষ্টতর বস্তুটি লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার অর্থ এই যে দৃশ্যত সংপ্রবৃত্তির আধার। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রথর বলিয়া তিনি সহজেই মোহের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিলেই সংপ্রবৃত্তি তাঁহার মনকে অধিকার করে। অধিকার করিলে পর তাঁহার আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তিনি বিনা আয়াসে মোহমুখাবস্থা হইতে অভিন্নমিত উৎকৃষ্ট অবস্থায় গমন করিতে পারেন। এখন ভিজাস্য এই—দৃশ্যত এই আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তি কোথায় পাইলেন? এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে, সকল লোকে যেমন আর আর মানসিক গুণগুলি সমানে পরিমাণে পায়

না, তেমনি তাহার ইচ্ছাশক্তিও সমান পরিমাণে পায় না। বিতীয় উত্তর এই যে, মানসিকশক্তির মূলপরিমাণ বড়ই ছোট না কেন, সে শক্তি যতই প্রয়োগ করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুঃস্বপ্ন রাজা। পৃথিবীর কর্মক্ষেত্র বাঙালিগণের নাট্যশালা; সেইখানেই তাঁহাদিগকে অভিনয় করিতে হয়। নানা প্রকৃতির লোকের সহিত, নানানতাবলম্বী সম্প্রদায়ের সহিত, অসংখ্য পরস্পরবিরোধী সমস্যার সন্নিহিত, অসংখ্য অভাবময়ী সহস্রাসংখ্য বিপদের সহিত তাঁহাদের সংস্রব। এই সকল গোলমালের মধ্যে থাকিয়া, এই সকল গোলমালের সীমাংসা করিয়া, তড়িবৎ কার্য্য করিতে হয়। দীর্ঘস্থিতি জগতের কার্য্যক্ষেত্রে অনর্থের মূল। এমনকালে নিজের স্বথস্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চলে না, অপ্রথর-বুদ্ধি হইলে চলে না। দীর্ঘস্থিতি হইলে চলে না। পাঠক এখন সহজেই বুঝিবেন যে এইরূপ কর্মক্ষেত্রেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের বেশী প্রয়োজন এবং সেইজন্য ইচ্ছাশক্তি বেশী আয়ত্ত এবং অভ্যস্ত হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন, ভাগেরান, পামার্টন, ডিন্‌রেলি, বিসমার্ক—এই সকল রাজা এবং রাজমন্ত্রিগণের অসীম ইচ্ছাশক্তির কথা কে না জানে? কপূরী পর্ব্বতায়নের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে দৃশ্যত আসন্ন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ-কার্য্য স্বয়ং করিয়া থাকেন। সে স্থলে দৃশ্যস্তব ইচ্ছাশক্তি যদি অসীম বল এবং

অনাগামপ্রয়োজ্য না হইবে তবে হইবে কার? প্রথম প্রস্তাবে আমরা দুঃস্থের যে আশ্রয় চিন্তাসংঘের চিত্র তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছি, পাঠক বোধ হয় এখন সেই আশ্রয় চিন্তাসংঘের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুঃস্থের চিন্তাসংঘম শক্তি এত অবলম্বন? না দুঃস্থ পুরুষ-প্রধানের ন্যায় জগতের প্রতি মত্তাবপূর্ণ হইয়া, অধঃবৃদ্ধির অধিকারী হইয়া পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করত ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত করিয়াছেন বলিয়া।

এইটী দুঃস্থের মনোগঠনপ্রাণীর গূঢ় তত্ত্ব—গূঢ় নাটকত্ব।

শকুন্তলা নাটকের পঞ্চমাদিবর্ণিত প্রস্তাব্যান-দৃশ্যটী দেখিয়াই আমরা দুঃস্থ চরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম। সে দৃশ্যটী দুঃস্থের সামাজিক জীবনপ্রণালীর উদাহরণরূপ। কিন্তু সে দৃশ্যের হেতু দুর্কীশার শাপ। তাই আমরা প্রগমেই বলিয়াছি যে দুর্কীশার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা এবং সেই ঘটনা আছে বলিয়াই শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।



শিক্ষা।

মহুযাজীবনের উদ্দেশ্যনামক প্রস্তাবে যেখান হইয়াছিল, যে ভূমিষ্ঠ হইবার পর মহুযা সাতাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমাজের ধার করিয়া যায়, তাহার পর এই ধার শোধ দেওয়া মহুযার অবশ্য কর্তব্য কর্ম হয়। এই অবশ্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়া যদি সমাজের আরো কিছু উপকার করা যায়, তাহা হইলে মহুযাজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধার করিয়া যাহা খাইয়াছ, তাহা ত শোধ দিবেই; শোধ দেওয়ার উপর আরো কিছু বাড়তি করা চাই।

যে সাতাইশ বৎসর আমরা ধার করিয়া যাই, সেই আমাদের শিক্ষার সময়ও দেখুপুষ্টির সময়। আমরা প্রতিভা-

শালী লোকের পক্ষে এ কথা বলিতেছি না। প্রতিভাশালী বা জিনিয়স বলিয়া এক একজন লোক আছেন আমরা স্বীকার করি। ইহাদের শরীর পুষ্ট না হইতে পারে, ইহাদের সকল মনোবৃত্তি সম্যক পরিচালিত না হইতে পারে, তাহা পি ইহারা জগতের অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারেন। শরীর অল্পস্থ, মেজাজ খিটখিটে, কুজিয়াসক্ত, অশুভ তাহার পুণিবীতে অনেক বড় বড় কাজ করিয়া অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ প্রস্তাবে তাহাদের কথা বলিতেছি না। প্রতিভাশালী লোকদিগকে আমরা তত্ত্ব করি ভয়ও করি। তাহাদের কার্যধারা মহুযা-

সমাধেই উপকার হয় বলিয়া ভক্তি করি। তাঁহারা নিজে মনোব্রত প্রকাশ করিয়াও বড় বড় কাজ করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বিত হই। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্তে জগতে অনেক অনিষ্ট হয় বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে বড় ভয় করি। জিম্মিনস দূর হইতে ভাল; কিন্তু নিকটে অতি ভয়জনক, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকের ক্ষতি হয়। অতএব আমরা এ প্রস্তাবে জিম্মিনসের নামও করিও না, বাহ্য মনুষ্য-সাম্প্রদায়ের পক্ষে পাটে এইরূপ কথাই কহিব।

সাধারণমনুষ্যের পক্ষে শরীরটি মনস্কর্মাগ্রে প্রয়োজন। তাহার পর মনোবৃত্তি-জালিও পুষ্টিসাধন প্রয়োজন। মনুষ্যের মনোবৃত্তি তিন প্রকারের—বুদ্ধিশক্তি, জ্ঞানবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি বা কর্মক্ষমতা। এই তিনেরই মাতাইশ, বৎসরের মধ্যে পরিচালনা চাই। মনুষ্য পৃথিবীতে পড়িয়া আপনাব শিক্ষাবলী অতিক্রম করিয়া বাহ্যতে সকল দিকে চক্ষু রাখিতে পারে, সকল জিনিস বুঝিতে পারে, সকল প্রকার লোকের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে ও সকলপ্রকার কাৰ্য্য করিতে পারে, তাহার শিক্ষা এই মাতাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে হওয়া চাই।

✓ শিক্ষা একমুখী হওয়া কিছু নহে, উহা বিষতোমুখী হওয়া চাই। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বামনাই শিক্ষা পাইত, ক্ষত্রিয়েরা রাজাই ও সভাই শিক্ষা পাইত, চুতোর চুতোরি শিপিত। এক

মনস্কর্মে ইউরোপেও ঠিক এইরূপ ছিল। একমুখীশিক্ষার নিশ্চয় ফল অসমতা, নিকৃষ্টতা। একমুখীশিক্ষায় মানুষ তৈয়ারি হয় না কল তৈয়ারি হয়। যে কোন লোকের চারিদিকে নগর পাশে একমুখগণ সকলেই তাহার অধীন হইয়া পড়ে। অতএব বাহ্যতে সকল দিকে নগর জন্মে, তাহার চেত্না করা নিতান্ত আবশ্যক। স্বীকার করি যে, মানুষের পক্ষে সকল বিষয় জ্ঞান নিতান্ত অমোঘ, সকল কাজ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সকল বিষয়ে স্মৃতি থাকি ও সকলের সহিত সমবেদনা থাকা একান্ত অসম্ভব। স্বীকার করি, মানুষের জ্ঞান ইচ্ছা ও জ্ঞানবৃত্তি সকল চারিদিকে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির নিয়মসমূহ লোহময় বেড়া দিয়া মনুষ্যকে বলিতেছে তুমি এই পর্য্যন্ত যাইও ইচ্ছা অধিক যাইবার ক্ষমতা তোমার নাই। এ সকল স্বীকার করি, তথাপি যতটুকু মনুষ্য জানিতে পারে ততটুকু জানিও প্রয়োজন। ✓ ততটুকু জানিতে সে কয়টি মনোবৃত্তি সতেজ ও সবল থাকা প্রয়োজন সে কয়টিকে ত সতেজ ও সবল রাখা চাই। এইটি শিক্ষার কাৰ্য্য এইটি শিক্ষকের ভার, এইটির জন্য বয়স মারী।

শরীর ও মনের যেকোন নিকটসঙ্গ তাহাতে শরীরের উন্নতির প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখা উচিত। মনুষ্যের শরীরও কণের মত। অধিক দিন শরীর না

চলিলে ইহাতেও মরিচা ধবে, এবং অধিক বলে অধিক খাটাইলে ইহারও কল বিগড়িয়া যায়, ঠিক সময়ে দম দিলে যেমন ঘড়ী অনেক দিন চল সেইরূপ নিয়মিত শ্রমেও মনুষ্যশরীর অনেক দিন টিকে। যে কয়েক বৎসর পুঞ্জের ভরণ-পোষণ করিতে হয়, সেই কয়েক বৎসরে যাহাতে পুঞ্জের সর্বাঙ্গ স্বন্দররূপে পরিপুষ্ট হয় তাহাযে পিতামাতার বিশেষ যত্ন থাকে অন্ততঃ সে বিষয়ে ইচ্ছা থাকে। কিন্তু অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অথবা উদ্যোগ স্বভাবে অনেকে সন্তানের দেহপুষ্টিমধ্যে ব্যাঘাত ঘটান। কেহ কেহ কেবল মেহ-পরবশ হইয়া তৎপক্ষে অনিষ্ট ঘটান। নোড়িওনা পড়িয়া যাবে, শ্রম করিও না ক্লান্ত হবে, এ সকল মেহপাক্য কতদূর অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে তাহার সমালোচনা এখনে আমরা করিব না। মূলকথা শরীর পুষ্ট করা যে আবশ্যিক তাহাতে কাহারও দ্বিধা নাই। এই পুষ্ট-শব্দে যে শুদ্ধ হস্তের বা শুদ্ধ পদের পুষ্টতা নয় সে বিষয়েও বোধ হয় কাহার অমত নাই। যে সকল লজ্জীভূতা লোক পুঞ্জের ভরণপোষণ ও পুষ্টিবর্জনবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নানাপ্রকারে শ্রম করেন, তাহারাই ভিন্ন সকলেই পুঞ্জের শরীরপুষ্টিবিষয়ে মনোযোগী আছেন।

কিন্তু মানসিক পুষ্টিবিষয়ে একরূপ একমত নাই। কোন আতি পর্য্যশিক্ষাদানই পিতামাতার কর্তব্য মনে করেন। কোন আতি পুত্র বাহাতে অন্ন করিয়া থাইয়া শাস্ত

শিতাকে অব্যাহতি দিতে পারে, তাহা-বয়ে শিক্ষা দেওয়াই পিতার কর্তব্য মনে করেন। কিন্তু আমরা বলি যেমন শরীরের সর্বাদৌল পুষ্টি প্রয়োজন মনে-রও সেইরূপ সর্বাদৌল পুষ্টি বাঞ্ছনীয়। শরীরের পক্ষে যেমন বাহার সর্বশরীর সফল নহে সে ভাল বেহার হইতে পারে না, ভাল মুটিয়া হইতে পারে না, ভাল দাড়ী হইতে পারে না, ভাল বাকী হইতে পারে না, মনের পক্ষেও সেইরূপ; বাহার মনোবৃত্তিসমূহ সম্যক পুষ্ট নহে, যে কখন ভাল উকীল হইতে পারে না, ভাল ডাক্তার হইতে পারে না, ভাল কবি হইতে পারে না, খুব উত্তমরূপে কোন কাজই করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া বাহার দেহ খুব পুষ্ট নয় সেকি বাকী দাড়ী হইতে পারে না? অবশ্যই পারে, কিন্তু তাহার ভাল হইবার সম্ভাবনা বড় অল্প থাকে। সেইরূপ বাহার মন সম্যক পুষ্ট নহে সেকি উকীল, ডাক্তার, কবি হইতে পারে না? অবশ্য পারে, কিন্তু ভাল হইবার সম্ভাবনা অল্প। একজন ছোবান লোক ভাল বাকী হইয়াও যদি দরকার পড়ে যে অতি অল্পদিনের মধ্যে দাড়ীর কাজ, বেহারার কাজ বা ঘোণাড়ের কাজ অন্যারূপে শিখিয়া লইতে পারে। কিন্তু একজন রোগা বাকী তাহা কখনই পারে না। তাহার বাকী হইবার মত শরীর বনিয়া গিয়াছে; তাহার আর কিছু হইবার যো নাই। আর কিছু হইতে গেলে

যে পদার্থটুকু যাঁকা চাই সেইটুকু তাহার
জন্মে নাই। বহির্জগতে যেকোন অত-
জ্ঞগতেও ঠিক সেইরূপ। 'স্বাহার শিক্ষা'
বিশ্বভোমুখী তাহার কোন একটি বিষয়ে
সমতা অধিক হইলেও সে সকল কাজই
মোটামুটি করিতে পারে। সংসার
করিতে গেলে সকল কাজই যে মোটামুটি
করা চাই বা জানা চাই, তাহা বোধ হয়
কেহই অস্বীকার করিবেন না। স্বাবলম্বন
উন্নতির মূল। ইহাতে কাহারও সন্দেহ
নাই। সকল কাজ মোটামুটি করিতে
শিখিলে স্বাবলম্বনপ্রযুক্তির প্রকৃত উন্নতি
করা হয়। আর এক কথা এই, অতি
প্রাচীনকালে পণ্ডিত হইলেই লোকে
তাঁহাকে সর্কজ্ঞ বলিত। সর্কজ্ঞ ও অ-
জ্ঞান্ত এক কথা নহে, কিন্তু সর্কজ্ঞদের
অর্থযত্নের বাড়ান বাইতে পারে অধুনা-
তন ভট্টাচার্য্যেরা বাড়াইয়া উহাকে
অভ্রান্তসমপর্দায়ক করিয়া ভুলিয়াছেন।
আরো বা পণ্ডিতেরা যে সর্কজ্ঞ বলিয়া
প্রথিত হইতেন ইহার কারণ কি? শুদ্ধ
আরোই বা কেন! আরিষ্টটেল প্রভৃতিও
সর্কজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন! ইহার
কারণ তাহারা যে সমাজে বাস করিতেন
সে সমাজে সাধারণলোকের মন অগুচ
ছিল আর তাঁহাদের মন সম্যক পুষ্ট ছিল
অর্থাৎ মোটামুটি অনেক বিষয়ে তাঁহাদের
জ্ঞান ছিল, সুতরাং সামান্য লোকে
আপনার সঙ্গে তুলনা করিয়া (তুলনার
অনন সামগ্রী আর নাই) তাঁহাদের
সর্কজ্ঞ দৃষ্টরাগুণীত বলিয়া মনে করিত।

যান্ত্রিকও যখন সমাজের অভাব অনু-
ধাকে, সমাজের সেই প্রথম অবস্থায়
দুই পাচজনলোক পুষ্টিমন্ডা থাকেন, তাঁহা-
দের দ্বারাই সামান্য সামান্য সমস্ত সম্রাট
পূরণ হয়, সুতরাং সামান্য অভাব পূরণের
জন্য মোটামুটি জ্ঞানে চলিত। এখনও
সেইরূপ গৃহস্থের সামান্য সামান্য অভা-
বের জন্য গৃহপতির নিজের মোটামুটি মন
জিনিস জানা চাই।

আর এক কথা। পুষ্টিমন্ডা ব্যক্তিগণের
মধ্যে একমুখী শিক্ষা আরম্ভ হইলে সমা-
জের শ্রীবৃদ্ধি হয় কিন্তু প্রথম নানা বিষয়ের
শিক্ষা আবশ্যক; তাহার উপর একমুখী
শিক্ষা হইলে উপকার হয় নতুবা এক-
মুখী শিক্ষা অনিষ্টকারী। তাঁতির এক-
মুখী শিক্ষা, এই জন্য তাহারা সংসার-
ব্যাকায় এত অপটু যে তাহারা উপহাসের
স্থল হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব আগে মোটামুটি শিক্ষা, তার
পর একবিষয় শিক্ষার প্রয়োজন। আগে
সব জিনিসের কিছু কিছু, তাহার পর
এক বিষয়ের সবটা। এ বিষয়ে আর
একটি কথা আছে। মানুষ জড়িগো
উকীল হয়, উকীল হইয়া কেহ জন্মে
না। সুতরাং আগে মানুষের শিক্ষা
তাহার পর উকীলের শিক্ষা। মানুষের
শিক্ষা অর্থে শরীর ও মনের সম্যক পুষ্টি,
সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার, ও হাত
দিবার শক্তি। তাহার পর কোন একটা
জিনিস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা।

মানুষের মনকে যদি একটি পারবার

যায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সর্বতোমুখীশিক্ষার উহার সকল দ্বার সুক্ৰুরিয়া রাখে। এই অনীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে চক্ষু-উন্মীলন করিলেই কত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে অনেক জ্ঞানলাভ করা যায়; কিন্তু বাহার-মানের সকল দ্বারগুলি খোলা নাই, বা-হার ননোরিস্তিসমূহ সমাক্ষ পুষ্ট নহে, তাহার পক্ষে সমস্তই অন্ধকার। পরন্তু বাহার সেই দ্বারগুলি খোলা সে যে দিবানিশি জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারে তাহাই নহে, সে উহার ব্যবহারও করিতে পারে। মনে কর গোপগুলি খোলা। একটির নাম বাকরণ, একটির নাম সাহিত্য, একটির নাম অলঙ্কার, একটির নাম বিজ্ঞান, একটির নাম হীট, একটির নাম লাইট ইত্যাদি। যখন যে জিনিসটি দেখিল সে তাহাকে তাহার আপন খোপে রাখিয়া দিল সুতরাং দরকার হইলে তাহাকে আর হাতড়াইতে হইল না। সে যেমন অনেক অধিক জিনিস দেখিতে পায়, তেমনি সেগুলিকে পরি-হার করিয়া মাজাইতে পারে এবং দরকারমত ব্যবহার করিতে পারে।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, সর্বতোমুখীশিক্ষা থাকিলে প্রায়ই লোক চিন্তাই করিতে পারে; ভাবিতেই পারে, কাজ করিতে পারে না। তাহারই জন্য আমরা বলিতেছি সর্বতোমুখী ও একমুখী দুইপ্রকার শিক্ষারই প্রয়োজন। জ্ঞান ত্রিবিধ হইতে আগিবে এক বা

দুইবিধ দিয়া বাহির হইবে। নচেৎ সে জানে জানবানের লাভ হইতে পারে-সমাজের লাভ নাই। উভয়প্রকার শিক্ষা হইলে মনকে লাটিমের সহিত তুলনা করা যায়। লাটিমের কাঠময়ভাগ সর্বতোমুখীবিদ্যা ও লৌহময়ভাগ এক-মুখীবিদ্যা। সেই লৌহময়ভাগের উপর লাটিম যেমন ঘোরে আমাদের মতে উভয়প্রকারে শিক্ষিত লোকও সেইরূপ কাজ করিতে পারে।

যদি বিশ্বতোমুখীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একমুখীশিক্ষা থাকে তাহা হইলে যে বিষয়ে শিক্ষা তাহার অনেক উপকার হয়। যদি একজন প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত লোক কোন এক বিষয়ে লাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে-বিষয়ে লাগিয়া থাকেন সে বিষয়ের অনেক উন্নতি হয়, নহিলে সে বিষয়ের উন্নতির উপায় নাই।

জ্ঞান মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে কোন বিষয়ের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞান একমুখীবিদ্যায় বিষয়ের উন্নতি হয় না। মনে কর একজন দস্তচিকিৎসায় ব্যবসায়ীজন অতি-বাহিত করিল। সে অনেক দেখিল শুনি, কিন্তু সে বনি শরীরের অন্য রোগসবকে কিছু না শিখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ভাল চিকিৎসক হইতে পারিবে না। মনে কর, দস্ত ডিঠে নাই এমন কোন পঞ্চমবৎসরের বাল-কের চিকিৎসা করিতে গেলে, বালকের চুলের প্রতি সে কখনই দৃষ্টিপাত করিবে

না, কেবল ঘেঁষেই চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। যদি কেহ তাহাকে দেখাইয়া দেয় যে বালকের চুলও উঠে নাই, চিকিৎসক তৎপ্রতি চৃষ্টিপাতও করিবে না। যে কারণে কেশ উঠে নাই, সেই কারণে যে দস্তও উঠে নাই ইহা তাহার একেবারে অন্তর্ভবী হইবে না, কেশের সহিত দস্তের যে একত্ব সন্দ্বন্দ আছে, তাহা সে কোন মতে বুঝিতে পারিবে না। যদি আর একজন বহুদর্শী দস্ত-চিকিৎসকের লিখিবার ক্ষমতা না থাকে তবে তাহার দস্তচিকিৎসাজনিত অভিজ্ঞতা তাহারই জীবনাবধি শেষ হইয়া গেল। লিখিতে জানিতে হইলে স্মৃতরাং অন্য অনেক বিষয়ে শিক্ষা আছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

শুদ্ধ একমুখীশিক্ষার আর এক দোষ দেখাইব। আমাদের প্রাচীনকালে বৈদ্য বলিয়া স্বতন্ত্র জাতি ছিল না, কি স্বহস্ত প্রোফেশন ছিল না, খনিদিগের হস্তে যতদিন বৈদ্যশাস্ত্র ছিল, ততদিন শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছিল। তাহার পর শুদ্ধ চিকিৎসা বৈদ্যদিগের ব্যবসায় হইল। বৈদ্যেরা পুঙ্কে শুদ্ধ বৈদ্যক পড়াইতেন। ক্রমে শিক্ষা সংকীর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কাজেই এই সময়ে সংগ্রহগ্রন্থ আরম্ভ হইল। অধিকাংশ লোকই সংগ্রহ গ্রন্থ পড়িয়াই বৈদ্য হইতে

লাগিল। বৈদ্যশাস্ত্রের হীনাবস্থার প্রতীকস্বরূপে সংগ্রহগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমুক ব্যক্তি দেখিলেন নোকের শক্তির ভ্রাস হইয়া আনিতেছে, ছায়েয়া আর শাস্ত্রের মকল গ্রন্থ পড়িয়া উঠিতে পারে না এই জন্য তিনি তাহার মার সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিলেন। নোকের শক্তির ভ্রাস শব্দের অর্থ আর কিছুই নহে, সাধারণশিক্ষার সর্বতোমুখীশিক্ষার অভাব। বিদ্যা সংগ্রহগ্রন্থসম্মে যখন দাঁড়াইল, তখন সে বিদ্যার উন্নতি আর হইল না। সে বিদ্যাবান লোক যতদূর নীচ হইতে লাগিল। সংগ্রহগ্রন্থকার সর্বত্র হইলেন তাহার গ্রন্থের উপর সরকাটা আরম্ভ হইল, ফাকি আরম্ভ হইল। বিষয়ে বিদ্যার গৌরব রহিল না, গ্রন্থে বিদ্যার গৌরব হইল। পাঠ লাগানই বাহাজুরী হইয়া দাঁড়াইল।

অতএব শিক্ষার জন্য ও শরীর পুষ্টির জন্য যে ১৭ বৎসর আছে তাহার মধ্যে এই দুই প্রকার শিক্ষাই দেওয়া প্রয়োজন, প্রথম সর্বতোমুখীশিক্ষা ১২।২৩ বৎসর পর্যন্ত, তাহার পর মাত্র ৫ বৎসর একমুখী শিক্ষা। একপ দিক্‌ভ্রান্ত লোক অমূল্য শক্তির আধার হন, তাহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, সমাজের শক্তির ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

বাহালি জ্বর।*

বাহালি যে দুর্দশাপন্ন দেশ ইহা
 তির। দেশবৎসল বাহালিরা এবং দে-
 শের শাসনকর্তৃগণ এই দুর্দশার কারণ
 সর্বদা আলোচনা করিয়া থাকেন।
 কেহ বলেন, বাহালির চিরপরাধীনতাই
 এই দুর্দশার কারণ। কেহ বলেন,
 বাহালির লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ইহার হেতু।
 কেহ বলেন, বাহালিদিগের শারীরিক
 এবং মানসিক দৌর্বল্য জনাই বাহালি
 দুর্দশাপন্ন। কেহ বলেন, বাহালির
 কদর্যা জলবায়ুই সকল অনর্থের মূল।
 ফলে এ দেশে যত অনিষ্ট লোকসমূহকে
 পীড়িত করে, তাহা গরিয়া মংখা করা
 ভার। একে বহুপ্রাণী—সহজে উৎপন্ন
 ধনে বাইতে কুলায় না; তাহাতে বিদেশে
 ধন চলিয়া যাইতেছে, শিল্পোপজীবীদের
 বাবনা মারা যাইতেছে, তাহার উপর
 সুশাসনে আরও প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে।
 বিদেশী শিক্ষায় লোকের ধর্মলোপ
 গাইতেছে, অথচ ধর্মজনিত সামাজিক
 কনস্ট্রাক্টর সকল লোপ পাইতেছে না,
 নতুন শিক্ষায় রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা
 সকল পরিস্ফুট হইতেছে, কিন্তু রাজ-
 নৈতিক কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে না।
 আইনে হাত পা বাধা—মনোবৃত্তিসকলের

স্বুর্ভি নাই, পেটে খাইতে কুলায় না তবু
 টেকস দিতে হইতেছে। তাহার উপর
 সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষ, সময়ে সময়ে জল-
 প্লাবন, বাত্যাবিপ্লব, প্রাদেশে প্রাদেশে
 সংক্রামক জ্বর। বাহালি ছাণী, তাহার
 উপর রোগগ্রস্ত।

অন্যান্য সকল জ্বরের অপেক্ষা এই
 রোগজ্বরই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরু-
 তর—আর সকল জ্বরের মূল। রোগের
 জনাই শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য;
 শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যজনাই
 চিরপরাধীনতা। তিন কারণেই দা-
 রিদ্রা। আধুনিক দেশবৎসল বাহালিরা
 কেহ সামাজিক, কেহ রাজনৈতিক সং-
 স্করণে উৎসাহশীল। কিন্তু রাজনৈতিক
 ও সামাজিক অনর্থের মূল যে রোগ,
 তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য কাহাকে
 কোন কথা কহিতে শুনা যায় না।

ইহার কারণও আছে। রোগ জল-
 বায়ুজনিত। দেশের জলবায়ুগরিবর্তন
 করিবে কে? বাহালি নিরভূমি; ইহার
 মাটি ভিজে, অথচ রৌদ্র অতিশয় প্রখর।
 ভিজে মাটিতে প্রখর রৌদ্র লাগিলে
 ম্যালেরিয়ানামে বিষময় বাষ্পের সমুদ্ভব
 হয়। ম্যালেরিয়া হইতেই বাহালির

* সরল জরচিকিৎসা। প্রথম ভাগ। গৃহস্থ আর, পাড়ারায়ের ডাক্তারদের
 কৃত। ডাক্তার শ্রীযত্ননাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ১৬০ নং বহুবাহালি
 ষ্ট্রট। মূল্য ২০ টাক।

বর্ষহুঁ জর। অতএব বাঙ্গালার মাটি আরও উঁচু করিয়া না ভুলিতে পারিলে, স্বর্ঘ্যের তেজ অগ্রসর করিতে না পারিলে, বাঙ্গালার জর নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যাসাগর বা কেশব সেন, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা কৃষ্ণদাস গাল সফলে মিলিয়া ধরাধরি টানাটানি করিলেও বাঙ্গালার মাটি এক ইঞ্চি উঁচু হইবে না। আর স্বর্ঘ্যের তেজ কমান ত্রোতাগুণে বা হইয়াছিল, তা হইয়াছিল, আর বড় হইবার আশা নাই। সুতরাং প্রোট্রয়টের দল, যেদিকে বড় ঘেসেন না।

দেশের নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্তন করা যায় না বটে, কিন্তু যেখানে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণসকল বিশেষরূপে সমবেত সেখানে জলবায়ুর উৎকর্ষসাধন করা মহাব্যয়ের নিতান্ত অসাধ্য নহে। মাটি উঁচু করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার জলনিকাযের সুপ্রণালী করা যাইতে পারে। জলনিকাযের সুপ্রণালী হইলেই ভূমির আর্দ্রতা কমিবে। আর্দ্রতা কমিলেই ম্যালেরিয়া কমিবে। স্থানীয় জলবায়ুর উৎকর্ষসাধনের এইরূপ অনেক উপায় আছে। কম্বল দেশবৎসল লোক, যেদিকে বড় করিয়া থাকেন। তাহার জন্য কয়টা আরোগিস্যেসান, কয়টা সভা হইয়াছে? কয়টা জুরো বক্তৃতা হস্ত-তালির বটা পড়িয়াছে? কয়খানা জুরর পাম্‌ফ্লেট ছাপা হইয়াছে? এ কথা লইয়া কাদেশের ছেলে কয়বার জলপান

খাইয়াছে? ঘোড়দোড়ের চাঁদের কথা অনেক শুনা যায়, এ বিষয়ে কয়টাকা চাঁদা উঠিয়াছে? বরং এ বিষয়ে রাজ-পুরুষদিগকে কিছু প্রশংসা করিতে হয়। তাহার কখন কখন জোর করিয়া এ সকল কাজ করাইয়া থাকেন। দেশ-হিতৈষীরা তাহাতে সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং রাজপুরুষদিগকে গালি দিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্ট জোর করিয়া ডানকুনীর জগা সাফ করিলেন, আজ পর্যন্ত দেশহিতৈষীর দল সেজন্য গবর্ণ-মেন্টকে গালি দিতেছেন।

এক জরই বাঙ্গালার পরমশত্রু। দু-ডিম্ব, বাত্যা, জলপ্লাবন কালেভালে কখন কোন প্রদেশকে পীড়িত করে। কিন্তু জর প্রত্যহ অতি গৃহে গৃহে লোক-ধ্বংস করিতেছে। যাহাকে না যারি ছেড়ে, তাহাকে নিস্তেজ, অকর্মণ্য, অসামর্থ্য, জীবনভারবহনে অসমর্থ করিয়া ভুলিতেছে। এই পরমশত্রুর হাত হ-ইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি কোন উপায় নাই?

নিষ্কৃতির জন্য দ্বিবিধ উপায়। প্রথম যাহাতে জর না হয়, অর্থাৎ নিবারণো-পায়। দ্বিতীয় জর হইলে যাহাতে আরোগ্যলাভ হয়, অর্থাৎ চিকিৎসা-নিবারণের সম্বন্ধে উপায় কিছু বলা গিয়াছে; যাহাতে স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্য-কর হয়, তাহা করিতে হয়। এক্ষে-চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু বলিব।

মধ্য দেশবৎসল বাঙ্গালিরা ইংরেজ

দিগকে যতই গালি দিন না কেন, ইংরেজ হইতে এ দেশের যে কয়টি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিব। ইংরেজ হইতে পাশ্চাত্য-বিদ্যা এ দেশে আসিয়াছে। ইংরেজ হইতে মুদ্রায়ন্ত্র এ দেশে আসিয়াছে। স্বাধীনতা দেশবাংমলা প্রকৃতি মোহন ইংরেজ হইতেই আমরা শিখিয়াছি। আর ইংরেজ হইতে কুইনাইন এ দেশে আসিয়াছে। বাঙ্গালার জরচিকিৎসায় কুইনাইন একমাত্র ঔষধ। বাঙ্গালির পরমশত্রুনিধনে কুইনাইন আমাদের একমাত্র মহার।

পাঠক বলিবেন কুইনাইন যে জরের ঔষধ ইহা ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে, ইহা বলিবার জন্য এত বড় একটা প্রবন্ধ কেন? প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে এই বলিতে হয়, যে কথাটা বস্তুতঃ আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ববাদিসম্মত নহে। কুইনাইন সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের অনেক কুসংস্কার আছে। অনেকে বলেন কুইনাইন খাইলেই জর আটকাইয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাস আছে, যে কুইনাইন না খাইলেই শীঘ্রই জর ছাড়িত; এত ভুগিতে হইত না। এ কথা সত্য বটে যে, কুইনাইন না খাইলে এত ভুগিতে হয় না। কেন না রোগ ও রোগী শীঘ্রই একত্রে নিকাশ পায়। জ্বরের অনেকের বিশ্বাস আছে, যে এ দেশে এত কুইনাইন আসিয়াছে বলিয়া এখন এত জর হয়। যখন কুইনাইন

ছিল না তখন গোকের এত জর হইত না। তাহাদের বিশ্বাসের স্থলমর্দ এই, যে কুইনাইন খাইলেই জরের ধাত হইয়া যায়। অতএব কুইনাইন খাওয়া ভাল নয়। অনেকে এই সকল বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, যথাসময়ে কুইনাইন ব্যবহার করেন না, নিত্যকাল বিপন্ন না হইলে কুইনাইন রাজি হন না। তার পর কুইনাইন ব্যবহার করিয়া আশু উপকার পাইলেই, কুইনাইন ছাড়িয়া দেন। অতরাং কুইনাইন তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় না।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, বহুতর লোক বাঙ্গালার দেখা যায় যে কুইনাইন খায় আর জরে ভোগে। ইহার এক কারণ অনেকে নির্দেশ করেন যে, বাঙ্গারে যে কুইনাইন বিক্রয় হয়, সাধারণ লোক বাহা কিনিয়া খায় সে কুইনাইন ভাল নহে তাহারই দোষ। সে কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যে কথা এখন আমরা ছাড়িয়া দিই। প্রধান কারণ চিকিৎসার দোষ, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মাত্রার এবং উপযুক্ত প্রণালীতে কুইনাইন সেবন না করিলে, উপযুক্ত ফল কেন কলিবে?

চিকিৎসার দোষ দুই কারণে হয়। এক, চিকিৎসক হুচিকিৎসা না জানিলে, কাজে কাজেই চিকিৎসার দোষ ঘটবে। দ্বিতীয় রোগী চিকিৎসকের ব্যবস্থাপ্রণালী কার্য না করিলে চিকিৎসার দোষ ঘ-

টিবে। সর্বত্র সূচিকিংসক পাওয়া যায় না। যাহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে অশিক্ষিত এবং হৃদয় বড় বড় নগরেই তাঁহাদিগকে পাওয়া যায়। সে সকল স্থানে নাইলে তাঁহাদিগের উপযুক্ত পুরস্কার হয় না। দুর্গম পল্লীগ్రামসকলে, যে সকল স্থানে জরের অধিক প্রাদুর্ভাব, সেই সকল স্থানে অশিক্ষিত চিকিৎসক মিলে না। সে সকল স্থানে জরের চিকিৎসা হাতুড়িদিগের হাতে। তাহারা কেবল দুই এক ধ্বংস কৰ্মপাউন্ডারি করিয়া কেহ তাহা নাও করিয়া, কেবল জীৱিকামিকাধের উপায়াস্তর অভাবে ডাক্তার হইয়া বসে। তাহাদিগের হইতে, সূচিকিংসক কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয় সূচিকিংসক মিলিলেও গৃহস্থ নিজে কিছু চিকিৎসা না বুঝিলে, চিকিৎসার সম্পূর্ণ কলপ্রাপ্তি হইতে পারে না। চিকিৎসক কিছু, সৰ্ব্বক্ষণ সকল রোগীর শিওরে বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি কেবল উপদেশ দিয়া গিয়া থাকেন, গৃহস্থের মধ্যে কাহারও চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু ধোঁর শোধ না থাকিলে সে উপদেশমত সম্পূর্ণ কার্য হয় না। ডাক্তার বলিয়া গেলেন গায়ের তাত কম পড়িতে আরম্ভ হইলে কুইনাইন দিবে, তিনি চলিয়া গেলে পাথের তাত কম পড়িতে আরম্ভ হইল—কিন্তু গৃহস্থ ভাবিল যে একেবারে গা না জুড়াইলে কুইনাইন দেওয়া হইবে না; অর আটকাইয়া ঘাইবে। এদিকে রোগীর গা আর না জুড়াইয়া

আবার অর আমিল, কুইনাইন খাওয়া হইল না, চিকিৎসাও নিষ্ফল হইল। কোন রোগীর অজীর্ণ উপস্থিত হইলে, ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন, তুমি শীতল জলে মিলাইয়া এই ঔষধটি মধ্যে মধ্যে সেবন করিবে। ডাক্তার করিয়া আনিয়া দেখিলেন, রোগী বহুকালের কৰ্ম্মময় জলে মিলাইয়া ঔষধসেবন করিতেছে। এবং তাহার পেটের পীড়াও বাড়িয়াছে। আর একরোগী শিরঃপীড়ায় পীড়িত হইলে চিকিৎসক উপদেশ করিয়াছিলেন যে মাথায় জলপটি দিয়া সৰ্ব্বদা শীতল জলে ভিজাইতে থাকিবে, রোগী মাথায় সাতপুরু মোটা নেকড়া জড়াইয়া তাহাতে জল ধার ডাইতে লাগিল। স্তরায় মাথার ব্যর্থতা না করিয়া বাড়িয়া উঠিল।

অতএব বাঙ্গালার জরের মহোৎসব আমাদের হাতে থাকিতেও দুইটি অভাবের জন্য বাঙ্গালাদেশ জরে ধ্বংস পাইতেছে। প্রথম অভাব অধিকাংশ স্থানের চিকিৎসকেরা জরের চিকিৎসা জানে না। দ্বিতীয় অভাব যেখানে সূচিকিংসক আছে, যেখানে গৃহস্থেরা চিকিৎসকের উপদেশপালন করিতে জানে না। যিনি এই দুই অভাব দূর করিবেন, যিনি পল্লীগ্ৰামের হাতুড়িদিগকে অরচিকিৎসা শিখাইবেন আর গৃহস্থদিগকে সেই চিকিৎসার মৰ্ম বুঝাইতে শিখাইবেন তিনিই বাঙ্গালাদেশধ্বংসকারী অরজগৎপক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিবেন। তাহাকে দেশহিতৈষী

মধ্যে সর্কোচ্চরান দিতে আমরা প্রস্তুত।

এই পুণ্যময় সংগ্রামে আমরা কেবল একজন বাঙ্গালিকে দুতর দেখিতে পাই। আমরা বলিয়াছি যে, বাঙ্গালীর জর হইতে দেশকে রক্ষা করিবার দ্বিবিধ উপায়। এক স্বাস্থ্যরক্ষা—নিষ্কাশনের নিয়মপালন। দ্বিতীয় সূচিকিৎসা। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি স্বদেশীয়দিগকে শিখাইবার জন্য ডাক্তার জীযুক্ত বাণু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কয়েক বৎসর হটল শরীর-পালন নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহা এ দেশে উত্তমরূপে প্রচলিত হইয়া দেশের বিস্তর মঙ্গলসাধন করিয়াছে। দ্বিতীয় উপায় সূচিকিৎসা। গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে জরের সূচিকিৎসা প্রচলিত করিবার জন্য তিনি সম্প্রতি জরচিকিৎসা নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। আমরা যে দুইটি অভাবের কথা বলিয়াছি এই দুইটি অভাবই এই গ্রন্থের দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারিবে। এমন ভরসা কখনই করা যাইতে পারে না, যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রভাবে বাঙ্গালাদেশ হইতে জর একেবারেই তিরোহিত হইবে। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থপানি কিম্বা এইরূপ কোন গ্রন্থ, বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত এবং গৃহে গৃহে অদীত হইলে দেশে যে অসংখ্য রোগীর সংখ্যা কমিবে, এখনকার অপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক জরে মরিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

এইরূপ গ্রন্থ বলিতেছি তাহার কারণ এই, যে এই গ্রন্থখানির কয়েকটা বিশেষ গুণ আছে। এরূপ গুণ না থাকিলে এ শ্রেণীর গ্রন্থেরদ্বারা ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। প্রথম গুণ এই যে ইহার রচনা অতিশয় সরল—যে ইচ্ছা নে পড়ুক না কেন, বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ইহার ভাষা দাক্ষিণী-শিক্ষার ভাষার ন্যায় সহজ কথাবার্তার ভাষা। কিন্তু ইহা দাক্ষিণী-শিক্ষার ন্যায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হয় নাই। কেবল ভাষা সরল হইলেই যে রটনা সরল হইল এমন নহে। চিকিৎসা-শাস্ত্রান্তর্গত ছাত্র তত্ত্বমূলক কঠিন ও কালবাণী শিক্ষার আরম্ভ, সেগুলি অশিক্ষিতকে শিখাইতে গেলে, কেবল সরল ভাষায় লিখিলে হইবে না। বুঝাইবার কৌশলও জানা চাই। যজুর্বাণু যে সে সকল কৌশলে অসাধারণ পটু, দাক্ষিণী-শিক্ষায় তাহার পরিচয় আছে। দাক্ষিণী-শিক্ষা অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে জরচিকিৎসা আরও পরিষ্কার। নিজে চিকিৎসা করিতে করিতে লেখক বাহা দেখিয়াছেন এমন অনেক উদাহরণ দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গুণ এই, যে, যে গৃহস্থের যেমন অবস্থা তাহার প্রতি তেমনি ব্যবহার আছে। অনেক সময়ে ডাক্তারের দরিদ্রের প্রতি এমন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, যে তাহা বড়মানুষেরই সাধ্য।

এবং পল্লীগ্রামে যে নকশা সামগ্রীর
হকুম করেন, তাহা নগর মহিলে পাওয়া
যায় না। সে সকল স্থানে যত্নবান্ অমু-
কল্পগুলি বলিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়ও প্রধান গুণ এই, যে এখনকার
প্রচলিত জরচিকিৎসার মধ্যে যেটি
অকৌৎস্তুষ্টপ্রণালী তাহাই ইহাতে লিখিত
হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থ যখন যত্নবান্ ন্যায়
উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের লিখিত, তখন সে
কথা আমাদের বলাই বাহুল্য। অন্য
চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত বশস্বী হইলে
ইহাতে পারেন, কিন্তু একরূপ সুরক্ষা, সুবিজ্ঞ
এবং কৃতকর্মী চিকিৎসক অতি বিরল।

চতুর্থ। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। জ্বরপী-
ড়িত ব্যক্তির এমন কোন অবস্থা নাই—
জ্বরের এমন কোন উপসর্গ বা উপশ্রব
নাই যে এই গ্রন্থে তাহার চিকিৎসার
ব্যবস্থা নাই বা ব্যবস্থা করিবার সম্ভব
নাই। প্রথম ভাগে সকলগুলি শেষ
হয় নাই।

এই গ্রন্থ লিখনে আমাদের তিনটি
উদ্দেশ্য। প্রথম বাঙ্গালার জ্বর, বাঙ্গা-
লার প্রধান শত্রু; সেই শত্রুহন্ত হইতে
দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশহিতৈষিগণ,
চেষ্টিত নছেন। তাহার চেষ্টিত হউন
তাঁহাদিগের কাছে এই প্রার্থনা করা।
দ্বিতীয় কিম্বদ্বি উপায়ে এই শত্রু পরাস্ত
হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ
করা। তৃতীয় যত্নবান্ এই গ্রন্থ খানি,
সে রাক্ষসোদ্দেশে নিষ্কিন্ত প্রথম শত্রু
খলিরা, সাধারণের নিকট পরিচিত করা।

গ্রন্থখানি কিরূপ প্রাক্কল, ও ইহা যে
সাধারণের ব্যবহার্য্য, এই পরিচয় আরও
স্বস্পষ্ট করিবার জন্য, আমরা উহা হইতে
ছুই পাত উদ্ধৃত করিলাম। যেটুকু
উদ্ধৃত করিলাম সেটুকু যিনি পড়িবেন
তাঁহারই উপকার হইবে। এইরূপ গ্রন্থের
সকল স্থানে।

"এখন কুইনাইন খাওয়ার কথা বলি।
এর আগেই বলিয়াছি যে, ঘাম হইতে
আরম্ভ হইলেই রোগীকে কুইনাইন
দিবে। নৈলে অনেক জায়গায় কুই-
নাইন খাওয়ারইবার সময় পাওয়া যায়
না। কুইনাইন খাওয়াইবার নিয়ম অ-
নেকে অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি
দেখিতেছি, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে
১০ গ্রেণ, আবার জ্বর আসিবার ছইঘণ্টা
আন্দাজ আগে ১০ গ্রেণ, আর এর মধ্যে
ছুইঘণ্টা অন্তর ছই গ্রেণ কুইনাইন খাও-
য়াইলে ১০০র মধ্যে ২০ জায়গায় জ্বর
আসা বন্ধ হয়। এরকম নিয়মে কুই-
নাইন খাওয়াইলে চিকিৎসক কোনও
জায়গায় অপ্রতিভ হইবেন না। মনে
কর, আজ বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিল
সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময় ছাড়িল
অর্থাৎ যেমন ঘাম হইতে আরম্ভ হইল,
অমনি ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া
দিলে। তার পর ছইঘণ্টা অন্তর, অর্থাৎ
রাত্রি ১০ টার সময় একবার, ১২ টার
সময় একবার, ২ টার সময় একবার, ৪
টার সময় একবার, ছই গ্রেণ করিয়া কুই-
নাইন খাওয়াইলে। ভোর ৬ টার সময়

অর্থাৎ আবার জুর আসিবার ২ ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। বেলা ৮ টার সময় জুর আসিবার কথা, কিন্তু জুর আসিল না। রোগীর কান ভেঁ ভেঁ করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগীকে কুইনাইন দিলে না। বেলা ১১ টার সময় ২ গ্রেণ কুইনাইন দিলে। বেলা ২ টার সময় আর দুই গ্রেণ দিলে। তার পর ৬ টার সময় একেবারে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। যদি বল, ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিবার দরকার কি? আমি অনেক জায়গায় দেখি-রাজি, যে সময় জুর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়াইয়া যদি সে সময়ে জুর আসিতে না দেও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জুর আসে। বেলা ৮ টার সময় জুর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়ান হইরাছিল বলিয়া, সে সময় জুর আসিল না। রোগী মনে কমিল আজ আর জুর আসিবে না। চিকিৎসকও তাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাজি ৮ টার সময় আবার জুর আসিল। চিকিৎসকের কাছে সংবাদ গেল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, তাই ত, জুর আসিবার ত কথা নয়, তবে কেন এরকম হইল? সেই জন্যে বলছি, যে সময় জুর আসিবার কথা, সে সময় জুর না আসিলে, তার দশ ঘণ্টা পরে দশ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। তার পর দেখিলে রাজি ৮ টার সময়ও

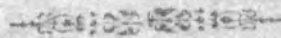
জুর আসিল না। তখন নিশ্চিত হইলো। রাজি রোগীকে আর কুইনাইন না দিলেও চলে। কিন্তু ভোর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই। তার পর বেলা ৩ টা পর্যন্ত, দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন দিলে। ৬ টার সময় একবারে ৫ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। রাজি ১০ টার সময় ২ গ্রেণ দিলে। রাজি আর কুইনাইন দিবার দরকার নাই। তার পর ভোর ৬ টায় ৫ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই।

মনে কর, সোমবার দিন বেলা ৮ টার সময় জুর আসে, আর সেই জুর রাজি ৮ টার সময় ছাড়ে। তার পর ঐ নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইয়া, বৃহস্পতিবারের ভোর পর্যন্ত জুর আসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন বন্ধ করিবে না, এখও জুর আগার আশঙ্কা করিয়া আর সাত্তার দিনকতক কুইনাইন খাওয়াইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই আর দিনকতক কুইনাইন খাওয়ানই উচিত বলিয়া বোধ হইবে। কেন না, যে জুর রোজ আসে কুইনাইন খাওয়াইয়া, সে জুর বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিন আবার জুর আসে। এতেই লোকে বলে কুইনাইন খাইলে জুর আটকাইয়া যায়। শরীর থেকে জুর একবারে যায় না। ফল কিন্তু না নয়। এরকম ভাবাই লোকের ভুল। এই ভুলের জন্যেই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোক

দেব যথো, কুইনাইনের তত্ত্ব আদর
নাই। জুরে জুরে খেলা করিয়া ফেলি-
তেছে, তবু জুর আটকাইবার ভয়ে, কুই-
নাইনের কাছেও বাইতেছে না। ইতর
লোকদের মধ্যে সর্বদাই একপ যটে।
এর ফল এই যে, চারি আনার কুইনাইন
আনিয়া থাকিলে যে জুর মারিত, সেই
জুরে জীবনটা নষ্ট নয়। ও ছুঃখ কি
রাখিবার জায়গা আছে। পাড়ারগায়ে
থোকে ত এই জন্যই জুরে এত মরে।
তবেই দেখ, যে জুর যোজ আসে, কুই-
নাইন খাওয়াইয়া সে জুর বন্ধ করার
পর, আট দিন পর্যন্ত কুইনাইন খাওয়ান
বড় দুরকার। তবে জুর বন্ধ হওয়ার

পর, দুই তিন দিন যে বাধাবাধি করিয়া
কুইনাইন খাওয়াইতে হয়, তার পর
তেমন করিবার দুরকার নাই। বাধাবাধি
করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার কথা এই
সত্য বলিয়াছি। যোল সন্ধ্যা ৫ গ্রেণ,
আর সন্ধ্যার আগে তিন গ্রেণ খাইলেই
হয়। আট দিন পর্যন্ত এই নিয়মে কুই-
নাইন খাওয়া চাই।”

উপসংহারে যিনি রাজীশিক্ষা, শরীর
পালন, এবং জুর্দাচিকিৎসা প্রণয়ন করিয়া
সাধারণ লোকের অশেষ হিতনাথন করি-
য়াছেন, তাহাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ
প্রদান করি।



মাধবীলতা।

১৩

যে নির্জন্মমন্দিরে লক্ষচারী বাস
করিতেন, চন্দ্রালোকে তাহার গাভীরা
বিশেষ বাড়িত। প্রকাণ্ড প্রান্তরের
মধ্যে প্রকাণ্ড মন্দির, সমুখে প্রকাণ্ড
দীপিকা, পিতৃম পার্শ্বলা ঘননই রাজ্যে
বেধিত, তখনই বড় বিম্ব হইত। এ
রূপে যে সে একা, তাহার যে আর
কেহই নাই, এ কথা কেবল এই নির্জন্ম
স্থানে আসিলেই তাহার মনে হইত।
ইহা অসম্ভব নহে। স্থানমাহাত্ম্য অতি
আশ্চর্য্য, এই জন্যই তীর্থ। উয়, ভক্তি,

বিলাস, বৈরাগ্য এ সকলই স্থানের গুণে
আগনিই মনে উদয় হয়। এই জন্য
অনেকে বলে স্থানাজুয়ারী সম্বোধন
প্রকৃতি। বাঙ্গালার পাহাড় পর্বত কি-
ছুই নাই, একখানি কঠিন প্রান্তরও নাই,
বাঙ্গালার যাহা কিছু আছে সকলই
কোমল, সুতিক। শবীক কোমল; অল্প
তাপে শুষ্ক হয়, অল্প রসে গলিয়া যায়,
অল্প ভরে আহত হয়। আমরাও ঠিক
সেইমত কোমল; তাহাই পূর্বে চটি
পরিভাষ্য, দীয়ে দীয়ে পা ফেলিতাম,
পাছে মৃত্যিকার অঙ্গে আঘাত করি।

আমরা এক্ষণে বিলাতি জুতা পরিতেছি, দস্ত করিয়া পা ফেলিতেছি, কিন্তু তা-
হাই বলিয়া আমাদের প্রকৃতিপরিবর্তন
হয় নাই, আমরা যাহা ছিলাম তাহাই
আছি। অনুকরণ-অনুরোধে মৃত্তিকার
জুতার পেরেক ফুটাইতেছি, কিন্তু পরে
হয় ত বাঙ্গালার অঙ্গে জুতার দাগ
দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিব। জুতায়
বা মোজায় প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না,
যদি কখন বাঙ্গালার পর্বত জগে, মৃত্তিকা
কঠিন হয়, আমরাও কঠিন হইব; নতুবা
যে জাতিই আসিয়া বাঙ্গালায় বাস ক-
রিবে, সেই জাতিই ক্রমে আমাদের জায়
কোমলশুভাবই হইবে।

একদিন গভীর রাত্রে কালীন্দ্রদেহের-
কূলে বিমর্ষভাবে পিতম একা বসিয়া-
ছিল। অনেকক্ষণ চক্রে উঠিয়াছে। দূরে
প্রান্তরকূলে ধূমরাশি মেঘবৎ জমিয়াছে,
পিতম তাহাই দেখিতেছিল, আর মধ্যে
মধ্যে অক্ষুটস্থরে আপনা আপনি কি
বলিতেছিল, এমন সময় ব্রহ্মচারী দী-
ঘীরে আসিয়া বসিলেন। পিতম তাঁ-
হাকে কোন কথার সম্ভাষণ করিল না,
অন্যমনস্কে যাহা দেখিতেছিল, তাহাই
দেখিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা
করিলেন, পিতম কেমন আছ? পিতম
মুখ না ফিরাইয়া বলিল, ভাল আছি।
ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতম
তোমার মনের অবস্থা কেমন? কোন
উত্তর না দিয়া পিতম প্রান্তরকূলের ধূম-
রাশি অকুলিরদ্বারা নির্দেশ করিল।

ব্রহ্ম। কিন্তু লোকের বোধ হয় তোমার
আর চিন্তাবৈকল্য নাই। তুমি এক্ষণে
আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছ।

এই শেষ কথার পিতম পাগলা ক্রমে
ক্রমে ফিরায়া বসিল, এক দীর্ঘ নিশ্বাস
ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীর মুখপ্রতি চাহিয়া
রহিল। সেই কাতর দৃষ্টি দেখিয়া ব্রহ্ম-
চারী বাথিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,
“পিতম কি জন্য তোমার এমনতা?
সংসার আশ্রম বাহার নাই, কাতর হইবার
তাহার ত কোন কারণই নাই, যাহাই
হুঃখের হেতু?”

পিতম কোন উত্তর করিল না দেখিয়া
ব্রহ্মচারী আবার বলিতে লাগিলেন “কি
জন্য যে তোমার মনকষ্ট তাহা আমি
জানি না কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া
বুঝিতেছি যে তোমার মনকষ্ট অতি
গুরুতর। এ কষ্ট নূতন নহে, অতি
পুরাতন বলিয়া বোধ হইতেছে—”

পিতমের শরীর ঢকল হইয়া উঠিল।
পিতম উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্রহ্মচারীকে
কোন সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া গেল।
ব্রহ্মচারী বসিয়া একদৃষ্টিতে পিতমের
মিকে চাহিয়া রহিলেন, পিতম দৃষ্টির
বাহির হইলে উরু হইতে উরু নামাইয়া
আপনা আপনি অক্ষুটস্থরে বলিতে লাগি-
লেন “চন্দ্রসংসার লোক নষ্ট হইয়া
গিয়াছে, এ বৃদ্ধ অথচ যুবর মত ইহার
সুখ হুঃখের অনুভব বহিরাছে, না জানি
আর বয়সে কতই ছিল।”

এই সময় আবার পিতম ফিরায়া

আমিল। ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল
“কুটুম্বপক্ষীর দ্বারা মনুষ্যের কোন অনিষ্ট
হয় কি না?”

ব্রহ্ম। কই তাহা আমি ত কিছু
জানি নাই।

পিতম। তবে কেন অনেক দূর হইতে
একটি কুটুম্বপক্ষী রাজবাটিতে আনীত
হইতেছে?

ব্রহ্ম। সকলেই ত পাখী ভাল বাসে,
রাজা ভাল পাখী দূর হইতে আনাইবেন
ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

পিতম। রাজা আনাইতেছেন না।
রাজকুমারকে উপহার দিবার নিমিত্ত
কোন ব্যক্তি বহু ব্যয় করিয়া আনা-
ইতেছে, তাহাই আমার সন্দেহ হইয়াছে।

ব্রহ্ম। এ সন্দেহ তোমার অনর্থক।

পিতম। আচ্ছা, বলুন দেখি, লোকে
ঘুঘুকে ভয় করে কেন? বাটিতে ঘুঘুচরা
গালি কেন?

ব্রহ্ম। তাহা আমি বিশেষ জানি না।

পিতম। কিন্তু আমি অনুভব করিতে
পারি।

ব্রহ্ম। কি অনুভব কর।

পিতম। কোন কোন পক্ষী সময়ে
সময়ে বিষাক্ত হয়। একসময়ে বাঙ্গা-
লার হয় ত ঘুঘুপক্ষী বিষাক্ত হইয়াছিল;
যে বাটিতে ঘুঘু বান করিত সেই বাড়ী-
তেই মড়ক হইত, তাহাই হয় ত ঘুঘুর
অপবাদ বাব্বালায় অদ্যাপি আছে। যে
পাখী আসিতেছে, সে পাখী বিষাক্ত
নিশ্চয়। আমি কল্যাণাখ্যায়ার মাগিরা

রাজদ্বারে দাড়াইয়া থাকিব। কল্যা-
ণকুমারের জন্মদিন, আমার নিবৃত্ত
হইয়াছে। আগনার হইয়াছে?

ব্রহ্ম। তোমার কে নিমন্ত্রণ করিল?

পিতম। রাজাবাহাদুর পোদ। অ-
ন্যর নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করি না,
বিশেষতঃ রাজবাটিতে—

ব্রহ্ম। কেন?

পিতম। কুটুম্ববাটিতে অন্যর নিম-
ন্ত্রণ অগ্রাহ্য।

ব্রহ্ম। রাজার সহিত তোমার কুটু-
ম্বিতা কিরূপ?

পিতম। ব্রহ্মচারীর সহিত ব্রহ্মদৈত্যের
কুটুম্বিতা যেদ্রুপ, রাজার সহিত দরি-
দ্রের কুটুম্বিতা সেইরূপ! অর্থাৎ ঘটনা-
মূলক।

ব্রহ্ম। পাগলামি আরম্ভ করিলে?
কই পাগলামি করিতে গিয়া তুমি ত
কখন রূঢ় হও না, আজ রূঢ় কথা
বলিতে আরম্ভ করিলে কেন?

পিতম। অপরাধ লবেন না, বড়
গায়ের জ্বালা হইয়াছে, তাহাই বলিতে-
ছিলাম যে আগনি যেমন শীঘ্র ব্রহ্মদৈত্য
হইবেন এই মূর্খ রাজা সেইরূপ শীঘ্র
আমার মত দরিদ্র হইবেন। কল্যাণ তাহা
বীজরোপণ হইবে, আপনি একবার
রাজবাটিতে যাবেন। রাজকুমারকে
আশীর্বাদ করিতে যাবেন, আমি নিম-
ন্ত্রণ করিয়া গেলান। আপনার দ্বারা
রাজার কোন উপকার হবে না জানি,
লোকের উপকার করা আপনার দক্ষ-

বিরুদ্ধ, পরোপকার গৃহীর ধর্ম, আত্ম-
উপকার উদারমনের ধর্ম, তথাপি গন
বুঝে না, কি জাণি যদি কিছু হয়।

ব্রহ্ম। রাজার কি বিপদ ?

পিতম। রাজার অপেক্ষা আমার
বিপদ অধিক, কল্যা বিস্তর আহার
করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে নিদ্রা
ঘাই।

এই বলিয়া পিতম কালীঘরের একটি
সোপান অবতরণ করিয়া শয়ন করিল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, আইস পিতম
মন্দিরে শয়ন করিবে চল।

গিত। ঘরের ভিতর শয়ন বড় বি-
পদ, ইট কাঠে আমার বড় ভয় হয়।
আচ্ছা ব্রহ্মচারীঠাকুর, বলুন দেখি মাল্লবের
আকৃতি আর প্রকৃতি কিরূপে সংশোধন
হয়, বিশেষতঃ উদরের ভাগটা।

ব্রহ্ম। কিছু আহার করিবে ? বোধ
হয় আজ কিছু ভুটে নাই।

পিতম। ঠিক বলেছেন। কিন্তু কল্যা
পোষাইয়া লওয়া যাইবে, আজ আর
কিছু নয়। কিন্তু গঠনের ঘোষ না
গেলে—এই বলিয়া পিতম চুপ করিল।

ব্রহ্মচারী দেখিলেন যে পিতম ঘুমা-
ইল, অতএব-দীর্ঘে দীর্ঘে উঠিয়া নমস্কা-
তিমুখে গেলেন।

পরদিবস প্রাতে সূর্যোদয়ের পর
পিতম রাজবাটার দিকে চলিল। দূর

হইতে নহবৎ গুনিয়া ভাবিল, আমার
বিনয় হইয়াছে, হয় ত উৎসব আরম্ভ
হইয়া গিয়াছে। রাজপুত্রীয় দিকে দৃষ্টি-
পাত করিয়া দেখে সকল মন্দিরে রক্ত-
পতাকা উড়িতেছে। ছাদের উপর শত
শত খেত কপোত বসিতেছে, উড়িতেছে,
আবার বসিতেছে, আবার উড়িতেছে ;
সূর্য্যকিরণে যেন আকাশে হীরা ছড়াইয়া
পড়িতেছে। পিতম কতকদূর অগ্রসর
হইয়া দেখিল, রাজদ্বারে বিস্তর লোক
উপস্থিত হইয়াছে, নানাবিধ বাদ্যোদ্যম
হইতেছে, নহবৎখানার বিশেষ শোভা
হইয়াছে, রৌপ্য নাগারার উপর সূর্য্য-
কিরণ পড়িয়া নক্ষত্রের ন্যায় অলিতেছে।
দশ বারটি হস্তী স্নগজীভূত হইয়া
দাঁড়াইয়া আছে। পিতম আসিয়া
মহানন্দে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে
করিতে কত কথা কহিতে লাগিল।
একটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, হি।
মা! তুমি কেন সিঁথি পরিয়াছ ?
তোমার যে বয়স গিয়াছে। আর
একটির পশ্চাতে গিয়া বলিল, কেন
মা, তোমার চন্দ্রহার কই ? তৃতীয়কে
বলিল, তুমি গলায় যে মালা পরিয়াছ,
তাহা কয় মরী গণা যাইতেছে না।
সালদ্বারা যুবতীর ন্যায় মাথা তুলিয়া,
বুক ফুলাইয়া দাঁড়াও, পাঁচমরী কি
সাতমরী ভাল করে দেখাও। মতুবা
পাড়ার মেয়ের কাছে তোমার মান
থাকিবে না।

এই সময় দেওয়ানখান নবকুশল

রাজবাটী প্রবেশ করিতেছিলেন, পিতৃ-
নের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে
জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পিতম? পাড়ায়
মেয়ের কাছে হাতীর মান কিম্বা?

পিতম। অলঙ্কারে—নটেং আর
কিম্বা? আচ্ছা! বলুন দেখি, ধনীরা
হাতীকে জীর ন্যায্য সাঙ্গার কেন? আর
একই জাতীয় অলঙ্কার পরায় কেন?
জীর কপালে মিথি হাতীর মাথায়ও
মিথি। জীর গালে অলঙ্কার ছিলকা,
হাতীর গালেও তাহাই। শিকল, শিকলি,
ঘণ্টা আর কিস্তিনী এই প্রভেদ। আপ-
নার চক্ষে হস্তিনী আর গৃহিনী কি এক
রূপ বোধ হয়?

নবকুমার। বড় নয়, তবে গৃহিনী
অনারের শোভা, আর হস্তিনী সদয়ের
শোভা। বশতাপর উভয়েই সমান,
উভয়েই বসিনী।

পিতম। ঠিক বলেছেন, শিকলের
জপান্তর গায়ের মল। তাই ত তাই
ত! আমি চিরকাল মনে করিতাম
এই অলঙ্কারের অর্থ কি? এখন তাহা
বুঝিলাম। কিন্তু এই মল ক্রমে ক্রমে
মল হবে, তাহার পর ভাঙ্গিয়া যাবে
ততদিনে ইহা ত অনেক পুরুষ কেটে
যাবে। কিন্তু মল ভাঙ্গিলে পুরুষের
কপালও ভাঙ্গিবে।

নব। এত দূরদর্শিতা যদি তোমার
আছে, তবে বোকে তোমার পাগল বলে
কেন?

পিতম। ভাল, বল দেখি, তুমি

এমত চন্দ্রকার মস্তান, তথাপি লোকে
তোমায় কুনস্তান, পিতৃশক্তির হামাদবা
বলে কেন?

নবকুমার আর কোন উত্তর না ক-
রিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন।
পিতম আবার কিরিয়া হস্তীর নিকট গিয়া
মহা আচ্ছাদে নানী কথা কহিতে লাগিল।
এমত সময় একবার চূড়াধন বাবু কণ্ঠে
হস্তের বাহিরে আমিয়া হাঁড়াইলেন।
পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাতীর
মধ্যে কি মিষ্টালাপ হইতেছে?”

পিতম। দেখুন দেখি বিধাতার
অবিচার, হস্তীর এই প্রকাণ্ড শরীর,
এই শক্তি, কিন্তু দেখুন ইহার চক্ষু কত
ক্ষুদ্র। তাহাই বলিতেছিলাম ছি! না।
তোমার বড় ছোট মজর।

চূড়াধন। চক্ষু ছোট হউক, হস্তী
পৃথিবীর সকল বস্তুই ত দেখিতে পায়,
কিছু ত আটক হয় না। বিশেষতঃ
যে রূপ টহারা স্বভাবতঃ সতর্ক তাহাতে
বড়চক্ষুর আর বিশেষ প্রয়োজন নাই।

পিতম। হাঙ্গার বুদ্ধিয়ান হউক বা
সতর্ক হউক, পশ্চাতের বিপদ কিছুই ত
দেখিতে পায় না। তাহাই আমার
বড় কষ্ট হয়।

চূড়াধন। তা তোমার এত কষ্ট হয়
কেন?

পিতম। গরের বিপদে আমার বড়
কষ্ট হয়, নিজের বিপদে বরং সাহস হয়,
মাগলের গফলই এই, ইহা বুঝিতে পারেন
ত। শেষ একটি হস্তিনীকে নির্দেশ

করিয়া) এই ভাষ্মতীর বিপদে আমার যেমন কষ্ট, রাজার বিপদে সেইরূপ কষ্ট, আবার আপনার বিপদেও প্রায় সেই রূপ। কিন্তু এই তিনজনেরই দৃষ্টিবদোষ সমান। পশ্চাদৃষ্টি রাজার একেবারে নাই, কেন না তিনি সকলকে বিশ্বাস করেন; আপনারও তাহা নাই, কেন না আপনি নিজের বুদ্ধিকে বিশ্বাস করেন। জীকে বিশ্বাস করিলে যেমন বিপদ, নিজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিলেও তাহাই ঘটিতে পারে। উভয়েই প্রায়দরী, বিশেষতঃ ছশ্চরিত্রা হইলে। আপনার বুদ্ধি ছশ্চরিত্রা—ইতিপূর্বে দুই একবার ধরা পড়িয়াছে, আজ একেবারে বেরিয়া যাবে।

চূড়ামনবাবু অতি তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, এমত সময় নবকুমার আসিয়া পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, “কে বেরিয়া যাবে হে?”

পিতম। কেন? চূড়ামনবাবুর ছশ্চ-
রিত্রা বুদ্ধি।

চূড়ামন। পাগলের কথায় কান দিলে
সকল সময় কান চলে না, ফের।

উভয়েই আবার পুরীপ্রবেশ করিলেন। পিতম ঘারে দাঁড়াইয়া ভিতরের কোলা-
হল শুনিতে লাগিল। পর্ত্ততরঙ্গ জল-
করোলের নায় তাহা অতি মধুর বলিয়া
তাহার বোধ হইতে লাগিল। পিতম
ঘারে প্রবেশ করিলে, সেই কোলাহল
আবও ঘোরতর ও মনোহর হইয়া উঠিল।
কিন্তু প্রাঙ্গণে আর সেরূপ কোলাহল বোধ

হইল না। পিতম চমৎকৃত হইয়া পুরী-
গার্গ আবার ফিরিল; ঘারে শব্দ অধিক,
প্রাঙ্গণে শব্দ অল্প, পিতম ইহার কারণ
কিছুই বুঝিতে পারিল না। পিতমের
যাতায়াত দেখিয়া দারপালেরা নিবেদ
করিল না। পাগলকে সকলেই শ্রদ্ধা
করিত। একজন পিতমকে নিকটে
ডাকিয়া আপন অদৃষ্ট গণনা করিতে
বলিল। পিতম মাথা নাড়িয়া বলিল,
আমি বড় ব্যস্ত; শেষ একমুটি সিদ্ধি
বাহির করিয়া সকলকে কিছু কিছু দিয়া
চলিয়া গেল। দারপালেরা দেখিল,
যে সেরূপ উৎকৃষ্ট সিদ্ধি তাহার আ
কখন চক্ষে দেখে নাই। সকলে আশ্চর্য
হইয়া পাগলাবাহাদুরের প্রশংসা করিতে
লাগিল। যে অবধি পিতমের প্রতি
রাজার অঙ্গগ্রহ হইয়াছিল, সেই অবধি
পিতমের প্রতি রাজভৃত্যদের বড় ভক্তি
জন্মিয়াছিল। অনেকে পিতমকে সাধক
মনে করিত, সাধক না হইলে রাজার
এত যত্ন কেন হইবে। ভক্তিহেতু দার-
বানেরা পিতমকে “পাগলাবাহাদুর”
বলিত, অদ্য আশ্চর্য্য সিদ্ধি পাইয়া সে
ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। অনেকে
ভাবিল, যে কৈলাসপুরীতে যে সিদ্ধির
ব্যবহার হয়, সিদ্ধপুরুষ কোনরূপ যোগাভ
করিয়া সেই সিদ্ধি আনিয়াছেন।

এক বুদ্ধ চোঁবে বলিল, “তাহা অসম্ভব
নহে, যখন ভাল সিদ্ধি মহাদেবের
নিমিত্ত আসে, তখন নন্দী তাহার কিছু
কিছু সিদ্ধপুরুষদের পাঠাইয়া দেন। বোধ

হয় পাঁচলাইয়া ছুর হালফেল কিছু মণ্ড-
গাদ পাইয়া থাকিলেন। একবার এক
বড় আজব ঘটনাক্রমে আমার পিতামহ
কিছু পাইয়াছিলেন। তিনি তখন ছোকরা
ছিলেন—বয়স জোর বিশবৎসর হইলে,
তখন তাহার বিবাহ হয় নাই, বিরোধ
করিয়া বিবাকী হন। প্রথমে হরিদ্বারে
কিছুদিন থাকিয়া, পরে কেদারনাথ ডা-
হিন হাত রাখিয়া একবারে কৈলাসের
নীচে আসিয়া পৌঁছেন। তখন সূর্য-
দেব হেলিয়া পড়িয়াছিলেন। পিতামহ
দূর হইতে কৈলাস দেখিতে লাগিলেন;
একদিকে রজ্জ্বাক্ষর, তিনি মেঘের
কোলে সেই রজ্জ্বাক্ষরের বাহার
দেখিতেছিলেন, এমন সময় মহামায়া
জগৎজননী গণপতিকে গদিতে লইয়া
এক আশ্চর্য সিংহের উপর আসওয়ার
হয়ে বনহইতে বাহির হইলেন। সে
সিংহের যে দেমাকু তাহা আর কি
বলিব। তাহাতে আসওয়ার হয়ে ছোকরা
গণপতি কতই খুসি, মার গদি হইতে
হেলিয়া পড়িয়া সিংহের ছটা ধরিয়া
টানিবেন চেষ্টা করিতেছেন। সতর্ক
সিংহ মাথা নামাইয়া চলিতেছে; মহামায়া
ধনিতছেন, “ছি! বৎস, সিংহকে
লাগিবে।” গণপতি আরও হেলিয়া
গড়িয়া ছটা ধরিবার উদ্যোগ করিতেছেন,
সিংহ ভয় দেখাইবার নিমিত্ত ছদ্ম
ছাড়িল, কৈলাসপর্বত অগ্নি কাপিয়া
উঠিল; গণপতি আত্মা দে নাচিয়া
উঠিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা ছুঁড়িতে লাগি-

লেন, সকল অলঙ্কার বাজিয়া উঠিল।
গণেশজননী সন্তানের গুঁড় ধরিয়া যুগ-
চুপন করিলেন। এদিকে কাঠিকের মার
মনে সিংহ চড়িতে পায়েন নাই বনিয়া
ধলায় পড়াগড়ি দিতেছিলেন; ভূদ্বী দিদি
ঘুটিতেছিল উঠিতে পারিল না, আর এক-
জন গিয়া মহাদেবকে ডাকিয়া আনিল।
পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া কাঠিকের আরও
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাদেব
পূরা চক্ষুতে চাহিতে চেষ্টা করিতে লাগি-
লেন, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,
“আইস বৎস, আমরা দুইজনে যুদ্ধনাহেন
বাই। বৃষ কেশন মণিমাণিক্যে সাজিয়া
দাঁড়াইয়া আছে। সিংহের ত কোন
অলঙ্কার নাই।” এই বলিয়া বাঁড়ের
শৃঙ্গের গায়ে ত্রিশূল হেলাইয়া রাখিয়া
আস্তরণ ঝাড়িতে লাগিলেন। ছোকরা
কাঠিকের মুক্তিকা হইতে উঠিয়া বজ্র-
বেগে গিয়া বৃষকে এক ধাক্কা মারিলেন,
তাহার সকল কিকিণী ঝন্ঝন্ করিয়া
বাজিয়া উঠিল। বৃষ একটু হেলি-
না, কেবল মস্তক নত করিয়া দিল।
কাঠিকের বাঁড়ের কপাল হইতে হীরার
ধুকধুকী ছিঁড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া
নিলেন। তাহার পর একে একে বৃষের
সকল অলঙ্কার ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।
আমার পিতামহ তাহা কুড়াইতে লাগি-
লেন। অলঙ্কার কুড়াইলে কাঠিকের
দৌড়িয়া গিয়া ভূদ্বীর সম্মুখে যে সকল
সিদ্ধির ছালা ছিল, তাহাও ফেলিয়া
দিলেন, পিতামহ তাহাও কুড়াইয়া লই-

লেন। এই সময় দুইশত চুড়া লোক গিয়া পড়িল; আমার পিতামহের সহিত লড়াই করিল। এক এক ভরবারের চোটে পিতামহ সকলকে ছটুকরা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, শেষ উপর হইতে মহাদেবের ত্রিশূল আসিয়া মাথা পড়িল, কাজেই পিতামহ মরিলেন। কার্তিকেয় ত্রিশূল ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাহাই মরিলেন, নতুবা তাঁহাকে মারা কাহারও সাধ্য ছিল না। চুড়াডেরা অলঙ্কারগুলি লইল; কিন্তু ত্রিশূল আর সিদ্ধির গাটরী আমাদের বাটা পৌছাইয়া দিয়া গেল, অদ্যাপি আমাদের বাটীতে ঐ ত্রিশূল আছে নিত্য পূজা হয়। আর রামলীলার সময় ঐ সিদ্ধি আমরা ছুটি ছুটি খাই। সেই অবধি কেহ আর আমাদের বাটার নিকট ঘোচ উঠা করিয়া যাইতে পারে না। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত দেখিতেছি, যে, আমাদের গোষ্ঠীর কেহ লড়াইয়ে স্থায়েন নাই, কেবল দুই একজনমাত্র লড়াইয়ে মরিয়াছেন। আর সেই সময় ত্রিশূলের যে খোসা পাইয়াছিলাম, অদ্যাপি টিক সেইরূপ রহিয়াছে।”

এই সময় নবকুমার আর চুড়াধনবাব একত্রে দাঁড়াইতেছিলেন; উভয়েই গল্পের কতকংশ শুনিয়াছিলেন, নবকুমার মাথা ফিরাইয়া বলিলেন, “চৌবে! শুট বাৎ।”

চৌবে রাগান্বিত হইয়া উত্তর করিল, “বাহাল আর হিন্দুস্থানী বহৎ ফারাক। দিক্রপে সামান্য কথা শুট হইল, আমার

কি পিতামহ ছিলেন না? আমি তবে কি আকাশ হইতে পড়িয়াছি?”

নব। তুমি এইমাত্র বলিলে তোমার পিতামহের বয়স তখন বিশবৎসর হইবে, আবার বলিলে, তুমি সে সময় উপস্থিত ছিলে, ত্রিশূলের তৎকালিক মদগন্ধ তোমার স্মরণ আছে তাহা কিরূপে সম্ভব?

চৌবে। পশ্চিমদেশে তাহা সম্ভব। আপনাদের দেশে তাহা আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমাদের দেশের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের দেশ বীরের দেশ, সেখানে সকলই সম্ভব।

নবকুমার হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। চৌবে ঠাকুর তাঁহার অল্পস্থিতিতে নানা আশ্বাসন করিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গালির চরিত্রমন্ডকে নানা প্রকার গালি দিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমাদের দেশে কহে;—

জি চাহে ত কর দুঃখকে মাত দোস্তি।

মগর না করো কভু বাঁধালা মে কস্তি ॥

১৫

রাজবাটীর প্রথমপ্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, দুই একজন এখানে সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। একদিকে অধ্যাপকেরা বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। তৎকালে কেবল স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল ছিল, ন্যায়শাস্ত্রের বাচালতা

বড় জন্মে নাই; এই জন্য শাস্ত্রালাপের
চীৎকার বড় অধিক শুনা যাইতেছিল না।
বিশেষতঃ রাজা তখন মৃত্যুর আইসেন
নাই।

আর একদিকে শতাধিক ভাট, মেরে-
স্তাদার শেখারের ন্যায়, পাগড়ি মাথায়,
বনিয়া আপন আপন আশ্রির কথা
কহিতেছিল, মধ্যে মধ্যে সুর করিয়া
একজ রাজার গুণকীর্তন করিতেছিল,
আবার তৎক্ষণাৎ তাহা ছাড়িয়া আপন
আপন ঘরের কথা কহিতেছিল।

রাজভৃত্যেরা নবাবী কায়দার পরিচ্ছদ
পরিয়া চারিদিকে বেড়াইতেছিল, সক-
লেই নয়, সকলেই বোড়হস্ত, সকলের
মুখেই সম্মানসূচক বাক্য। একজনকার
ভৃত্যেরা স্বাধীন হইয়াছে, মাথায় আর
তাহাদের পাগড়ি বাধিতে হয় না, বোড়-
হস্ত আর কথা কহিতে হয় না।
তখন নাপিত পর্য্যন্ত পাগড়ি বাধিত,
দাড়ি ধরিবার পূর্বে তাহারা ঐশ্বর্য
করিত।

এক্ষণে প্রভুদাস স্বাধীন হইয়াছেন,
তাহারা আপনইচ্ছামত পরিচ্ছদ প-
রিতে পারেন। অলঙ্ঘ্য, কল্যাণ-
হাসা বা পেণ্টুলন; আজ বাক্য সিঁথি,
কাল সোচ্চা সিঁথি; তাহার নিমিত্ত
কাহাকেও এক্ষণে কৈবিরত দিতে হয়
না। আহা! ইচ্ছাক্রমে, লোকের
ভয়ে কিছুই বর্জন করিতে হয় না।
ব্যবহারেও তাহাই, লোকের ভয়ে ক-
ন্যাকে অপায়ে দিতে হয় না। লোকের

ভয়ে দীনদশাপন্ন হইয়া পাকিতে হয়
না অথবা প্রথার ভয়ে পৈতৃক মূৰ্খতা
রক্ষা করিতে হয় না।

বাজালা এক্ষণে আহা! স্বাধীন, মা-
হারে স্বাধীন, শিক্ষার স্বাধীন, ব্যবসার
স্বাধীন। বাজালা এক্ষণে বর্থাৎ স্বাধীন।
এতদূর স্বাধীনতা বিলাতের কোথাও
আছে কি না তাহা মনেই। ইংরেজ
রাজা বনিয়া বাহার বাঙ্গালীকে পরাধীন
বলেন, তাহাদের স্বাধীনতাজ্ঞান আর
একরূপ।

পিতাম ধীরে ধীরে রাজভঙ্গি প্রবেশ
করিল, অতি কুস্তিভাবে একপ্রান্তে গিয়া
বসিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নতশিরে
থাকিয়া মস্তক তুলিল, তখন দীর্ঘ হাসি
হাসি মুখে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল কেহ
তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। পিতাম
কতক নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু পিতামের মনিন বেশ, বিশেষতঃ
তাহার স্নানমুখ রাজভগিনী অনিমিক্-
লোচনে দেখিতেছিলেন। পিতাম তাহা
কিছুই জানিতে পারে নাই। অন্তঃপুর-
বাসিনীরা অনেকে সভা দেখিবার নিমিত্ত
চীকের পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন,
সকলেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের দেখিতে-
ছেন, তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন
কেবল রাজভগিনী জোৎস্নাবতী অনি-
মিকলোচনে বৃদ্ধ পিতামের দিকে চাহিয়া
রহিয়াছেন। তাহার একজন পরি-
চারিকা জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরাদি!
অমন করে কি দেখিতেছেন?”

জ্যোৎস্নাবতী। স্বপ্ন দেখিতেছি।
পরি। ঘুম কই যে স্বপ্ন দেখিবেন?
জ্যোৎস্না। আমি নিদ্রিত কি জাগরিত
বুঝিতে পারিতেছি না।

পরিচারিকা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে
লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া ক্ষান্ত
হইল; যেদিকে জ্যোৎস্নাবতী চাহিয়া
রহিয়াছিলেন, পরিচারিকা তাহা অহসরণ
করিয়া দেখিল, রাজভগিনী পিতম পাণ-
দাকে দেখিতেছেন। কোন-হেতু নির্দেশ
করিতে না পারিয়া আরও আশ্চর্য হইল।
পিতমের রূপ আছে, না বয়স আছে,
না অলৌকিক কিছু আছে যে তাহার
প্রতি রাজভগিনীর দৃষ্টি পড়ে। জ্যোৎস্না-
বতীও বয়স হইয়াছে, বৃদ্ধা বলিলেই
হয়, তবে এ ব্যবহার কেন? পরিচারিকা
আপনা আপনি অনেক ভাবিল, কিছুই
বুঝিতে পারিল না।

জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণপরে দীর্ঘ-
নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পরিচারিকাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাতঙ্গিনি, তুই
এই জুখী, এই দরিত্রকে চিনিস?”

পরিচা। চিনি মা, ও পাগল।

জ্যোৎস্নাবতী। এর উপর আবার
পাগল হইয়াছেন?

পরিচা। ও আজ্ঞাপাগল। পথে
পথে বেড়ায়, ভিক্ষা করে খায়, রাজে
গাভতলায় পড়ে থাকে।

জ্যোৎস্নাবতী মুখে অক্ষণ রিয়া কাঁ-
দিয়া উঠিলেন। আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু
মুছিয়া চারিদিকে চাহিলেন। কেহ

তাহার ক্রন্দন শুনে নাই, দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, “যদি তুই জানিস
তবে বল দেখি, সকল কথা বল দেখি
শুনি।”

পরিচা। আমি আর ত কিছুই জানি
না, ওর নাম পিতম পাগল। এই জানি।
এইখানে ঘুরে বেড়ায় এই দেখেছি।

জ্যোৎস্নাবতী। এত স্থান থাকিতে
এখানে কেন? তাই বা কেন জিজ্ঞাসা
করি।

পরিচা। ও কে মা, তবে, ওরে কি
চেন, ওর বাড়ী কোথায়?

জ্যোৎস্না। পিতম! পিতম নাম কেন?
দাদা কি এ কাঙ্গালকে দেখেছেন,
কখন আলাপ করেছেন? তিনিও কি
পিতম বলে কথা কন?

এই সময় বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল,
রাজা আসিতেছেন বলিয়া সভ্যমণ্ডল-
কলে উত্তীর্ণ হইয়া উঠিল। পিতমও উঠিল।
রাজা আসিয়া প্রধান প্রধান সকলের
সহিত তুই একটি কথা কহিয়া আসনে
উপবিষ্ট হইলেন। বসিবারাত্র ভাটেরা
মনোহর স্বরে স্তবপাঠ করিতে লাগিল,
এই অবকাশে রাজা ইতস্ততঃ অবলো-
কন করিতে লাগিলেন। পিতমের প্রতি
দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু রাজা কোন সম্ভাবণ
করিলেন না দেখিয়া জ্যোৎস্নাবতী আ-
পনা আপনি বলিতে লাগিলেন, “তবে
কি আমার ভ্রান্তি? না তা নয়; হয় ত
দাদা চিনিতে পারেন নাই।”

পরিচারিকা বলিল, “ঠাকুরাণি, আপ-

নার ছাখানি পায়ে পড়ি, কে পিতম দলুন না।”

জ্যোৎস্না। ইনি এতদিনে কতদিন এসেছেন?

পরি। অনেককাল, আমাদের তু জন-ভোর দেখিতেছি, তা আমাদের বয়স-ত অধিক নয়, কিন্তু সকলেই বলে পিতন অনেককাল অবধি এখানে আছে।

জ্যোৎস্না। তুমি কখন এই কান্নালের সঙ্গে কথা কয়েছ?

পরি। না মা, আমার ভয় করে। কি জানি পাগল যদি কিছু বলে।

জ্যোৎস্না। এখানে অনেক দিন আসে? অথচ আমি তাহা জানিতে পারি নাই।

এই সময় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, “রাজকুমারকে আশীর্বাদ করিবার নিমিত্ত রাণীঠাকুরাণী আপনাকে ডাকিতেছেন।” জ্যোৎস্নাবতী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

রাণীমহলে এক বিস্তৃত শয়্যায় রাণী নানা অলঙ্কারে সজ্জিত পুষ্পকে লইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে আশ্রয় সজ্জনেরা বসিয়া রাজকুমারের গুণগাথা করিতেছে, সম্মুখে এক স্বর্ণপায়ে ধান্য দুর্কা প্রভৃতি আশীর্বাদের উপকরণ রহিয়াছে। জ্যোৎস্নাবতী আসিবামাত্র রাণী বলিলেন, “তুমি আশীর্বাদ না করিলে আর কেহ আশীর্বাদ করিতে পারিতেছেন না। সকলের আশীর্বাদ

করা হইলে বাহিরে ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করিবেন। রাখা সভায় গিয়াছেন।”

এই সময় চুড়াধন বাবুর স্ত্রী রান্ধুগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কি আজি-কাল দিনে তোমার চোখে জল পড়েছে কেন?” রাণী একবার জ্যোৎস্নাবতীর মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। রান্ধুগিনী অপ্রতিভ হইয়া স্বর্ণধামসহস্তে তুলিয়া রাজকুমারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজকুমার তাঁহার অভিনন্দিত অমুভব করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিল। জ্যোৎস্নাবতী ধান্যদুর্কা হস্তে তুলিবামাত্র শিশু মাথা সরাইয়া লইল। গুটুর মা একজনকে চুপি চুপি বলিলেন, বরের গায়ে ছুরি দিতে গেলে বর যেমন করে, রাজকুমার আজ ঠিক তাই করিতেছেন।

জ্যোৎস্নাবতী আশীর্বাদ করিলে একে একে সকলেই ফুল লইয়া আসিলেন, রাজকুমার তাহা দেখিয়া কাদিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে ছাড়িল না, সকলেই মাথায় ফুল দিতে লাগিল। মাধবীলতা আর কোড় হইতে নামিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া রাণীর নিকটে আসিল, একবার স্বর্ণপায়ে দিকে চাহিল, আবার রাণীর মুখপ্রতি দেখিল। তাহার পর একটি ফুল বুড়াইয়া লইয়া রাজকুমারের নিকট সরিয়া গেল। ক্রমে ক্ষুদ্র হস্তখানি তুলিয়া ফুলটি ছাড়িয়া দিল। ফুলটি রাজকুমারের মাথা কি অঙ্গ স্পর্শ করিল না, শয়্যায় পড়িয়া গেল। মাধবী আবার সেই ফুলটি

কুড়াইয়া বইয়া ক্ষুদ্র হাতখানি তুলিয়া। রাজকুমারের কানপর্যন্ত হাতখানি পৌঁছিল। সেবার ফুলটি ফেলিয়া দিয়া মাধবী ক্ষুদ্র অঙ্গুলিদ্বারা রাজকুমারের চুল স্পর্শ করিল। স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া রাণীর মুগ্ধাতি চাহিল। রাণী আর একটি ভাল ফুল হাতে দিয়া বলিলেন, “কর, তুমিও আশীর্বাদ কর তোমারই আশীর্বাদ ন্যতর।” এই কথায় রাজভগিনী একবার রাণীর দিকে চাহিলেন, এবার রাণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। মাধবীলতা ফুলটি তুলিয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, বামহস্তে দুই একটি তাহার পাণড়ি ছিঁড়িল, তাহার পর রাজকুমারের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। মাথা স্পর্শ হইল না বলিয়া সেইদিকে সরিয়া গেল। আবার হাত বাড়াইয়া দেখিল আবার সরিয়া গেল। শেষ মাথায় ফুল দেওয়া হইল। মাধবী আপনাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া আহ্লাদে ছুটিয়া মার ফ্রেড়ে গিয়া উঠিল। মাতা পুনঃ পুনঃ মুখচুশন করিতে লাগিলেন।

এই সময় চূড়াধনবাবুর স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন যে, কই রাজভগিনী-এর মধ্যে আবার কোথার গেলেন। রাণী অমনি তীব্রদৃষ্টিতে চারিদিক দেখিলেন, তাহার পর পরিচারিকাদিগকে বলিলেন তোমরা কে, রাজকুমারকে রাজসভায় লইয়া যাইবে আইস। একজন তৎক্ষণাত্ আশিয়া রাজকুমারকে ফ্রেড়ে লইল, সকলে সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরের দ্বার

পর্যন্ত চলিল, রাণী কতকদূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ক্রমে আর আর সকলেও ফিরিয়া আসিয়া রাজসভা দেখিবার জন্য রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

রাজকুমার সভায় হইবামাত্র ব্রাহ্মণেরা সকলেই উঠিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। নহবৎ বাছিয়া উঠিল। রাজা অগ্নি রাজকুমারকে ফ্রেড়ে লইয়া বাহির হইলেন। রাজদ্বারে গিয়া দরিদ্র দিগকে অর্থদান করিবার আদেশ করিলেন। মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। চারিদিকের বাদ্যোদ্যম ছাড়াইয়া দরিদ্রের চীৎকার উঠিল।

রাজসভার প্রায় অধিকাংশ লোকেই কাঙ্গালিবিদ্যার দেখিতে বাহির হইলেন, কেবল দশ বারজন অধ্যাপক একত্রে বসিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দুঃখিতম পাগলা একা বসিয়া থাকিল। পূর্বমত স্থান ও অন্যমনস্ক। একজন ভাট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে এখানে? বাহিরে কাঙ্গালীবিদ্যায় হইতেছে, এখানে বসিয়া কেন ঠকিতেছ। পিতম তাহার প্রতি চাহিল, কোন উত্তর করিল না। কলকালপরে নবকুমার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি পিতম, বাদ্য অপেক্ষা কিসের শব্দ অধিক?”

পিতম। শুনিতে ত পাইতেছেন।

নবকুমার । আচ্ছা, দরিদ্রের চীৎকার
‘অপেক্ষা’ কিম্বদ শব্দ অধিক ?

পিতামহ । পুত্রশোকের ।

একজন অধ্যাপক বলিলেন, “শুনিলে,
পাগলা কি বলিতেছে। পাগলার যে
জ্ঞান আছে আপনাদের তাহা নাই।
আপনারা কোন বুদ্ধিতে আমাকে দৈর্য্য
হইতে বলিতেছেন। আমি অনেক সহ্য
করিয়াছি। এখন সকল শুনিয়াছি আর
কেন সহ্য করিব। এককালের কষ্ট
হইতে আজ মুক্ত হইব।”

এই সময় রাজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া
কিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সক-
লেও আসিল। রাজা আসিবামাত্র সেই
অধৈর্য্য অধ্যাপক অগ্রসর হইয়া বলিল,
“পুত্রকে আমার সমর্পণ করুন, এ
সম্ভান আমার।”

রাজা । আপনি কি চান ?

অধ্যাপক । আমার পুত্র চাই।

রাজা । তোমার পুত্র কোথা ?

অধ্যাপক । সে আপনার ক্রোড়ে ।

রাজক্রোড়ে আমার সোনার চাঁদ, একবার
দিন বুকে করি। বোর হয় আমার কণা
বুঝিতে পারিতেছেন না। আমার পা-
গল ভাবিতেছেন। আমি পাগল হই-
য়াছিলাম মতা কথা, কেন হব না ?
আমার ঘরে ছেলে শুয়ে। প্রাতে
সে ছেলে আর কোথাও নাই। পীড়া

মিড়া নয়, মাতৃকোড় হইতে গেল
গেল। এতে কে না পাগল হয়। মোকে
বলিল, জ্যোতিষ ব্যাপার; আবার কেহ
বলিল, আত্মহরণের কার্য্য, আমি তখন
জানি না যে, রাজার কার্য্য। এখন
প্রমাণ পাইয়াছি যে আগাদের। মৃতবৎসা
রাণী মৃতকন্যা গ্রাসব করিয়া এ হতভাগার
কপাল পোড়াইয়াছেন। ভাড়া লাহা
হইবার হইয়া গিয়াছে, আমি সকল ভ্রম
বিস্মৃত হইলাম, এক্ষণে আমার স্বাস্থ্য
সমর্পণ করুন।

“এ কি ব্যাপার” বলিয়া রাজা পুত্রকে
বুকের ভিতর করিয়া আন্দরে চলিয়া
গেলেন। অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে বাইবার
উদ্যোগ করিলে, সকলে তাঁহাকে নিরস্ত
করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইলেন। কেহ
কেহ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া রহিলেন।
ব্রাহ্মণচীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,
“সকল অধর্ম্ম অপেক্ষা পুত্রহরণ অতি
শুরুতর, অতএব সাবধান সাবধান, রাজার
পায়ে রাজা নষ্ট।”

এই সময় দেওয়ান অগ্রসর হইয়া
ব্রাহ্মণকে বলিলেন, “মহাশয়কে পুত্র-
শোকাবুল দেখিতেছি, আপনি আমার
সঙ্গে আসুন, কে আপনার এই ছব-
বস্থার যত্ন বাড়াইয়াছে তাহা শুন।
কিরূপ প্রমাণের দ্বারা আপনার এ ভ্রম
জন্মাইয়া দিয়াছে তাহা বলিবেন চলুন।”



বঙ্গদর্শন ।

সপ্তম বৎসর ।

৭৬ সংখ্যা ।



মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা ।

অসামান্যিক বলিলে এক্ষণে গালি
বুঝায়, কিন্তু সমাজবিবর্তিত মানবচরিত্র
সৃষ্টি করিতে সকলেই বাস্তব । আধুনিক
বিজ্ঞানবিদ সে চিন্তায় হাস্য করিতে
পারেন, কিন্তু পৃথিবীর সর্বজাতির, সকল
শাস্ত্র আমূল এই কল্পনার পরিপূর্ণ
রূপে যখন সাগোর ছন্দুভিনিবাদের
বৈষম্যময় ফাঙ্কসমাজ আলোড়িত করি-
য়াছিলেন, তখন তিনি এই কল্পনার
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সিদ্ধকাণ্ড
হইয়াছিলেন । দেখা যায় ভগবতের
শিফাণ্ডক কবিসম্প্রদায়ের বিশেষ চেষ্টা,
সমাজবিবর্তিত-অপূর্ব-মৌল্যময়-চরিত্র
সৃষ্টি করা । তাহা গুণ কি দোষ এক্ষণে
বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের মহা-
কবি কালিদাসের, প্রায় সকল কাব্যের
ইহাই উদ্দেশ্য । তবে কথা এই, যে
তাহার কাব্যে নিরবচ্ছিন্ন সমাজবিবর্তিত
চরিত্র নাই;—একটু না একটু সমাজ-
সম্পর্ক তিনি রাখিয়াছেন । কিন্তু একে

বারে নিরবচ্ছিন্ন সমাজবিবর্তিত চরিত্র দুইটি
আছে;—এক মিরন্দা, দ্বিতীয় কপাল-
কুণ্ডলা । এই দুই চরিত্র আজি আমা-
দের সমালোচ্য বিষয় ।

বাস্তবিক, সমাজবিবর্তিতা, চমৎকার-
কারিণী, সারল্যপ্রতিমা মিরন্দাচরিত্র চিত্র
করিবার জন্যই সেন্সপীয়ার Tempest
নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন । তাহার অন্য
উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; অন্য নৈতিক-
তত্ত্ব তাহার প্রতীপাদ্য হইতে পারে;
কিন্তু নাটকের মূলপ্রতি, মেফদণ্ড, এই
মিরন্দার চিত্র । নীলিমাময় অনন্ত সাগ-
রের বক্ষে বিজন ক্ষুদ্র দ্বীপ । তথায়
কেবলমাত্র শিভসহবাসে, মিরন্দার
স্বকোমল হৃদয় বিকাশ পাইয়াছিল । সে
পিতৃতত্ত্ব আবার অমাজুষ্যত্ব।—বাহ্য
অমৌলিক, বাহ্য অনোর পাশ্বে অনধি-
কার চর্চা, তাহাই তাহার চরিত্রের সর্ব-
ময় উপকরণ । বাহ্য সংসারের প্রধান
স্বার্থ, প্রধান সম্মান, তাহাতেই তিনি

উপেক্ষা করিয়া, অতৃপ্তভাবে, অসুদিন শাঙ্গালোচনায় রত ছিলেন। অন্য যে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, মানুষের মন যে এত সংকীর্ণ, এত স্বার্থপর, তাহা তাহার অসীম বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইত না। তাই তিনি কত্ভার সমক্ষে ভাতার কুব্যবহার বর্ণনা করিতে করিতে ও স্থাবোগ্য ভাবে তাহার দুষ্ট-নীয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। এ চরিত্রও কিয়ৎপরিমাণে সমাজবিরহিত নয় ত কি? সুতরাং পিতার সামাজিক জ্ঞান, কন্যার মনবিনয়নবিষয়ে কোন সাহায্যই করে নাই। জড়প্রকৃতির ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ, আর পিতার অলৌকিক কার্যকলাপ, মিরন্দার চরিত্রবিনয়নের প্রধান উপায়। তাহার উপর মিরন্দা পিতার নিকট সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতার মোহনীয়, কমনীর চরিত্রের বিকাশ তাহাতেও হইয়াছে। যখন পিতার রাজ্যনাশ, বন-ব্যয়ের কথা শুনিয়া শোক হুংখে মিরন্দার কোমল হৃদয় ফাটিতেছিল, মিরন্দা সম্মুখে পিতাকে বলিল,

“Alark, what trouble
Was I then to you!”

পিতা প্রসূপারো আশ্রয়স্থ বিস্মৃত হইয়া কন্যার স্নেহে অভিভূত হইলেন। বলিলেন,

“O! a cherubin
Thou wast, that did preserve me!
Thou didst smile,

Infused with a fortitude from
heaven
When I have deck'd the sea with
drops full salt,
Under my burden groan'd; which
raised in me
An undergoing stomach, to bear
up
Against what should ensue.”

এই কোমলচরিত্র যে কতক উত্তরাধিকারনিয়মে, কতক বা আদর্শের বলে, মিরন্দার হৃদয় সংঘটন করিয়াছিল, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না।

প্রবলবাহ্যামখিত, অনন্ত নীল সাগরের তরঙ্গরাশির মধ্যে, অসহায়, মগপ্রায় তরী দেখিয়া মিরন্দা ঘোর ব্যথিতা হইলেন। পরের হুংখে আন্তরিক সহানুভূতি স্বীকৃতিভিন্ন আর কে দেখাইতে পারে? বিশেষ মিরন্দার কমনীয় চরিত্র কখনও আর কোন নিষ্ঠুরতার সম্পর্কে আইসে নাই।—মিরন্দা যাহা নিত্য দেখিত, তাহার সকলই ত ঔদ্যাময়, সকলই ত দয়ার, সহৃদয়ের আকর। এ অবস্থায় মিরন্দার কোমলপ্রকৃতি অলৌকিক কমনীয়হালাভ করিয়াছিল। মিরন্দা সেই মগপ্রায় তরীর জন্য, তরী-মধ্যস্থিত ব্যক্তির জন্য ব্যথিতা হইলেন। দয়ার উচ্ছ্বাসে, অশ্রুপূর্ণনয়নে, কাতর-বচনে পিতার সাধনা করিতেছেন, “যদি পিতঃ, মস্তবলে তুমি এই ভীষণ বাত্যা, এই তরঙ্গভঙ্গভীষণ সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়া থাক

আমার মিনতি ইহা শান্ত করিয়া দাও। কাহাকেও দুঃখ পাইতে দেখিলে আমা-
রও বড় দুঃখ হয়। স্বপ্নে স্বপ্নের তরী।—
নিশ্চয়ই উহার আরোহীরা মহৎ হইবে।
—আহা, অমন ভরীখানি, একেবারে
গণ্ড গণ্ড হইয়া গেল। উহাদের রোদন-
ধ্বনি আবার মর্মান্তিক করিয়াছে। হায়,
যদি আমার সাধা হইত, আমি সমুদ্রকে
পৃথিবীর গর্ভে নিমগ্ন করিতাম—হরীকে,
আরোহীদেরকে বাচাইতাম।” ইহা শু-
নিয়া পিতা প্রস্ফুটিল। মুখ হইলেন।
বলিলেন, “ভয় কি তোমার? শান্ত হও,—
কিছুই তু হয় নাই। বাহা করিয়াছি, তাহা
তোমারই মঙ্গলের জন্য।” তখন তিনি
দীনেন্দ্রা, মুখা সেই কন্যার সমক্ষে
আপনার পূর্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিতে আ-
রম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রতিকথা কল্পা-
ময়, পায়গাভেদী, মধুরিমাশয়। মিরন্না
তাহাই একাগ্রচিত্তে শুনিতছিল। শুন-
িতছিল, আর সরলা বালিকা, অকপটে
আত্মবহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল।
শুনিত। শুনিত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি-
তছিল। সে কাহিনী শুনিলে কে-
না দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। কতক্ষণে
মুখ প্রস্ফুটিল। মানবহৃদয়ের মহান-
কাণ্ডারী;—তিনি মহান হৃদয়নাগরের
মোহময় সকল আবর্ত বুদ্ধিতে। তাই
কন্যাকে অনামনস্বা করিবার চেষ্টা পাঠ-
লেন। প্রতিপদে তিনি তাহার মনো-
যোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাজ-
বাসীদের স্বপ্নের সর্বপ্রণামী;—বহু বিষয়

সে হৃদয়ের আলোচ্য।—সুতরাং সমাজ-
বিবাহিতচরিত্রে একাগ্রতার আবির্ভাব
অধিকতর। মিরন্নার তাহাই হইয়াছিল।
বলিতেছিল “তোমার কাহিনীতে পিতা,
পুত্রেরেরা প্রবণশক্তি হয়।” ফলতঃ
এই মিরন্নাচিত্র সর্বজ্ঞ কবির অপূর্ণ
মোহময় সৃষ্টি। মেরুপীঠের মিরন্না
পদিততার প্রতিমা করিয়া গড়িয়াছেন।
খুঁটাতের নারকী বাবুজীরেব কথা
শুনিয়া মিরন্না ব্যথিত হইল, কিন্তু তবু
সে মন পাণের ভাব ধারণ করিতে
অক্ষম। অন্যের প্রতি পাণের আরোপ
হইলেও তাহার অসহ। তাই বলিল,
“তাই বলিয়া পিতামহীর মহত্ব মনে
করিলে পাণ হয়;—স্বগর্ভে কুমন্তান ত
ভয়ে।” আবার যখন শিশুগণে মিরন্না
জ্বলিল যে পঞ্জালো নামক এক ব্যক্তি
পিতার সেই মহা বিপদকালে কিছু
উপকার করিয়াছিল, অমনি তাহার
মহৎহৃদয় সকল ভুলিয়া কৃতজ্ঞতারগে
গলিয়া গেল। বলিল, “একবার তাঁহাকে
দেখিতে বড় গাং করে।” পদিততার
এই প্রতিমা, সারল্যের এই মোহিনী
ভবী, অনন্তকাল লোকমনোমোহন
করবে।

নেপল্‌স্ রাজকুমার কার্দ্দিনান্দকে
নয়নগোচর করিবারাজ, সরলা মিরন্না
বিমুগ্ধা হইল। এই ক্ষণে তাহার সমাজ-
বিবাহিতার ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।
দেখিয়াই মিরন্না রাজকুমারের প্রতি আ-
সক্ত হইলেন;—অগচ নিজে তাহা অগ্র-

ভব করিতে পারিলেন না। প্রস্ফারো বুঝিলেন;—ভাবিলেন,

"It goes on I see,

As my soul prompts it."

গৃহস্থ কামিনীতে, আর সনাতনবিরহিনী বনবাসিনীতে এই প্রভেদ। ব্রীড়াবিনত রক্তিমামল একের মাধুর্য্য; তাহার নিরঙ্করভাব অন্যের কমলীরতা! অনা-
থ্যগে, অকপটে নববুধতী মিরন্দা, নবীন-
যুবক ফার্দিনান্দকে দেখিয়া দেবতা ভা-
বিয়া বলিল, "দেখ পিতঃ, ঐ দেবমূর্ত্তি
দেখ! দেবমূর্ত্তিই ত বটে!—কি সৌন্দ-
র্য্যাকৃতি!" প্রস্ফারো বুঝাইয়া বলি-
লেন যে, "তাহা নহে। উহারও ক্ষুধা,
তৃষ্ণা আছে, এও মানুষ। পোকে ক্রিম-
মাণ হইয়াছে, নহিলে আরো সুন্দর
দেখিতো!" মিরন্দা বলিল "আমার কাছে
ঐ দেবতা!—আমি আর কখন এমন
নহং দেখি নাই!"

ফার্দিনান্দ সেই বিজন দ্বীপে, লোক-
মোহিনী, অপূর্ণ রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া
বিম্মিত হইলেন। যাহা মনে ভাবিলেন
উচ্ছ্বাসে মুখেও তাহাই ব্যক্ত হইল।
বলিলেন "বুঝিরাছি, ইনিই এই দ্বীপের
অধিষ্ঠাত্রী দেবী;—আর ঐ যে যৌতিক-
লঙ্কারী শূনিকায়, উহারাই ইহার সহচরী!
ভাল দেবি, আমি আপনার অলুপ্তি
এখন করিয়া এ দ্বীপে বাস করিলে ত
হানি নাই? কিরূপে এখানে বাস করিব,
তাহা আমার উপদেশ করুন। আমার
একটি প্রশ্ন আছে—আগেই তা বলিতাম!

হে আশ্চর্য্যরূপিণি, আপনি কি আজিও
কুমারী?" মিরন্দা আপনাকে দেবীনামে
সম্মানিত হইতে দেখিয়া বলিল, "আমি
ত আশ্চর্য্যরূপিণী নহি, আমি কুমারীই
বটে!" মিরন্দা ও ফার্দিনান্দ উভয়ের
প্রতিবাক্যে, প্রতিপদে প্রকাশ পাইতে
লাগিল যে প্রথমদর্শনেই তাহারা পর-
স্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে।
তাই প্রস্ফারো ফার্দিনান্দের অগ্নি-
পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে
ফার্দিনান্দের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ
করিতে শুনিয়া মিরন্দা মর্মে মরিয়া
গেল। বলিল, "কেন পিতঃ, এমন
কঠোর ব্যবহার করিতেছ? আমি জ্ঞানে
এই তৃতীয় মানুষ দেখিলাম! প্রথম
দেখিয়াই ইহার প্রতি আমার সহানুভূতি
হইয়াছে। পিতা দয়া কর—আমার কথা
শুন!" প্রস্ফারো এই অনুরক্ত যুগলের
প্রেমগাত্তর্য্য পরীক্ষা করিতেছিলেন।
তিনি প্রকাশ্যে, কৃত্রিমক্রোধভরে বলি-
লেন; "তুমি কাহার চরমাত্র! কেন তুমি
আমার দ্বীপে পর্য্যটন করিলে? আমাকে
এই দ্বীপচ্যুত করিয়া ইহা অধিকার করিতে
কি তোমার ইচ্ছা?" মিরন্দার হৃদয়ে এ
তিরস্কার অসহনীয় হইল। আপনার
হৃদয়ের পবিত্রতায়, বাহ্যিকের মন্দনো-
দ্দেশ্যে বলিল "অমন মর্দরে কি কখন
পাপ বাস করিতে পারে? পাপের গৃহ
যদি অমন সুন্দর হয়, তবে দেবতারও
তাহার প্রায়শী হইবেন!" বুড়া প্রস্ফারো
রদ দেখিতে লাগিল—বুড়ারা বুঝি যৌব-

নের লীলাতরঙ্গ স্রবণ করিয়া তখনেই প্রেমলহরী গণিতে ভালবাসে। বুড়া ফার্দিনান্দকে বলিল “তুমি শঠ—আমি তোমার হাত, পা বাধিব; নন্দ্রের লব-গাক্ত জন তোমার পানীর হটেবে; তোমাকে কটুকমার ফলমূল, অপান্না খাইতে দিব।” বীররাজকুমার ইহাতে ভয় পাইল না। ক্রোধে তরবারী নিক্ষেপিত করিয়া বলিল, “তাহা কখন হইবে না। দেপিব শত্রুর অঙ্গে কত বল।—তারপর বশ্যতার কথা।” মিরন্দা বড় কঁাকরে পড়িল। বলিল, “না শিষ্ঠ, ইহাকে এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলিও না। কই, ইহাতে আশঙ্কার কিছুই নাই—ইহার সবই ত কমলীয়া!” কিছুতে না পারিয়া অল্পরক্তা, চিত্তময়ী মিরন্দা পিতাকে সাধোঁধন করিয়া বলিল “ছি তাত, একটু দয়া কর! আমি উহার জামিন হইতেছি!” প্রম্পারো উপায়াত্তরে মিরন্দাকে পরীক্ষা কবিত্তে লাগিলেন। “আর কিছু বলিও না। আর কিছু বলিলেই দ্বিগুণ করিব। কি! ছদ্মবেশী প্রণবকের জন্য তুমি পত্নরোধ কবিত্তেছ? ছি ছি! তুমি কি প্রেমমুগ্ধি কালিদাস আর এই তরুণ যুবককে দেখি-রাই হির করিলে যে যুবার সৌন্দর্যের তুখনা হয় না? নিষ্কোষ! অদিকাল মাহবের কাছে এই যুবক কাটিবনের মত। তাহার ইহার তুলনায় ত দেবতা!” মিরন্দা তখন গলগল বচনে, সজ্ঞানেজে যুবকটিকে পিতাকে বলিল, “তবে আমার

স্নেহাশয় বড় নীচ! এর চেয়ে সন্দের কা-হাকেও দেখিতে আমার উচ্চা হয় না।” প্রম্পারো কনার প্রণয়গাভীণী মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারই পরাজয় হইল। সমাজবিরহিনী, ব্রীড়াবিচুকা তরুণীর প্রণয়ভাব কেমন সরলভাবে বিকশিত হইতে পারে, প্রেমলহরী তাহা কেমন সুন্দর চিত্র করিয়াছেন। কনার এমন মোহময় কার্যক্ষেত্র আর হইতে পারে না; এমন সুন্দর চিত্রকরও বুঝি আর হয় না। কনকঃ প্রম্পারো চিত্র কবির আশ্রয়িত বিধ। প্রম্পারো দৈববলে অদ্ভুতগৎ মন্থন করিয়া, অদ্ভুতগতিবশক্তি-মুহু শামন করিয়া আরু-অনারুধী-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্বয়ং যোগ-পীরও তাহাই করেন।

প্রম্পারো দাণ্ডবিত্তই ফার্দিনান্দকে বিষম অগ্নিপরাীক্ষার নিষ্পেক্ষ করিলেন। তিনি আবার এই সুযোগে মিরন্দার অনলম্পর্শী প্রেমের পরিমাণ কবিত্তে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নবীন, অলৌকিক প্রণয়ের চরমলীলাভঙ্গ দেখিতে মাধে করিলেন; অনাবৎসল, কনার ভাবী স্বপ্ন বর্জ্যানে নন্দ্রণোড়র করিবেন দিব করিলেন। দ্বীপের প্রান্তস্থদেশে ফার্দিনান্দকে তিনি অগ্নিপরাীক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন। হুজুদুমারকে দারুণ অত্যাচারে কাঠভাব বহন করিতে বাধ্য করিয়াছেন। তারপর মিছামিছ কল্যাকে বলিয়াছেন যে তিনি তিনঘণ্টা কাণ দীতিমত অব্যয়নে নিব্বিই হইবেন—

মিরন্না অজ্ঞাত যেন না যান! কিছু মিরন্না আজ আর ইচ্ছা করিলেও পিতার বাধা হইতে পারিলেন না। কাঁচ অজ্ঞাত হইল বুঝিলেন, কিন্তু বাস্তবিক দেখিবার বাসনা কোন বাধা মানিল না। রাজ-কুমার বিষম আভ্যুত্থানে কাষ্ঠভার বহন করিতে ছিলেন;—পরিশ্রমে ক্রান্ত হইয়াছেন, ললাটে শ্বেদনির্গম হইতেছে। তাঁহার গৃহের অপরিমিত সুখরাশি অদৃষ্ট মনে পড়িতেছিল;—পশুবৎ দাসগণের জীর্ণ বাতনা বুঝি হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। কিন্তু তবু মিরন্নার মোহিনীমুখি তাঁহার দৃশ্যে জাগিতেছিল। সেই কণাই তিনি ভাবিতেছিলেন;—

“I must remove some thousands of these logs and pile them up upon a sere injunction; my sweet mistress weeps when she sees me work and says such business had never like executor.”

মিরন্না যখন আসিলেন তখন ফার্দিনান্দ কাঠের শ্রেমে রত। দেখিয়া মিরন্নার হৃদয় চুঃখে ফাটিতে লাগিল। বলিল “আহা! আর শ্রম করিও না। ক্ষুব্ধ করুন বিজ্ঞাৎ আমিও সকল কাষ্ঠ পুড়াইয়া দিক। তাহা হইলে আর তোমার শ্রম করিতে হইবে না। একটু বিশ্রাম কর।—তোমার বড় শ্রম হইয়াছে। এই কাষ্ঠভারের ভয়ানক পাকে ত ইহারা পুড়িবার সময় অশ্রুপর্বন করিবে—কেন না তোমার ইহারা বাতনা

দিয়াছে। নিত্যা এখন পাঠে নিমগ্ন হইয়াছেন;—আমার দিনতি এই সময় একটু বিশ্রাম কর। তিন ঘণ্টা ত আর তাঁহার জন্য কোন আশঙ্কা নাই।” ফার্দিনান্দ বলিল, “হে মধুসুতা! বিলাপ্যাহারের পূর্বে যে আমার সব কাষ শেষ করিতে হইবে!” মিরন্না দেখিল ফার্দিনান্দ মিরক্ত হয় না। বলিল, “তাল আমাকে দাও,—আমি এখন তোমার কাষ্ঠভার বহন করি!” ফার্দিনান্দ বলিল “না তাহা হইবে না। আমি বলিয়া থাকিব, আর তুমি এই অপমানের কাষ করিবে। আমার প্রাণ বার সেও স্বীকার, তোমার তাহা করিতে দিব না!” মিরন্না ছাড়িল না; আবার বলিল, “এ আর অপমান কি? তুমি করিতে পারিয়াছ, আমি করিলে দোষ কি? আর, আমি তোমার চেয়ে অনার্য্যে ইহা করিতে পারিব—কেন না আমি ইচ্ছায় করিব; তুমি অনিচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার কষ্ট কাষেই বেশী হইতেছে।” ফার্দিনান্দ মুগ্ধ হইয়া সেই নারীপ্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?” মিরন্না একেবারে বলিল, “আমার নাম মিরন্না।” কিছু পিতার আজ্ঞানুগত করা হইল, এ কথা পরক্ষণেই যখন মনে হইল, তখন বলিল “পিতা; এইবার তোমার আজ্ঞায় অবহেলা করিলাম।” ফার্দিনান্দ বলিল “মিরন্না! তুমি সংসারের মাঝরতা। আমি অনেক রমণী দেখিয়াছি, অলেকের কথা শুনিয়াছি,

অনেককে অনেক স্ত্রীর জন্য মেহ করিয়াছি; কিন্তু তোমার মত সকলগুণে গুণবতী, সর্বদাসহকরী কাহাকেও দেখি নাই। তুমি বিধাতার মানসপ্রতিমা, তুমিই তাঁহার চরম সৃষ্টি।” মিরন্দা উত্তর করিল, “আমি আর কোন রমণীকে চিনি না; কোন দ্বীপ মুখ আমার মনে নাই; আপনার প্রতিবিম্ব বাহা দেখিতে পাই। অন্য পুরুষও কাহাকে চিনি না; কেবল পিতাকে দেখি, আর আজ ভোঁয় দেখিলাম। পৃথিবীর অন্যান্য লোকের কেমন মূর্তি, তাহা ত আমি জানি না। কিন্তু সে ঘাষা হউক তোমাবিহীন আর কেহ আমার সহচর হইবে না—তোমার মত মূর্তি আমি আর কলনায় ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু আমি অন্যায় কাষ করিতেছি। পিতার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করিলাম।” ফার্দিনান্দ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আবার বলিল “মিরন্দা! আমি রাজার কুমার; কিন্তু তোমার জন্যই আজ আমি দ্বীপভাবে এই কাষ্ঠবহনের অপমান স্বীকার করিতেছি, তোমায় দেখিয়া অবধি আমি মুগ্ধ হইয়াছি। মিরন্দা! তোমার দাগ হইতে বাসনা করি।” সরলা মিরন্দা রাজকুমারের সুসামাজিক, রাষ্ট্রদর-বারোপযোগী প্রণয়পঙ্ডায়ণ বড় বুঝিল না। বাহা বুঝিল, তাহাতেই জানিল রাজকুমার তাহাকে ভাল বাসেন।—বলিল, “তুমি কি আমার ভাল বাস?” তার পর ফার্দিনান্দের মুখে মর্শ্বেভেরী

প্রেমবাক্তি শুনিয়া মিরন্দা অশ্রুমোচন করিল। এ আনন্দাক্ষর! বলিল “সুখের কথাই কহি কেন?—আমি নিরোধ?” ফার্দিনান্দ আগ্রহে সিজ্ঞাপা করিলেন, “ভাল মিরন্দা, কাদ কেন?” মিরন্দা বলিল, “আমি তোমার অল্পপন্থক! তোমায় বাহা দিতে চাই, তাহা দিতে ত সাহস হয় না। লজ্জার ভাব মনে আসে কেন? আমি কথা লুকাতে জানি না—মনের কথা স্পষ্ট বলিতেছি। যদি বিবাহ কর, আজ হইতে আমি তোমার দ্বীপ হই। লাম—যদি বিবাহ না কর, তোমার দাগী রহিব। তোমার সহচরী হইতে যদি না পাই, দাগীও কি হইতে পাব না?” মনোমিলন হইয়াছিল; গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইল। আমরা সপিস্তারে এই সমাজবিরহিণীর সঙ্গে রাজকুমারের কথোপকথন বিবৃত করিলাম। মিরন্দাচরিত্রের বিশ্লেষণ ইহাতেই বোধ হয় হইয়াছে।

।কপালকুণ্ডলার কবি সমাজবিরহিণীর চিত্র পাঠকের চক্ষে ধরিয়াছেন বাটে, কিন্তু প্রকৃততঃ সেই চিত্রসৃষ্টি তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য অদৃষ্টগতির অবশ্যস্বাবিতা-প্রদর্শন—যে অদৃষ্টগতি “ভৌতিক ও মানসিক নিয়মের ফল” তাহারই অবশ্যস্বাবিতা-প্রদর্শন। সুতরাং কপালকুণ্ডলার চিত্র গ্রন্থের উপায়বিশেষমাজ—উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য হইলে বোধ হয় আমরা কপালকুণ্ডলার চরিত্র অধিকতর বিকসিত দেখিতাম।। কিন্তু ইহা যে ভাবে

চিন্তা হইলো, তাহাতেই সমাজবির-
হিতার মরণ, অলৌকিকভাব ক্ষুণ্ণতা-
লাভ করিয়াছে, এক্ষণে আমরা তাহাই
দেখাইব ।

সমুদ্রতটে বসিয়া, প্রদোষে যখন
নবকুমার জলবিশোভা দেখিয়া মুগ্ধ
হইতেছিলেন, কখন বা নিম্নের নিরা-
শ্রয়ের ভীষণতা অনুভব করিয়া ব্যথিত
হইতেছিলেন, “কপালকুণ্ডলার” সেই
দৃশ্য পাঠক একবার মনোমন্দিরে
অঙ্কিত করুন । “পরে একেবারে
প্রদোষভিগির আসিয়া কালজ্বলের উপর
বসিল ।” তখন নবকুমার আশ্রয়স্থ-
লন্ধানে ফিরিলেন । ফিরিবামাত্র দেখি-
লেন, অপূর্বমূর্তি ! তিনি এই প্রথম
মনবাসিনী, অলৌকিকরূপবাসি কপাল-
কুণ্ডলকে দেখিলেন । সেই প্রদোষে,
সেই অমল সমুদ্রের তটে, সেই মোহিনী
মূর্তি দেখিয়া নবকুমার কত মোহিত হই-
য়াছিলেন তাহা সেই পত্নীরনাদী সাগর-
কূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার
মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না । নবকুমার
অকস্মাৎ এইরূপ চূর্ণমমধো দৈবীমূর্তি
দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াই-
লেন । তাহার বাকাশক্তির ইহা হইল ;
—তুমি হইয়া চাহিয়া রহিলেন । রমণীও
স্পন্দহীন, অনিস্কলনোচনে বিশালচক্ষুর
স্তিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া
রাখিলেন । উভয়মধ্যে প্রভেদ এই,
যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের
দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ

নিকুমার নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ
উদ্বেগপ্রকাশ হইতছিল । “কেন
ক্ষণ পরে তরণীর কর্ণধর শুনা গেল ।
তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, “পাখি,
“তুমি পথ হারাইয়াছ ?”

হিড়িম্বার যখন নবকুমার কাপালিক-
মপে যাইতেছিলেন, তখন তাহার
পৃষ্ঠদেশে কপালকুণ্ডলার কোমলকরস্পর্শ
হইল । সেই আঙুলকলরিত নিবিড়
কেশরাশিরারিণী বন্যদেবীমূর্তি ! —পূর্ববৎ
মিশ্রব্দ, নিস্পন্দ ! নবকুমার দেখি-
লেন, রমণী বাকাশক্তি নিবেদ করি-
তেছে । নিজমুখে অঙ্গুলিপ্রদান করি-
য়াছে । পরে উদাসীন অবগতিক্রান্ত
হইলে রমণী মৃদুস্বরে কহিল, “কোথা
যাইতেছ ? যাইও না । ফিরিয়া যাও—
পলায়ন কর ।” আবার যখন কাপা-
লিক নবকুমারকে সৈকতভূমিতে বধ্যা
লইয়া চলিলেন, তখন কপালকুণ্ডলা
ভীরুর তুলা বেগে নবকুমারের পার্শ্ব
দিয়া চলিয়া গেল । গমনকালে তাহার
কর্ণে বলিয়া গেল—“এখনও পলাও ।
নরমাংস নহিলে তাত্ত্বিকের পূজা হয়
না, তুমি কি জান না ?” কপালকুণ্ডলা
কাপালিকের খড়া লুক্কায়িত করিয়া
রাখিয়া ছিলেন । কাপালিক পূজাহু
লন্ধানে গিয়াছেন, এই অবকাশে কপা-
লকুণ্ডলা লতাবন্ধ, জীবনে মৃতপ্রায়, হত-
ভাগ্য নবকুমারের পার্শ্বে আসিয়া দেখা
দিলেন । নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া
দেখিলেন সেই মোহিনী কপালকুণ্ডলা ।

তাহার করে খজা ঢলিতেছে। কপাল-
কুণ্ডলা কহিলেন, “বুঝা! কথা
কহিও না—খজা আমারই কাছে—
চুরী করিয়া রাখিয়াছি।” এই বলিয়া
কপালকুণ্ডলা অতিশীঘ্রহস্তে নবকুমারের
লতাবন্ধন খজা দ্বারা ছেদন করিতে
লাগিলেন। নিমেষমধ্যে তাঁহাকে মুক্ত
করিবেন। কহিলেন, “পনায়ন কর,
আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া
দিতেছি।” নবকুমার কপালকুণ্ডলার
সঙ্গে বেগে দৌড়িলেন। কিন্তু অদ্ভু-
তকারে গমনের বড় বাধা জন্মিতে লাগিল।
যুবতী একদিকে প্রাকমানা হইলে,
নবকুমার অন্যদিকে যান। রমণী কহি-
লেন, “আমার অঞ্চল ধর।” আমরা
এতক্ষণ বাহা দেখাইলাম, তাহাতেই
বুঝা গেল যে কপালকুণ্ডলার চরিত্র
অতিকমনীয়, অতিউদার। তিনি পরোপ-
কারের জন্য সব করিতে পারেন।
কিন্তু নে কথা এখনও শেষ হয় নাই।
আমরা পরে দেখাইব যে সমাজবিরহিত
মানবচরিত্র যত নিঃস্বার্থ, যত দুষ্ট হইতে
পারে, সামাজিকতায় তাহা অসম্ভব।

কপালকুণ্ডলার অলৌকিক সারল্যা
তাঁহার জীবন। সামাজিকের সারল্যা
মধুর বটে, কিন্তু অসামান্যিকের সরল-
তার যে মাপুর্বা তাহা দেবতার বাহনীর।
যখন অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কাপা-
লিকসম্মিধানে প্রত্যাবর্তন করিতে নিষেধ
করিলেন, নিষেধের অযোগ্য কারণ
দর্শইয়া উপদেশের গান্ধীয়া বুঝিয়া

দিলেন, তখন কপালকুণ্ডলা বলিলেন,
“না গিয়া কোণায় বাইব?” অধিকারী
বলিলেন, “এই পণ্ডিকের সঙ্গে দেখান্তরে
যাও।” প্রতিভারস্বী কপালকুণ্ডলা নী-
রব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহি-
লেন, “না, কি ভাবিতেছ?”

“কপা! যখন তোনার শিবা আনিয়া-
ছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে,
যুবতীর একরূপ যুবাগুরুবের সহিত যাওয়া
অনুচিত। এখন ঘাইতে বল কেন?”

তখন উভয়ে উচিতাবধারণের জন্য
করালকালীমূর্তির নিকট গেলেন। উভয়ে
ভক্তিতে প্রার্থনা করিলেন। অধি-
কারীর সংস্পর্শ এবং প্রদানভঃ কাপা-
লিকের আদর্শবলে, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে
গাঢ় ধর্মভাব অঙ্কিত হইয়াছিল। তবে
তিনি কাপালিকের ভীষণভাব, তাহার
দুর্গতকার্যকলাপ সহিতে পারিতেন না।
অধিকারীর সংস্পর্শ এ বিষয়ে তাঁহার
অনেক ঈপ্সাকর হইত। তিনি নিতান্ত
সুখী, কাপালিকের ভীষণ অভিমান
ভেদ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।
তাই তিনি বলিলেন যে, “কিন্তু তাঁহাকে
ত্যাগ করিয়া বাইতে আমার মন সন্নি-
তেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন
প্রতিপালন করিয়াছেন।” অধিকারী
বলিলেন, “কিন্তু প্রতিপালন করিয়া-
ছেন তাহা জান না। স্বীকৃতের
মতীত নাশ না করিলে যে ভাস্কর্য
মিল্ক হয় না তাহা তুমি জান না।
আমিও হস্তাদি পাঠ করিয়াছি। না

জগদম্বা জগতের মতি। ইনি মতীর
মতী—মতীপ্রদান। ইনি মতীদান-
সংযুক্ত পূজা কথন গ্রহণ করেন না।
এইজন্যই আমি মহাপুরুষের অনতিমত
সাদিতেছি।” / সুতরাং কাপালিকের
আদর্শবলে জন্মে যে কাটিনাসঙ্কাবে
কথা, অধিকারীর শিক্ষার তাহা হইতে
পায় নাই। কপালকুণ্ডলা কালিকার
অনন্তবিশ্বাসবতী—কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসে
দৃশ্যের কিছুই নাই।

“অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র
হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিবপাত্র লইয়া
মস্তপুত করিলেন, এবং তাহা প্রতিথার
পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি
চাহিয়া রহিলেন। কলেক পরে, অধি-
কারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন,

“মা, মেঘ, দেবী অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া
ছেন, বিবপাত্র পড়ে নাই; যে মানস
করিয়া অর্থাৎ দিয়াছিল, তাহাতে অবশ্য
মঙ্গল। তুমি এই পত্রিকের সঙ্গে
যচ্ছন্দে গমন কর; আমি বিষয়ী লোকের
রীতি, চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ
হইয়া ইহার সঙ্গে যাত্রা, তবে এ ব্যক্তি
অপরিচিত হুতী সঙ্গে লইয়া লোকা-
লয়ে লজ্জা পাইবেক। তোমাকেও
লোকে ঘৃণা করিবেক। তুমি বলিতেছ
এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান, পণ্ডিতেও যজ্ঞো-
পবীত দেখিতে ছ। এ যদি তোমাকে
বিবাহ করিয়া লইয়া যার, তবে সকল
মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার
সহিত যাইতে বলিতে পারি না।”

“বি—বা—হ।” এই কথাটি কপাল-
কুণ্ডলা আঁত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করি-
লেন। বলিতে লাগিলেন, “বিবাহের
নাম ত তোমাদের মূখে শুনিয়া থাকি,
কিন্তু কাহাকে বলে সবিধেব জানি না।
কি করিতে হইবেক?”

অধিকারী ঈশ্বরী হস্তা করিয়া
কহিলেন, “বিবাহ জীলোকের একবার
ধর্মের সোপান; এইজন্য জীকে সহ-
ধর্মিনী বলে। জগন্নাটও শিবের
বিবাহিতা।” অধিকারী নম্নে করিলেন
সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা যম্নে
করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন
“তাহাই হউক—বিবাহই হউক।”

সনাজবিরহিত মারগের আরও একটি
মোহিনীমতি! কপালকুণ্ডলার আঁদে
খ্য অলঙ্কারসমূহের সন্মিলন সমস্ত ক-
রিয়া মতিবিবি বা পলাবতী বলিয়াছিলেন
“আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। এ
ফুল রান্নোদ্যানেও ফুটে না।” সেই
গহনার দশা কি হইল? পাঠিকা বলি-
বেন হয় ত যে “কপালকুণ্ডলার এই দোহ
আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি। গহনা
যে পরকে বিবাহিয়া দেয়, তার চেহের
হাবা মেয়ে কি আর আছে? সমালো-
চকও ভেমনি হাবা। নহিলে এ দোহকে
গুল বলিবে কেন?” সে কথা সত্য।
যাত্রা হউক, “কপালকুণ্ডলা শিবিকাচার
গুলিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে
যাইতেছিলেন; একজন ভিক্ষুক তাঁহাকে
দেখিতে পাইয়া ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে

পাকীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কপাল-
কুণ্ডলা কহিলেন, “আমার ত কিছু
নাই, তোমাকে কি দিব?” ভিক্ষুক
কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে ছুই একখানা
অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ
করিয়া কহিল, “সে কি মা! তোমার
পারে হীরা মুক্তা—তোমার কিছু নাই?”
কপালকুণ্ডলা ভিজ্জাসা করিলেন, “গ-
হনা পাইলে তুমি সম্বৃত্ত হও?” ভিক্ষুক
কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা
অপরিমিত। কণমাত্র পরে কহিল,
“হই বই কি?” কপালকুণ্ডলা অকণ্ট-
হদরে কোটাসমেত সকল গহনাগুলি
ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অল-
ঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন। ভিক্ষুক
দ্রুতবেগে বিহ্বল হইয়া রহিল। দাস
দাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না।
ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব কলিকমান। তখন
নই এদিক ওদিক চাহিয়া উচ্চ্বাসে
গহনা লইয়া পলায়ন করিল। কপাল-
কুণ্ডলা ভাবিলেন, ভিক্ষুক দৌড়িল
কেন?” বলিয়াছি, এ চিত্র সমাজবির-
হিত সারলোর মোহিনীমূর্তি! ফলতঃ
এমন চিত্র সাহিত্যমাংসারে স্রুতি ছরভা
সার্থি সাহেব কলধসের জীবনচরিতে
আমরিকসমাজের প্রাথমিক অবস্থা
বর্ণনা করিতে গিয়া যুগ্ম হইয়া বনিয়া-
ছেন যে এ সমাজে বিবাদের প্রধান
কারণের অভাব।—কেন না তোমার ও
আমার এ উভয় স্বার্থময় বাক্যের অর্থ
কেহ জানে না। কপালকুণ্ডলার সারল্য

তদনুরূপ; এমাজে যে পবিত্রতা নাই
কপালকুণ্ডলার তাহা আছে।

মিল্ বলিয়াছেন যে, যে সকল লোক
সহজে যুগ্ম হয়, যত্ন করিলে তাহাদিগকে
মহজেই মহৎ করা যাইতে পারে। কথা
সত্য যে, কপালকুণ্ডলার অতুতপূর্ব্ব জন্মৌ-
কিক আত্মবিসম্বন্ধন দেখিয়া আমরা গ্রহ-
শেষে মোহিত হই, তাহার চরিত্রের প্রধান
উপকরণ এই যুগ্ম ভাব (Sensitiveness)
ও বটে! তিনি যখন তখন মুক্তা! বিবা-
হের পর নবকুমারের সহিত যাত্রাকালে
কপালকুণ্ডলা কানী প্রণামার্থ গেলেন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র
হইতে একটি অভিন্ন বিষপত্র প্রতিমার
পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি
নিরীকণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি
পড়িয়া গেল। কপালকুণ্ডলা নিতান্ত
ভক্তিপরায়ণা। বিষদল প্রতিমাচরণ-
চূত হইল দেখিয়া তাহার হৃদয়ে যে
গভীর ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা মহজে
লুপ্ত হয় নাই। এই স্পৃহ্যভাবতাই
তিনি অবরোধবাদিনী, কুলকামিনীগণের
সাহচর্য্য আসিয়াও বহুদিন পর্যন্ত সে
সম্মানিনী সেই সম্মানিনীই ছিলেন।
চিন্তাশীল পাঠক এইখানে একবার
নবকুমারের প্রামাদমোদোপরি দৃষ্টি-
মান্য রমণীগণের কণোপকণন অরণ
করুন। শ্যামা বলিতেছিল, “তোমার
এ চুলের রাশি কি বাড়িবে না? একবার
আমাদের গৃহস্থের মেয়ের সত মাজা
কতদিন বোশিনী থাকিবে?”

মু। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হইল নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্য। এখন আর থাকিতে পারিবে না। পরশপাথরের স্পর্শের দ্বারাও সোণ হয়। মেয়েমানুষেরও পরশপাথর আছে। সে পুঙ্খ। পুঙ্খের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাথর ছুঁয়েছিস্।

মৃগায়ী কহিলেন, “ভাল, বুঝিলাম। পরশপাথর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; গোঁপায় ফুল দিলাম; সিঁগি ও চন্দ্রহার পরিলাম; কাণে ছল ছলিল; চন্দন, কুসুম, চূরা, পান, গুয়া, ঘোণার খুন্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনেকর-সকলই হইল। তাহা হইলে বা কি সুখ?” শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, “আচ্ছা—তাই যদি না হইল; তবে গুনি দেখি তোমার সুখ কি?” মৃগায়ী ক্রিয়াক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, “বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ আছে।” আবার বলিলেন, “যাহা বিধাতা করাইবেন; তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটবে।” কহিলেন, “যেদিন স্বামীর সহিত বাজা করি, বাজাকালে আমি ভবানীর পায়ে জিপজ দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে জিপজ না দিয়া কোন কর্ম করিতাম না। যদি কণ্ঠে গুড হইবার হইত, তবে মা

জিপজ ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে জিপজ পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাতদেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল।—ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। জিপজ মা ধারণ করি; ঘেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।” তাই বলিতেছিলাম যে মুক্তভাবও কপালকুণ্ডলাচরিত্রের প্রধান উপকরণ বটে।

শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল—স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক্ষণে অনেকাংশে গৃহস্থকামিনীর ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য অসামাজিক মনোগতি, অসামাজিক চরিত্রগুণ অবাহত ছিল। সে তেজ চুর্দ্যমণীয়—কিন্তু পবিত্রভাসময়।

“কপালকুণ্ডলা কহিলেন, ‘ঠাকুরজামাই আর কতদিন এখানে থাকিবেন?’

শ্যামা কহিলেন, “কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাজে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবে তারে বশ করিয়া মন্ত্রবাজ্য সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাজে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া লাথ, কাটা খাইলাম। আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?”

ক। দিনে তুলিলে হব না?

শ্য। দিনে তুলিলে কলবে কেন? ঐকু হই প্রহর রাজে এলোচুণে তুলিতে

হয়। তা'তাই, মনের সাধ গঠনই
হইল।

ক। জাচ্ছা, আমি-ত আজি দিনে
সে গাছ চিনে এয়েছি। আর যে বনে
হয় তাও দেখে এয়েছি। তোমাকে
আজি আর যেতে হবে না, আমি একা
গিরা ওষধ তুলিয়া আনিব।

শ্যা। একদিন যা হইয়াছে তা
হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির
হইও না।

ক। সে জন্য তুমি কেন চিন্তা
কর? শুনেছ ত রাত্রে বেড়ান আমার
ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। মনে
ভেবে দেখ আমার সে অভ্যাস না
থাকিলে তোমার সঙ্গে আমার কখন
চাক্ষুণও হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না। কিন্তু
একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহ-
হের বউ কির ভাল। ছইজনে গিয়াও
এত ত্রিপুরার খাইলাম, তুমি একাকিনী
গেলে কি রক্ষা থাকিবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে
করিয়াছ যে আমি রাত্রে ঘরের বাহির
হইগেই কুচরিজা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না।
কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বলবে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব
না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তা-
নাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদের
অন্তঃকরণে ক্রোধ হবে।

ক। ওমত অন্যায় ক্রোধ হইতে
দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু
দাদাকে কেন অস্থগী করবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি
নিজ মিন্দলোচনকটাক্ষ নিক্ষেপ করি-
লেন। কহিলেন, 'ইহাতে তিনি
অস্থগী হয়েন, আমি কি করিব? যদি
জানিতাম যে স্ত্রীলোকেব বিবাহ দাম্পত্য,
তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।''

(পাঠকমহাশয় উদ্ধৃত অংশ পর্যালোচনা
করিয়া কবির চিত্রকুশলতা বৃদ্ধিতে
পারিবেন। গৃহস্থা কামিনী শ্যামাসুন্দরীর
সমাজভীতি, মুহূর্ত্তার সহিত তিনি
কপালকুণ্ডলার তেজস্বিতা ও দৃষ্টতার
পার্থক্য কেনন সুকৌশলে রক্ষা করি-
য়াছেন। তিনি বহু দেখাইয়াছেন,
আধুনিক দার্শনিকও তাহাই বলেন।
সমাজভীতি সমাজনীতির মূল কারণ বটে,
কিন্তু অসামাজিকের নীতি নিরপেক্ষিক

—তাহাতে আপেক্ষিকতার নাসমাজ
নাই। সুতরাং সার্কভৌম মানবসমা-
জকে শিক্ষা দিবার জন্য কপালকুণ্ডলার
নায় চিত্রসৃষ্টির প্রয়োজন।) কে বল
তাহাই নহে।—কিন্তু সে কথা পরে
বলিব।

কপালকুণ্ডলা সেই বিজন বনমধ্যে
যে সকল শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা
অসামাজিক। সুতরাং সমাজের সাঙ্ক-
চর্যে আসিয়া তিনি বিপদে পড়িয়া-
ছিলেন। প্রতিপদে তাঁহার প্রিয়তম,

আদেশবান্ধাস্ত শিষ্টকুলি সমাজসং-
স্পর্শে ব্যক্তি হইতে লাগিল—কেন
না সে সকলের ব্যবহারে সমাজের
বিকলচিত্রণ হয়। সুতরাং সকলকেই
নিকট নিষ্কান্তজন হইতে হয়। অনোর
কথা দূরে থাক, স্বয়ং নবকুমারও তাঁ-
হার বন্যশিকার বিরোধ প্রকাশ করি-
য়াছেন। কেন না তিনি সামাজিকমাত্রা
“ইতিপূর্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন
যে কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে
তাঁহার অবোধ হইয়াছেন। বিশেষ
কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিবেদনসত্ত্বেও যে-
খানে সেখানে একাকিনী ফুটছেন;
যাহার তাহার সহিত যথেষ্ট আচরণ
করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্যহেলন
করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করি-
তেন।” যখন কপালকুণ্ডলার কবরী
বন্ধনচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণেশীর লিপি ভূমি-
ভাগে পতিত হয়, নবকুমার তাহা
দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া, কপালকুণ্ডলার
আচরণের সঙ্গে মিলাইয়া তিনি ঠিক
করিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা ব্যক্তি-
চািরিনী হইয়াছে। আদর্শী, সুসামা-
জিক নবকুমার কপালকুণ্ডলাচরিত্রের
পার্থক্য লক্ষ্যগম্য করিতে পারেন নাই।
যাহারা বলেন, স্ত্রীপুরুষের প্রেম বামা-
খ্যক নহে, তাহার এ কথাটি মনে
রাখিল ভাল হয়।

তাহা বলিয়াছি, উদাহরণ দিয়া তাহা
বুঝাইব। শামান্দ্রকরীর জন্য কপাল-
কুণ্ডলা ঔষধের অল্পমতানে গৃহ হইতে

বহির্গতা হইলেন। “তখন রাত্রি
ঐহর্যাতীত হইয়াছিল। নিশা সন্ধ্যোঃস্বা।
নবকুমার বহিঃকক্ষায় বসিয়াছিলেন,
কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতে-
ছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাই-
লেন। তিনিও গৃহভাগ করিয়া আমির
মুগ্ধার হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা
কহিলেন, “কি?”

নবকুমার কহিলেন “কোথা যাইতেছ?”
নবকুমারের স্বরে তিরস্রাবের স্বচনা
মাজ ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, “শামান্দ্রকরী
স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে,
আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।”

নবকুমার পূর্বনং কোমলস্বরে কহি-
লেন, “ভাল; কালি ত একবার গিয়া-
ছিলে? আজি আবার কেন?”

ক। “কালি খুঁজিয়া পাই নাই;
আজি আবার খুঁজিব।” নবকুমার
অতি মুচ্ছাবে কহিলেন, “ভাল দিনে
খুঁজিলে ত হয়?” নবকুমারের পর
স্নেহপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, “দিবসে ঔষধ
কলে না।”

ন। কাজই কি যোগার ঔষধ
তহাদে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া
দাও। আমি ঔষধি তুলিয়া আনিয়া
দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে
পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি
তুলিলে ফলিবে না। জীলোকে এলো-